তফসীরে নূরুল কোরআন

উনত্রিশতম পারা

২৯

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

উনত্রিশতম খন্ড



তফসীরে নূরুল কোরআন

উনত্রিশতম খন্ড

২৯

উনত্রিশ পারা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

চতুর্থ প্রকাশ ঃ মার্চ ২০১৪ইং

গ্রন্থ সত্ত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস. আর প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৩-০১৪৮৮৯, ৭১৭৩৭২১

Tafsir-e-Nurul Quran (V); 29. Published by Al-Balag Publications
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207 Price : 350.00.

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়াময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের উনত্রিশতম খন্ড পেশ করার তওফিক দান করেছেন। এটি আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এজন্যেও দরবারে এলাহীতে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করি যে, তিনি দয়া করে তাঁর প্রদত্ত জীবনকে তাঁর মহান বাণীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রচার-প্রসারে অতিবাহিত করার তওফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ বেজামিয়ী মাহামিদীহি, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!!

কোন গ্রন্থের উনত্রিশতম খন্ড রচিত ও প্রকাশিত হওয়া কোন অবস্থাতেই সহজ এবং সাধারণ ব্যাপার নয়; বরং নিঃসন্দেহে একটি অসাধারণ ঘটনা, আর এ অসাধারণ ঘটনা ঘটছে শুধু আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে, তাঁর অন্তহীন দয়ায় এবং তৌফিকে। আর যা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তা-ও ইন্‌শা আল্লাহ শুধু দয়াময় আল্লাহ পাকের রহমতেই পূর্ণ হবে।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদ ও আসহাবের প্রতি, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয়, পছন্দনীয় এবং সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি, এমন দরুদ যা হবে তোমার সন্তুষ্টির কারণ এবং তাঁর জন্যে হবে তা সওয়াবের উপকরণ এবং তা হবে তাঁর হক্ব আদায়ের একটি মাধ্যম।

হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে তুমি ছোট-বড় যত প্রাণী সৃষ্টি করেছ এবং ভবিষ্যতে যত কিছু সৃষ্টি করবে, সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নেয়ামত অনন্ত অসীম, আমাদের এ জীবন এবং জীবনের যথাসর্বস্ব, এ জগত ও জগতের সব কিছু নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের নেয়ামত, মানব জাতিকে আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন এবং মানুষের প্রয়োজনের আয়োজনেই আসমান-যমীনের অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো দু'টি (১) পবিত্র কোরআনের অবতরণ (২) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন।

যাবতীয় জ্ঞানের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরআন, মানব অন্তরের যাবতীয় রোগের অব্যর্থ মহৌষধ হলো পবিত্র কোরআন।

পবিত্র কোরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ মোযেজা, সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হয়েও তার মোকাবেলা করতে পারেনি, তাই পবিত্র কোরআন অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, তার বর্ণনা-ভঙ্গি অতি আকর্ষণীয়।

মাহে রমজানে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ আসে, তাই পবিত্র কোরআন মাহে রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে, কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

"মাহে রমজান সেই মাস, যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, যা মানব জাতির জন্যে পথ-প্রদর্শক, যাতে রয়েছে হেদায়েতের নিদর্শন সমূহ এবং যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী"। (সূরা বাকারাহ : আয়াত : ১৮৫)

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহ পাকের নূর, মানব মনকে বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা আলোকিত করা যায় না, মানব মনকে আলোকিত করার এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে দূরীভূত করার মাধ্যমই হলো পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এ দু'টি বিষয়কে একত্রিত করে ঘোষণা করেছেন এভাবেঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে একটি নূর আর একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ"। (সূরা মায়েদাহ, আয়াত : ১৫)

এ নূর হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর সুস্পষ্ট গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন।

অন্য আয়াতে নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে পবিত্র কোরআনকে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"অতএব তোমরা ঈমান আন আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি, আর আল্লাহ পাক তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল"।.(সূরা তাগাবুন : আয়াত : ৮)

এ আয়াতে "নূর" বলে পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অতএব নূরানী তথা পূতঃ পবিত্র জীবন-যাপন করতে হলে এবং জীবন-সাধনাকে সার্থক সুন্দর করতে হলে পবিত্র কোরআনের আলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এ জীবন ও জগত যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঠিক তেমনি এখানকার যাবতীয় নেয়ামতও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ ক্ষণস্থায়ী নয়; চিরস্থায়ী নেয়ামত। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করলে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করলে এ জীবন সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম হয়।

আধুনিক জীবন প্রাচর্যময় হলেও অশান্তি এবং অস্থিরতা থেকে মুক্ত নয়; এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ-নির্দেশ করে পবিত্র কোরআন, আর হাতে-কলমে সে পথের কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

অএব, এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করার প্রয়োজনেই পাঠ করতে হবে পবিত্র কোরআন, গ্রহণ করতে হবে তার শিক্ষা এবং অনুসরণ করতে হবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের, আর এজন্যে পবিত্র কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা পূর্বশর্ত, এ পূর্বশর্ত পূরণের তাগিদেই একদিন তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা শুরু হয়েছিল।

হে আল্লাহ! কবুল কর আমাদের এ সাধনা, তোমার সন্তুষ্টি লাভের তওফিক দান কর, মুসলমানদের নিকট পবিত্র কোরআনের মহান বাণী পৌছানোর সুযোগ দান কর। এর বরকতে আমাদেরকে দুনিয়া আখেরাত দু'জহানের সাফল্য দান কর। তফসীরে নূরুল কোরআনের অবশিষ্ট কাজ সু-সম্পন্ন করার তওফিক দান কর। আমার পিতা-মাতাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান কর এবং সন্তান-সন্ততিদেরকে পবিত্র কোরআনের খেদমতে নিয়োজিত থাকার তওফিক দান কর এই মহান গ্রন্থের সকল পাঠক-পাঠিকার প্রতি রহমত নাযিল কর।

হে আল্লাহ! দয়া করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের দোয়া কবুল কর। আমীন।

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মুলক প্রসঙ্গে	২
নামকরণ	২
এ সূরার ফযীলত	২
এ সূরার আমল	৩
মূল বক্তব্য	৪
জীবন এক মহা পরীক্ষা	৬
মৃত্যু ও জীবন আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি	৭
প্রথমে মৃত্যুর উল্লেখের কারণ	৮
কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী	১৬
কাফেররা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে	২০
মোমেনদের জন্যে মাগফেরাত এবং পুরস্কারের ঘোষণা	২১
শানে নযুল	২৩
অতীতের কাফেরদের শাস্তির কথা স্মরণ কর	২৯
আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার হওয়া কর্তব্য	৩৭
কেয়ামত অনিবার্য	৩৮
কাফেরদের চেহারা বিকৃত হবে	৪০
আয়াতের মর্মকথা	৪১
সূরা কলম প্রসঙ্গে	৪৫
মূল বক্তব্য	৪৫
এ সূরার আমল	৪৫
স্বপ্নের তা'বীর	৪৫
হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান	৪৮
সুমহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী নবী	৫০
"খুলুকে আজীমের" ব্যাখ্যা	৫০
চরিত্র-মাধুর্যের দৃষ্টান্ত	৫১
প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা	৫৪
আয়াত সমূহের মর্মকথা	৫৫
তওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রিয়নবী (দঃ)-এর আবির্ভাব	৫৮
অর্থ-সম্পদ একটি কঠিন পরীক্ষা	৬৩
তওবার ফলশ্রুতি	৭০
কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য	৭১
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা	৮১

বিষয় পৃষ্ঠা

শিক্ষণীয় ---------- ৮৬
শানে নযুল---------- ৮৭
এ আয়াতের আমল---------- ৮৭
বদ নজর সত্য---------- ৮৮
আয়াতের মর্মকথা---------- ৮৮
সূরা আল্ হা-ক্কাহ প্রসঙ্গে---------- ৯২
নামকরণ---------- ৯২
মূল বক্তব্য---------- ৯৩
স্বপ্নের তা'বীর---------- ৯৩
এ সূরার আমল---------- ৯৩
পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম---------- ১১৬
পবিত্র কোরআন মোত্তাকীদের জন্যে উপদেশ---------- ১১৯
সূরা মাআরিজ প্রসঙ্গে---------- ১২৩
নামকরণ---------- ১২৪
এ সূরার আমল---------- ১২৪
স্বপ্নের তা'বীর---------- ১২৪
মূল বক্তব্য---------- ১২৪
শানে নুযুল---------- ১২৪
কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা---------- ১৩৪
মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা---------- ১৩৭
প্রকৃত নামাজীর বৈশিষ্ট্য---------- ১৩৯
শানে নযুল---------- ১৪৮
সূরা নূহ প্রসঙ্গে---------- ১৫৪
এ সূরার আমল---------- ১৫৪
স্বপ্নের তা'বীর---------- ১৫৫
মূল বক্তব্য---------- ১৫৫
কেয়ামতের দিন সূরা নূহ পাঠ করা হবে---------- ১৫৫
মাগফেরাত লাভের পূর্বশর্ত---------- ১৬০
মূর্তি পূজার উৎপত্তি---------- ১৭৩
বদদোয়ার কারণ---------- ১৭৬
সূরা জ্বিন প্রসঙ্গে---------- ১৭৯
এ সূরার আমল---------- ১৮০
স্বপ্নের তা'বীর---------- ১৮০
মূল বক্তব্য---------- ১৮০

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্বিন প্রসঙ্গে	১৮১
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	১৮৯
শানে নুযুল	১৯৩
পবিত্র কোরআনের অবদান	১৯৮
জ্বিনদের পরিণাম প্রসঙ্গে	২০৪
পাপাচার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে	২১১
এলমে গায়ব সম্পর্কে	২১৯
ওলামায়ে কেরামের ফজিলত	২২৩
সূরা মুয্যাম্মেল প্রসঙ্গে	২২৭
মূল বক্তব্য	২২৮
এ সূরার ফজিলত	২২৮
এ সূরার আমল	২২৯
স্বপ্নের তা'বীর	২২৯
শানে নুযুল	২২৯
কোরআনে করীম পাঠের কয়েকটি আদব	২৩৪
আয়াতের মর্মকথা	২৪০
তাহাজ্জুদের নামাজের ফজিলত	২৪১
আল্লাহ পাকের জিকর	২৪২
বিসমিল্লাহ্ পাঠের বিধান	২৪৩
আধ্যাত্মিক সাধনার কয়েকটি কর্মসূচী	২৪৭
উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে বিশেষ সুসংবাদ	২৫৪
সূরা মুদ্দাস্সির প্রসঙ্গে	২৬৪
শানে নযুল	২৬৪
এ সূরার আমল	২৬৫
স্বপ্নের তা'বীর	২৬৫
মূল বক্তব্য	২৬৫
শানে নযুল	২৭২
দোজখের প্রহরী উনিশজন কেন?	২৮০
শানে নুযুল	২৮৩
মানুষ স্বীয় কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ	২৯০
শাফাআতের সুসংবাদ	২৯৪
যাদের জন্যে শাফাআত করা হবেনা	২৯৫
শানে নযুল	২৯৮
পবিত্র কোরআন হলো উপদেশ-বাণী	২৯৮

বিষয় পৃষ্ঠা
সূরা কেয়ামাহ্ প্রসঙ্গে---------- ৩০২
সূরার মূল বক্তব্য---------- ৩০২
এ সূরার আমল---------- ৩০৩
স্বপ্নের তা'বীর---------- ৩০৩
শানে নযুল---------- ৩০৫
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী হবে----------৩০৯
শানে নুযুল----------৩১৩
আখেরাতে আল্লাহ্ পাকের দীদার----------৩১৬
আয়াতের মর্মকথা---------- ৩২৩
মানব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস----------৩২৬
সূরা দাহ্র প্রসঙ্গে----------৩২৯
নামকরণ----------৩২৯
মূল বক্তব্য---------- ৩২৯
এ সূরার আমল---------- ৩৩০
স্বপ্নের তা'বীর---------- ৩৩০
শানে নুযুল---------- ৩৪০
নেককারগণের শুভ-পরিণতি---------- ৩৪৩
সূরা মুরসালাত প্রসঙ্গে----------৩৬১
নামকরণ----------৩৬১
স্বপ্নের তা'বীর----------৩৬১
এ সূরার আমল----------৩৬১
মূল বক্তব্য----------৩৬১
এ সূরা সম্পর্কে আরও কথা---------- ৩৬২
দোযখে কাফেরদের শাস্তি----------৩৬৭
মানব জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত----------৩৬৮
সর্বাধিক শক্তিশালী সৃষ্টি----------৩৭২
কাফেরদের অসহায়ত---------- ৩৭৯
মোমেন মুত্তাকীদের পুরস্কারের ঘোষণা----------৩৮০
শানে নুযুল---------- ৩৮২
একই আয়াত বারংবার উল্লেখের কারণ---------- ৩৮২

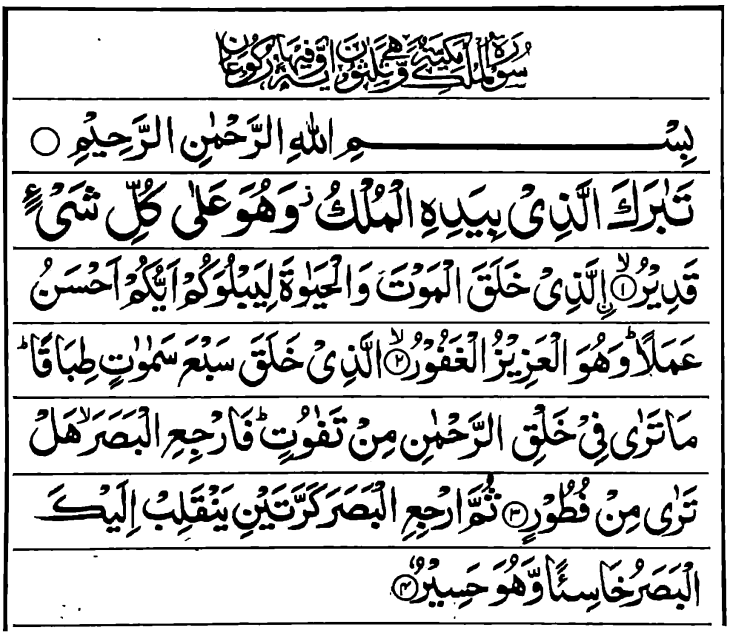
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

ঊনত্রিশতম খণ্ড **ঊনত্রিশ পারা**

সূরা মুলক


سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرُ ۝١ ۙ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ
عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ ۙ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ
مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ
تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) তিনি মহা মহিমান্বিত, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তিনি সব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে, যেন তিনি পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম? আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

(৩) যিনি সৃষ্টি করেছেন উপর্যুপরী সাতটি আসমান, তুমি দয়াময় আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা, অতএব পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

(৪) এরপর বার বার লক্ষ্য করে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ, ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার নিকট।

সূরা মুলক প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে, এতে ৩০ আয়াত রয়েছে, এর বাক্য সংখ্যা ৩৩৫ এবং অক্ষর সংখ্যা ১,৩১৩।

নামকরণ

হাদীস শরীফে এ সূরার একাধিক নাম পাওয়া যায়ঃ সূরা তাবারক, মানেআহ, দাফেয়াহ, ওয়াফিয়াহ এবং মুনজিয়াহ।

এ সূরাকে 'তাবারক' এজন্যে বলা হয় যে, এ শব্দটি দ্বারাই এ সূরা শুরু করা হয়েছে আর মানেআহ, দাফেয়াহ এবং মুনজিয়াহ বলা হয় এজন্যে যে, এ সূরা পাঠ করার কারণে দুনিয়াতে গোমরাহী এবং আখেরাতে আযাব থেকে নাজাত পাওয়া যায়।

এ সূরার ফযীলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোরআনে করীমে এমন একটি সূরা রয়েছে, যাতে ৩০টি আয়াত রয়েছে, কেয়ামতের দিন এ সূরাটি তার পাঠকের জন্যে সুপারিশ করতে থাকবে এবং অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে মাফ করা হবে, এ হলো সূরা মুলক। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি অজ্ঞতা বশতঃ কোন কবরের উপর তার তাঁবু স্থাপন করেছিল, তখন সে শ্রবণ করলো, কোন ব্যক্তি সূরা মুলক তেলাওয়াত করছে, পরে সে ব্যক্তি এ ঘটনা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলে তিনি এরশাদ করেন যে, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে কবরের আযাব থেকে নাযাত লাভের কারণ হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে এ সূরা পাঠ করবে, সে এর বরকতে কবরের আযাব থেকে নাজাত পাবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, সে জীবনে অনেক গুনাহ করেছে তবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল এবং কোরআনে করীমের শুধু একটি সূরা সে তেলাওয়াত করতো, ঐ অবস্থায় তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হবে। তখন তারকার মত একটি বস্তু উড়ে আসবে এবং আরজ করবে, হে আল্লাহ! তুমি যা কিছু তোমার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল করেছ, আমি তারই অংশ, তোমার এ বন্দা আমাকে পাঠ করতো। ঐ সূরাটি এ ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করতে থাকবে, অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করবেন। এ সূরাটি হলো নাজাতদানকারী।[১]

এ সূরার আমল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা মুলক পাঠ করবে, সে কবরের আযাব এবং কেয়ামতের কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরা ৪১ বার পাঠ করলে বিপদাপদ দূর হয়, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পাঠ করলে তার ঋণ পরিশোধ হয়।

সূরা মুলক তিনবার পাঠ করে চক্ষু রোগীর উপর দম করলে চক্ষু রোগ সেরে যায়।

কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এ সূরার আমল সবচেয়ে বেশী উপকারী হয়।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে পর্যন্ত সূরা সেজদা এবং সূরা মুলক পাঠ না করতেন, সে পর্যন্ত নিদ্রিত হতেন না।

মাসের নতুন চাঁদ দেখার সময় যদি কেউ এ সূরা পাঠ করে তবে এর বরকতে সারা মাস অত্যন্ত ভালভাবে অতিবাহিত হয় এবং বালা-মসিবত থেকে সে নিরাপদ থাকে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৩

মূল বক্তব্য

এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিবরণ রয়েছে। এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, নিখিল বিশ্বের আধিপত্য এবং সর্বময় ক্ষমতা এক আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আল্লাহ পাকের অপার মহিমার বিশ্লেষণের পর তওহীদে বিশ্বাসের আহ্বান রয়েছে।

এ সূরায় এরশাদ হয়েছে, মানুষের এ জীবন কঠিন পরীক্ষা এবং এ পৃথিবী তার পরীক্ষা কেন্দ্র। এ পৃথিবীতে কে আল্লাহ পাকের বাধ্য, অনুগত এবং কৃতজ্ঞ, আর কে অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ তার পরীক্ষা হয়, এমনিভাবে কে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে উন্নততর জীবনের আর্দশ গ্রহণ করে, আর কে তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আর্দশকে উপেক্ষা করে, এর পরীক্ষা হয় এ জীবনে, আর কেয়ামতের দিন ঐ পরীক্ষার ফল একাশিত হবে।

এ সূরায় পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তিতে এরশাদ হয়েছে, দ্বীন ইসলামের হেফাজতের জন্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ একান্ত জরুরী। ঈমান এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা মানব-জীবনের সাফল্যের জন্যে একান্ত জরুরী। আর এ সূরার শুরুতেই আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত, তাঁর শান এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এর পাশাপাশি ঈমানদার এবং নেক্কারদের জন্যে কি কি নেয়ামত সংরক্ষিত আছে তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে, এমনিভাবে কাফের ও মুশরেকদের জন্যে কি কি শাস্তি রয়েছে তাঁর বিবরণও রয়েছে। পরিবারের লোকেরা যদি গৃহকর্তার অবাধ্য হয়, তবে গৃহকর্তার যে কষ্ট হয় তা পূর্ববর্তী সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে যারা বিশ্ব স্রষ্টা এবং পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের পরিণতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়।[১]

তফসীরুল কোরআন

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۞

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-২

তিনি মহা মহিমান্বিত, তাঁর হাতেই রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তিনি সব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান।

যাঁর মহিমা অপার, যিনি মহা-মহিমান্বিত, যিনি বরকতময়, যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, নিখিল বিশ্ব যাঁর কর্তৃত্বাধীন, যাঁর আধিপত্য সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁর ক্ষমতা অনন্ত অসীম, যিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তিনিই আল্লাহ পাক, তিনিই মহা পরাক্রমশালী, সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত, কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতার বাইরে যেতে পারেনা, নিখিল বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নেই, তিনিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

এ আয়াতে আল্লাহ পাকের কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন তিনি বরকতময়, তিনি মহা মহিমান্বিত, এমনিভাবে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আর তিনি সর্ব বিষয়ের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। এসব হলো আল্লাহ পাকের গুণাবলী, এরপর এ গুণাবলীর প্রমাণ স্বরূপ এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে, যেন তিনি পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম'?

আল্লাহ পাক যে স্রষ্টা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব, ইতিপূর্বে পৃথিবীতে তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা, আল্লাহ পাকই তাকে শুণ্যের কোঠা থেকে এনে অস্তিত্ব দান করেছেন। একথা সর্বজন বিদিত, পৃথিবীতে মানুষ ছিলনা, আল্লাহ পাকই তাকে জীবন দান করেছেন, কিন্তু মানুষের এই জীবন বা অস্তিত্ব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, কিছুদিন পর সে আর এ পৃথিবীতে থাকবেনা, তাই এরশাদ হয়েছে, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে।

প্রশ্ন হলো, কেন জীবন ও মৃত্যুর এই ব্যবস্থা? তারই জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতাংশেঃ

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

যেন তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম।

জীবন এক মহা পরীক্ষা

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষের এ জীবন তার জন্যে এক মহা পরীক্ষা, আর এ জগত হলো তার পরীক্ষা-স্থল, কে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে আর কে তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয় তার পরীক্ষা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, আর এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে আখেরাতে।

অতএব, দুনিয়ার জীবনের সাধনার সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে আখেরাতে, এখানের সাফল্য প্রকৃত সাফল্য নয়, আর এখানের ব্যর্থতাও সত্যিকার অর্থে ব্যর্থতা নয়, যদি জীবনের পাশাপাশি মৃত্যু না থাকত, তবে মানুষ শুধু যে স্বেচ্ছাচারী হতো তাই নয়; বরং জীবন-সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রমাণিত হতোনা। যদি আখেরাত বা পরকালীন জীবন না থাকতো, তবে জীবন সাধনার ফল প্রকাশের কোন সুযোগ থাকত না এবং সত্য-সাধনার কোন মূল্যও থাকত না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۞

তিনি পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল (যাতে অবাধ্যদেরকে তিনি শাস্তি দিতে পারেন) আর তাকে তিনি ক্ষমাও করতে পারেন।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ পাক একদিকে অত্যন্ত কঠোর, অন্যদিকে তিনি অত্যন্ত কোমল, তাঁর ক্ষমতা যেমন অন্তহীন, তেমনি তাঁর ক্ষমা এবং ঔদার্যও সীমাহীন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তিও দিতে পারেন, এর জন্যে তাঁর মূল নীতি হলো, যারা তাঁর সাথে শেরক করে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। আর যারা ঈমানদার ও নেককার হয়, তাদের জন্যে রয়েছে তাঁর অন্তহীন নেয়ামত।

তফসীরকারগণ বলেছেন, تَبٰرَكَ শব্দটি "বরকত" থেকে নিস্পন্ন। আর "বরকত" শব্দটির অর্থ হলো, কোন কিছুর আধিক্য, যা সে বস্তুটির মালিকের গুণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। যখন এ শব্দটি আল্লাহ্ পাকের শানে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় তাঁর মহিমা অপার, তিনি মহা মহিমান্বিত।

الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ

يَد শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল, হাত। তবে এ স্থলে এর অর্থ দৈহিক হাত নয়; বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বে রয়েছে সব কিছুর এখতিয়ার। এর উপর বিশ্বাস করা মোমেনের কর্তব্য, কিন্তু এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করা বৈধ নয়।

মৃত্যু ও জীবন আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে'।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা। পৃথিবীকে আল্লাহ পাক মানব জীবনের গৃহ রূপে তৈরী করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তথা তাকে জীবন দান করেছেন।

এরপর মানুষকে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত করেন এবং আখেরাতকে দুনিয়ার জীবনের সাধনার ফলাফল লাভের স্থান নিদৃষ্ট করেছেন। তবে দুনিয়ার মত তা ক্ষণস্থায়ী হবেনা, হবে চিরস্থায়ী। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক অন্যত্র এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'কিভাবে তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর, অথচ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন, এরপর তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যাবে'। (সূরা বাকারা)

মানুষের জীবন মৃত্যু এবং দরবারে এলাহীতে প্রত্যাবর্তন সব কিছুই আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। সব কিছুই আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে হয়ে থাকে। এতে মানুষের কোন ইচ্ছা কার্যকর হয়না। জীবন, মৃত্যু ও পুনর্জীবনের ধারাবাহিকতা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

'এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদেরকে (নিদৃষ্ট সময়ে) ফিরিয়ে আনব, আর এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে'।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে যে কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে তা হল, মানুষের জীবন ও মৃত্যু সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। জীবন নিঃসন্দেহে

আল্লাহ পাকের দান। জীবনের যথা সর্বস্বও আল্লাহ পাকের দান। আর এজন্যেই কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের যাবতীয় দানের হিসাব দিতে হবে এবং দানের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে নাকি অথবা অপব্যবহার করা হয়েছে তারও হিসাব করা হবে। আর এ উদ্দেশ্যেই অন্য আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

'সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে, সেদিন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা'।

প্রথমে মৃত্যুর উল্লেখের কারণ

কোন কোন তফসীরকার এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত موت শব্দ দ্বারা দুনিয়ার মৃত্যু এবং حيٰوة শব্দ দ্বারা আখেরাতের পুনঃজীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে, আয়াতে মৃত্যুর কথা প্রথমে উল্লেখ করার এবং পরে হায়াতের উল্লেখের কারণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, কেননা দুনিয়ার মৃত্যু আখেরাতের হায়াতের পূর্বেই হয়।

অথবা মৃত্যুকে প্রথমে উল্লেখ করে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রত্যেককে জীবন দেয়ার পূর্বে তার মৃত্যুর দিন-ক্ষণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেই হবে। এভাবে তার এ জীবনের অবসান ঘটবে।

অতএব, বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো এ জীবনের সাধনা দ্বারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করা, মনে রাখতে হবে; এ জীবন মানুষের কর্মস্থল, এ কর্মের ফল পাওয়া যাবে পরকালীন জীবনে। যারা ঈমানদার অবস্থায় নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করবে, অবশেষে আখেরাতে তারাই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে, যারা এ জীবন ভোগ-বিলাসে, আনন্দ-উল্লাসে অতিবাহিত করে, ঈমান ও নেক আমল সংগ্রহে গাফলত করে, তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে চিরদুঃখী হবে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে موت শব্দটি দ্বারা মানুষের জীবন লাভের পূর্বের অবস্থাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কেননা, তখন মানুষের কোন অস্তিত্বই ছিলনা। সূরা বাকারায় وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا বলে সে অবস্থাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, আল্লাহ পাক তখন তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, যা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করবেন, আর সে জীবনেই এ জীবনের হিসাব-নিকাশ হবে এবং এ জীবনের কর্মের মূল্যায়ন হবে, তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম। কে আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করে এবং কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ করে। আর কে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহে লিপ্ত হয় এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণের ব্যাপারে গাফলত করে। অতএব, মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টির হেকমত হলো আল্লাহ পাকের অনুগত এবং অবাধ্য বন্দাদের অবস্থা প্রকাশ করা, কে কি করবে, আর কে কি করলো সবই আল্লাহ পাকের জানা, কিন্তু পুরস্কার বা শাস্তির সিদ্ধান্তের পূর্বে সবার অবস্থা প্রকাশ করা হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, জীবন লাভের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার সুযোগ আসে। আর মৃত্যু হলো প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে একটি উপদেশ মাত্র। যারা বুদ্ধিমান, তারা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে এ জীবনকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে।

এতদ্ব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ পাকের কুদরত ও হেকমতের একটি জীবন্ত নিদর্শন, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, মৃত্যু হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, আর ঈমান হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। (তেবরানী)

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ) রবী এবনে আনাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দুনিয়ার মায়া মোহ কাটাতে এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির জন্যে মৃত্যুই যথেষ্ট।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সাতটি বিষয় তোমার সম্মুখে আসবে, কিন্তু তার আগে তুমি নেক আমল কর।

(১) এমন অভাব-অনটন, যা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর বিধানকে ভুলিয়ে দেয়।

(২) এত সম্পদ, যা মানুষকে আল্লাহ্ পাকের নাফরমান করে দেয়।

(৩) ধ্বংসাত্মক রোগ।

(৪) এমন বৃদ্ধাবস্থা, যা মানুষকে জ্ঞান হারা করে দেয়।

(৫) মৃত্যু, যা মানুষকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়।

(৬) দজ্জাল, যার ব্যাপারে প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন এবং দজ্জালের অপেক্ষা করেছেন।

(৭) কেয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্ত, যা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপদ।

তিরমিজী এবং হাকেম এই হাদীস সংকলন করেছেন যে, ছয়টি বিষয়ের পূর্বে তোমরা আত্মসংশোধন কর। (১) পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় হওয়া (২) ধূম্র প্রকাশ পাওয়া (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) দজ্জাল (৫) সে বস্তু, যা প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু (৬) সে বিষয়, যা সকলের জন্যে হবে অর্থাৎ কেয়ামত।

বায়হাকী হযরত আবু উমামার (রাঃ) সূত্রে এমনি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط

"যিনি সৃষ্টি করেছেন উপর্যুপরি সাতটি আসমান"।

সাতটি আসমানকে আল্লাহ্ পাক একটির পর একটি উপর্যুপরি সৃষ্টি করে রেখেছেন। এক আসমান থেকে অন্য আসমানের দূরত্ব পাঁচশ' বছরের পথ বলে হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।

যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদ প্রমাণ করা হয়েছে, তাই এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে সাতটি আসমান সৃষ্টির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ ঝুলন্ত আসমান সমূহ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০
তফসীরে হাক্কানী পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩১৪

আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের এক অপূর্ব সুন্দর নির্দশন এবং তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পবিত্র কোরআন সহ আসমানী গ্রন্থ সমূহে এ বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তবে কোরআনে করীমের এটি বৈশিষ্ট্য যে, তাতে এই একই বিষয়কে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ মাত্রই আল্লাহ পাকের ঘোষিত এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝

'তুমি দয়াময় আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি দেখতে পাবেনা, অতএব, পুনরায় বারে বারে লক্ষ্য করে দেখ, কোন ফাটল দেখতে পাও কি'?

অর্থাৎ হে মানব জাতি! তুমি মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যে কোন ত্রুটি বা খুঁত দেখতে পাবেনা। মানব দানব, পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-তরুলতা, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতই আল্লাহ পাকের সৃজন-দক্ষতার অপূর্ব নিদর্শন, তিনি মহান স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টিতে কোন দোষ-ত্রুটি বা খুঁত দেখতে পাবেনা। তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর এবং বারে বারে লক্ষ্য কর নিখিল বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতি, কোন ফাটল দেখা যায়? কোন দোষ-ত্রুটি খুজে পাও? এ নীলাভ আকাশের প্রতি বার বার তাকিয়ে দেখ, আছে কি কোন ছিদ্র, আছে কি কোন ফাটল, যতই তুমি দেখবে, তোমার নয়ন যুগল ফিরে আসবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত অবস্থায়, কোন প্রকার ছিদ্র বা ফাটল তুমি দেখতে পাবেনা, কেননা এ হলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি নিজে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, তাঁর সৃষ্টিও সকল খুঁত থেকে মুক্ত।

আল্লামা বগভী (রঃ) কা'ব (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যে আসমান পৃথিবীর নিকটবর্তী তা হলো মেঘ মালার ঢেউয়ের জমাট আস্তরণে নির্মিত, তার পর দ্বিতীয় আসমান হলো সাদা জমরদ পাথরের এবং তৃতীয় আসমান হলো লৌহ নির্মিত, চতুর্থ আসমান হলো পিতল নির্মিত, পঞ্চম আসমান রৌপ্য নির্মিত, ষষ্ঠ আসমান স্বর্ণ নির্মিত, আর সপ্তম আসমান লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথর নির্মিত। আল্লাহ

পাকের পবিত্র সত্বার মধ্যে আর সপ্তম আসমানের মধ্যে সাতটি নূরের বিশাল বিস্তৃত ময়দান রয়েছে।[১]

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, আমরা উপরে যে নীলাভ আকাশকে দেখতে পাই, তা-ই যে প্রথম আসমান একথার উল্লেখ কোরআন ও হাদীসে নেই। হতে পারে সাতটি আসমানই এরপরে বহু দূরে অবস্থিত, যা আজো মানুষের সম্পূর্ণ অজানা।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা আসমান সমূহের সংখ্যা বা এর প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের প্রতি লক্ষ্য করে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো। যিনি মহাশূণ্যের এত বিশাল স্থাপনার স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে মানব সৃষ্টি কঠিন কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে بصر শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথমতঃ فارجع البصر (অতএব, লক্ষ্য করে দেখো)

প্রথমবার লক্ষ্য করার যে আদেশ রয়েছে তা হলো সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে, কেননা তারা কোন সৃষ্টির প্রকাশ্য রূপ দেখেই তার স্রষ্টার গুণের প্রতি আস্থা স্থাপন করে।

দ্বিতীয়বার এরশাদ হয়েছে, ثم ارجع البصر (পুনরায় লক্ষ্য করে দেখ)

এবারের আদেশ সে সব লোকদের জন্যে, যারা সৃষ্টি মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য লক্ষ্য করে এ সত্য উপলব্ধি করে যে, এর চেয়ে উত্তম কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

আর তৃতীয়বার ينقلب اليك البصر (বার বার দেখার পর তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তোমার নিকট) একথা বলা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিশেষ নৈকট্য-ধন্য। যারা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখে শুধু যে তাঁর

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠ-৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২২
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৭২৯

পরাক্রমশালী হওয়ার কথা বিশ্বাস করে তাই নয়; বরং নিজেদের অক্ষমতা এবং অজ্ঞতা স্বীকার করে দরবারে এলাহীতে বিনয় প্রকাশ করেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, فارجع البصر বলে আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা শরীয়তের বিধান নয়; বরং এর তাৎপর্য হলো তুমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখ, আল্লাহ পাকের এ বিশাল সৃষ্টিতে কোন প্রকার খুঁত দেখতে পাবেনা, আর তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ, ক্লান্ত হয়ে তোমারই নিকট ফিরে আসবে।[১]

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا
بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيٰطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابَ السَّعِيرِ ۝٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝٦ اِذَآ اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِيَ
تَفُورُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ
خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝٨ قَالُوا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيرٍ ۝٩
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ اَصْحٰبِ السَّعِيرِ ۝١٠

তরজমা

(৫) আর নিশ্চয় আমি নিকটতম আসমানকে প্রদীপ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি, আর সেগুলোকে আমি শয়তানদের জন্যে মারণাস্ত্র রূপে তৈরী করে রেখেছি। আর তাদের জন্যে অগ্নির আযাবও প্রস্তুত করে রেখেছি।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১১২৫

(৬) এবং যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের শাস্তি, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

(৭) যখন তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তার গর্জন শুনতে পাবে, আর তা উত্তেজিত হতে থাকবে।

(৮) মনে হয় দোযখ যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে, যখনই তাতে কোন দল নিক্ষিপ্ত হবে, তখন দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

(৯) তারা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলেন, আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ পাক কোন কিছুই নাযিল করেননি; বরং তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

(১০) এবং তারা আরো বলবে, হায়! আক্ষেপ! যদি আমরা সেদিন শুনতাম এবং সত্য অনুধাবন করতাম, তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি যে মহা পরাক্রমশালী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একথা ঘোষণা করার পর এর দলিল হিসেবে বিশাল-বিস্তৃত সপ্ত আসমান সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে এবং সর্বকালের সকল মানুষকে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ের দ্বিতীয় দলিল বর্ণনা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ

'আর নিশ্চয় আমি নিকটতম আসমানকে প্রদীপ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি'।

বিশাল-বিস্তৃত আসমান সমূহকে কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত আবহমান কাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের এক বিস্ময়কর নিদর্শন, তদুপরি মহাকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা আল্লাহ পাকের কুদরতের আরো একটি বিশেষ নিদর্শন। কিভাবে আল্লাহ পাক নক্ষত্রপুঞ্জের প্রদীপ সমূহ দ্বারা আকাশকে সাজিয়ে রেখেছেন রাত্রিকালে একবার তা তাকিয়ে দেখ, কত সুন্দর, কত মনোহর এ দৃশ্য! এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখার পর মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। লক্ষ্যনীয়

বিষয় এই যে, কোরআনে করীম মহান আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের যে দলিল পেশ করেছে, তার সত্যতা অনুধাবন করার জন্যে কোন বড় গুণী জ্ঞানী হওয়া জরুরী নয়; বরং যার মধ্যে সাধারণ জ্ঞানটুকু রয়েছে, সে-ও এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে। এজন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

'নিশ্চয় আসমান যমীনের সৃজণে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে (আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদের) বহু নিদর্শন রয়েছে'।

(সূরা আলে এমরান)

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ

'আল্লাহ পাকই আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ দ্বারা মাটিকে সুজলা-সুফলা করে তোমাদের জন্যে তিনি রকমারী খাদ্য-দ্রব্যের ব্যবস্থা করেছেন'। (সূরা ইব্রাহীম)

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক আসমান সমূহকে শুধু যে প্রদীপ মালা দ্বারা সুসজ্জিত করে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তাই নয়; বরং আসমান থেকে বারি বর্ষণ করে তিনি মানুষের খাদ্য-দ্রব্যেরও ব্যবস্থা করেছেন।

وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

'আর তারকারাজিকে আমি শয়তানদের জন্যে মারণাস্ত্ররূপে তৈরী করে রেখেছি'।

আলোচ্য আয়াতের مصابيح শব্দটি مصباح এর বহুবচন। এর অর্থ হলো প্রদীপ। তাই এ আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছে, আসমানের তারকারাজি শুধু প্রদীপই নয়; বরং

কিছু তারকাকে আল্লাহ পাক শয়তানদের জন্যে মারণাস্ত্র রূপেও তৈরী করেছেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী ফেরেশতাগণ ঐ তারকা দ্বারা শয়তানদের প্রতি আঘাত করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, শয়তানদের উপরে তারকারাজিকেই যে নিক্ষেপ করা হয় তাই নয়; বরং তারকারাজি স্ব-স্থানেই থাকে এবং তা থেকে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ শয়তানদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়।[১]

আর শয়তানদের শাস্তি এ পৃথিবীতেই শেষ নয়; বরং কেয়ামতের দিনও তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শাস্তি, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণাঃ

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ۝

'আর তাদের জন্যে অগ্নির আযাবও প্রস্তুত করে রেখেছি'।

অর্থাৎ দোযখের ভয়ংকর শাস্তি তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এতদসত্বেও যারা আল্লাহ পাকের নাফরমান হয় তাদের উদ্দেশ্যে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۝

'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের শাস্তি, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান'।

অর্থাৎ শুধু যে শয়তানরাই দোযখের শাস্তি ভোগ করবে তা নয়; বরং এ পৃথিবীতে যে বা যারা কাফের হবে, তথা আল্লাহ পাককে অস্বীকার করবে, তাঁর বিধান অমান্য করবে, তারাই দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।[২]

কেননা, যারা কাফের তারা শয়তানেরই অনুসারী। অতএব, শয়তানের মত তাদেরও কঠিন শাস্তি হবে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১১২৫

২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৪
দোযখের শাস্তির বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৫৭-৬৪

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তারকারাজির তিনটি উপকারীতার কথা বর্ণিত হয়েছেঃ (১) আসমানের সৌন্দর্য বর্ধন (২) শয়তানদের জন্যে মারণাস্ত্র এবং (৩) মানুষের জন্যে পথ প্রদর্শন। এ তিনটি লক্ষ্যে আল্লাহ্ পাক তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন।

إِذَآ أُلْقُوا۟ فِيهَا سَمِعُوا۟ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُ ۝

'যখন তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তার গর্জন শুনতে পাবে, আর তা উত্তেজিত হতে থাকবে'।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۖ كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

'মনে হয়, দোযখ যেন ক্রোধে ফেটে পড়বে'। যখনই তাতে কোন দল নিক্ষিপ্ত হবে তখন দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি'?

এর দ্বারা দোযখের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। غيظ শব্দটির অর্থ হলো ক্রোধ, এ ক্রোধ কার? হতে পারে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে আল্লাহ্ পাকের ক্রোধ, অথবা দোযখের ফেরেশতাদের ক্রোধ, অথবা এর অর্থ হলো দোজখের অগ্নির ক্রোধ, যা আল্লাহর দুশমনদের প্রতি হবে।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় এবং আজীবন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, দৈহিক শক্তিতে বা অর্থ বলে বলীয়ান হয়ে বা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা এবং সর্বদা অন্যায় অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকে তাদের উদ্দেশ্যেই আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, কাফেরদেরকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা উত্তেজিত দোযখের গর্জন শুনতে পাবে, সে গর্জন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, মনে হবে যেন আকাশ ফেটে পড়ছে, আর যখনই কাফেরদের কোন দলকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, দোযখের রক্ষী ফেরেশতাগণ তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হে দূরাত্মা কাফেররা! দুনিয়ার জীবনে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে কোন রসূল কি আগমন করেননি? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী

এসেছিলেন–

فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ আমরা তাদেরকে মিথ্যা জ্ঞান করেছি এবং একথা বলেছি, আল্লাহ্ পাক কোন কিছুই নাযিল করেননি।

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۞

বরং তোমরাই চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছ।

অর্থাৎ কাফেররা নবী রসূলগণকে একথা বলেছে যে, তোমরা মহা ভুল ভ্রান্তিতে রয়েছ, আল্লাহ্ পাক কোন নবী প্রেরণ করেননি এবং কোন কিতাবও নাযিল করেননি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের এ বাক্যটি হবে ফেরেশতাগণের, দোযখের ফেরেশতাগণ কাফেরদেরকে বলবে, তোমরা নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে চরম পথভ্রষ্টতার পরিচয় দিয়েছ। এ পথভ্রষ্টতার কঠিন শাস্তি এখন ভোগ কর।

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞

'আর তারা আরো বলবে, 'হায় আক্ষেপ! যদি আমরা সেদিন নবী রসূলগণের কথা শুনতাম এবং সত্য অনুধাবন করতাম তবে (আজ) দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না'।

অর্থাৎ সেদিন দোযখবাসীরা অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলবে যে, দুনিয়ার জীবনে আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করিনি, তাঁদের কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছি, যদি সেদিন তাঁদের কথা স্মরণ করতাম, সত্যের আহবানে সাড়া দিতাম, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত জীবন-বিধান মেনে চলতাম, নবী রসূলগণের অনুসরণ করতাম তবে আজ এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না, তথা দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। দোযখীরা সেদিন ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হয়ে এভাবেই আক্ষেপ করবে, কিন্তু তা তাদের কোন কাজে আসবেনা।

এটি পবিত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, যা পরকালে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যাতে করে মানুষ আত্মরক্ষা করতে সচেষ্টা হয়।

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿١١﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١٢﴾ وَاَسِرُّوْا
قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٣﴾ اَلَا يَعْلَمُ
مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٤﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ
الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۭ وَاِلَيْهِ
النُّشُوْرُ ﴿١٥﴾ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ﴿١٦﴾ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ
يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۭ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ﴿١٧﴾

তরজমা

(১১) এরপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে, অতএব দোযখীদের প্রতি হোক লা'নত।

(১২) নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহা পুরস্কার।

(১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন।

(১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(১৫) তিনিই তো আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বশীভূত করে রেখেছেন। তাই তোমরা তার পথ সমূহে চলাফেরা কর এবং আল্লাহ পাকের দেয়া রিয্ক থেকে আহার কর। তাঁরই নিকট তোমাদেরকে উত্থিত হতে হবে।

(১৬) যিনি আসমানে রয়েছেন তোমরা কি তাঁর তরফ থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? আর তা থর থর করে কাঁপতে থাকবে।

(১৭) অথবা যিনি আসমানে রয়েছেন, তোমরা কি তাঁর তরফ থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে রয়েছ যে, তিনি তোমাদের প্রতি পাথুরে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে দোযখে নিক্ষিপ্ত কাফেরদের একটি কথার উল্লেখ রয়েছে, যা তারা দোযখে প্রবেশ করে বলবে।

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

'যদি আমরা নবী রসূলগণের কথা শ্রবণ করতাম এবং সত্য অনুধাবন করতাম, তবে দোযখবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না'। এভাবে কাফেররা সেদিন তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞

"এরপর তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে, অতএব দোযখীদের প্রতি হোক লা'নত"।

কাফেররা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এভাবে দলিল কায়েম করা হবে যে, মানুষ নিজেই উপলব্ধি করবে যে সে দোযখের উপযুক্ত। আর এ অবস্থাটিকেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, অপরাধীরা নিজেরাই তাদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং এ-ও উপলব্ধি করবে যে, বিনা দোষে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়নি, কৃত অন্যায় অনাচারের জন্যে তারা অনুতপ্ত হবে কিন্তু তা তাদের কোন উপকারে আসবেনা, সেদিন তাদেরকে বলা হবে,

فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অতএব, লা'নত হোক দোযখীদের প্রতি, তোমরা দূর হও, দোযখই তোমাদের প্রকৃত ঠিকানা। অতএব, তোমরা ধ্বংস হও।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, দোযখে "সোহক" নামক একটি স্থান রয়েছে, আলোচ্য আয়াতাংশে সে স্থানটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো–

فاسحقهم الله سحقا

'আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন', যদিও কাফেররা তাদের সমগ্র জীবনের অপরাধ স্বীকার করবে কিন্তু তাদেরকে সেদিন আল্লাহ পাকের রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হবে, তাদের প্রতি হবে লা'নত। আর লা'নত এর তাৎপর্যই হলো রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া, কেননা তারা দুনিয়ার জীবনে রহমত লাভের যোগ্য কোন কাজ করেনি, তাই তাদের শাস্তি হবে অবধারিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞

'নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত এবং মহা পুরস্কার'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, কেয়ামতের কঠিন দিনে দোযখের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাদের যে অনুতাপ এবং আক্ষেপ হবে, তার উল্লেখ রয়েছে।

আর এ আয়াত থেকে ঈমানদার মুত্তাকী, পরহেযগার লোকদের শুভ-পরিণতির ঘোষণা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

'নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে'।

মোমেনদের জন্যে মাগফেরাত এবং পুরস্কারের ঘোষণা

যারা আল্লাহ পাককে না দেখে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করেছে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা প্রাপ্তির ঘোষণা এবং পুরস্কার লাভের সুসংবাদ।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৪-৫

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা আল্লাহ পাকের সেই আযাবকে ভয় করে যা এখনো তাদের প্রতি আসেনি, আযাব তারা দেখেনি অথচ সে আযাবকে তারা ভয় করে।

অথবা এর অর্থ হলো, যারা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থেকে আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদতে থাকে, আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলের জন্যে লাভ করবে তারা আখেরাতে অনন্ত অসীম নেয়ামত।

মুনাফেকরা মানুষের সম্মুখে নিজেদের ঈমানের কথা প্রকাশ করতো, আর যখন একা হতো তখন তাদের বেঈমানী প্রকাশ পেত।

আর মোমেনের বৈশিষ্ট্য হলো এই, তারা সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ পাকের ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দণ করতে থাকে।

অথবা "গায়ব" শব্দের অর্থ হলো, মানব দেহের সে অংশটি যা গোপন রয়েছে, অর্থাৎ অন্তর।

এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত থাকে তাদের জন্যে রয়েছে মাগফেরাত, অর্থাৎ তাদের গুনাহ মাফ করা হয় এবং তাদের জন্যে রয়েছে অনেক সওয়াব, অনেক নেয়ামত।

যেভাবে পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে, ঠিক এমনিভাবে এ আয়াতে পরহেযগার মোমেনদের জন্যে মাগফেরাত এবং অনেক সওয়াবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ পাকের ভয়। যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে সে অবশ্যই আল্লাহ পাককে ভয় করবে। ঈমান এবং আল্লাহর ভয় একটি আরেকটির পরিপূরক, আল্লাহ পাকের প্রতি যার ঈমান থাকবে, তার অন্তরে অবশ্যই আল্লাহ পাকের ভয় সৃষ্টি হবে। আর এটিই জীবন–সাধনায় চির সাফল্য লাভের একমাত্র পথ। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট ঘোষণা, এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۝ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে সব ঈমানদারগণ যারা নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়'।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে আল্লাহ পাকের প্রতি ভয়। আর এ ভয়ের কারণে প্রকৃত মোমেন একাকী থাকলেও পাপাচারে লিপ্ত হয়না, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে গাফলত করেনা।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে এবনে মরদবিয়ার সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াতে যাঁদের কথা বলা হয়েছে যে, পরওয়ারদেগারকে না দেখে তাঁরা ভয় করে, তাঁরা হলেন হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবু ওবায়দা এবনুল জাররাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।

এবনুল মুনজের এবং এবনে জোরায়েহ (রঃ) মাগফেরাত এবং পুরস্কারের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো জান্নাত।[১]

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۞

'তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মনের কথা খুব ভালভাবেই জানেন'।

শানে নযুল

তিরমিজী শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ কাফেররা পরস্পরের মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলতো এবং একে অন্যকে সতর্ক করতো, নিম্নস্বরে কথা বল, আল্লাহ তাআলা শুনে ফেললে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জানিয়ে দেবেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাঈল (আঃ) এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সব খবর দিয়ে দিতেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

وَاَسِرُّوْا

অর্থাৎ তোমরা চুপিসারে কথা বল অথবা উচ্চস্বরে সবই আল্লাহ পাক জানেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন থাকেনা। তিনি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৪-৭৫

اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক মনের কথা খুব ভাল করেই জানেন'।

অর্থাৎ তোমাদের মনের কথা মুখে আনার পূর্বেই তিনি জানেন। নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে কথা বলার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না'?

অর্থাৎ তিনিই যে মানুষের স্রষ্টা, তাই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জানবেন না, তবে কে জানবে? মানুষের নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে তিনিই সম্পূর্ণ অবগত, কেননা মানুষকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, মানুষের মনের নিভৃত কোণে সংরক্ষিত কোন কথাও তাঁর নিকট গোপন নেই। সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, দেদীপ্যমান।

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۞

'তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত'। তিনিই সর্বজ্ঞানী, তিনিই অন্তর্যামী।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যিনি সকল গোপন বিষয়ে অবগত, তিনিই لطيف অতএব, আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে, যিনি সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত, তিনি জানবেন না তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে, এমনটি হতে পারেনা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন, যে কোন জিনিস তৈরী করে সে তার সম্পর্কে স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকে। যেহেতু আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, এমনকি মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যা কিছু থাকে, সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল, কেননা মানব মনের স্রষ্টাও আল্লাহ পাকই।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৬৬

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۞

'তিনিই তো আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে বশীভূত করে রেখেছেন। তাই তোমরা তার পথ সমূহে চলাফেরা কর এবং আল্লাহ পাকের দেয়া রিয্ক থেকে আহার কর। তাঁরই নিকট তোমাদেরকে উত্থিত হতে হবে'।

এ সূরার শুরুতেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা রয়েছে। এরপর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁর অপার রহমত রয়েছে, আর পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাঁর জ্ঞানের কোন অন্ত নেই।

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, মানব জাতির প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের কথা লক্ষ্য কর হে বিশ্ববাসী! আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে যমীনকে বশীভূত এবং অনুগত করে দিয়েছেন, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা তার উপর চলাফেরা করতে পার, এই যমীনেই তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাক রিয্ক রেখে দিয়েছেন, যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্য তোমরা যমীন থেকে অন্বেষণ কর এবং ভোগ করতে থাক, যেমন সূরা বাকারায় এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

'আর তোমাদের জন্যে রয়েছে যমীনে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান এবং ভোগ সম্পদ, কিন্তু মনে রেখ পৃথিবীর এ অবস্থান কারো জন্যেই চিরকালীন নয়; বরং এক নির্ধারিত সময়ের পরই জীবনের এ খেলা শেষ হয়ে যাবে, অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের জন্যে তাঁর দরবারে শোকর গুজার হওয়া যেমন কর্তব্য, তেমনি জীবনের এ সীমিত সময়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে সম্বল সংগ্রহ করাও একান্ত করণীয় কাজ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা কর, তবে তিনি তোমাদেরকে এভাবে রিয্ক দান করবেন যেভাবে পাখীদেরকে রিযক দিয়ে থাকেন, প্রত্যেকটি পাখী তার নীড় থেকে অভুক্ত অবস্থায় বের হয় এবং

পেট ভরে ফিরে আসে। পাখীদের সকাল সন্ধ্যায় গমনাগমন এবং তাদের রিয্‌কের অনুসন্ধান সবই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসারই অন্তর্ভুক্ত।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন, সেজন্যে মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র অনায়াসে চলাফেরা করে জীবন-যাপন করে। কিন্তু যারা কাফের, যারা নাফরমান, তাদের আল্লাহ্ পাককে ভয় করা উচিত আর এ সত্য মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ পাক এ পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, এটি তোমাদের প্রতি তাঁর দান।

কিন্তু তোমরা যদি তাঁর নাফরমানী করতে থাক, তবে তিনি যমীনকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন। অতএব, আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা।[২] আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ۞

যিনি আসমানে রয়েছেন, তোমরা কি তাঁর তরফ থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে রয়েছ, যে, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না? আর তা থর থর কাঁপতে থাকবে।

অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! মনে রেখো আল্লাহ্ পাক যেমন অনন্ত অসীম করুণাময়, যাঁর দয়ার কোন সীমা নেই, ঠিক তেমনি তাঁর রাগ-রোষও অত্যন্ত বেশী। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ اَنِّىٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۞ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

(হে রসূল!) আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময় (আর একথাও জানিয়ে দিন) যে, আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

অতএব, যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের কঠোর শাস্তি। তবে কি তারা নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আযাব পতিত হবে না; বরং সম্ভাবনা আছে

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৬-৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৬৮

যে, তিনি যমিনকে ধ্বসিয়ে দেবেন, যমিন থর থর কাঁপতে থাকবে এবং তারা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

'অথবা যিনি আসমানে রয়েছেন, তোমরা কি তাঁর তরফ থেকে নিঃশঙ্ক হয়ে গেছ যে তিনি তোমাদের প্রতি পাথুরে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে, কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী'।

অর্থাৎ যারা কাফের, যারা অবাধ্য, নাফরমান, তাদের ভয় করা উচিত, যে কোন সময় আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি আযাব নাযিল করতে পারেন। তাদের প্রতি পাথুরে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন।

বস্তুতঃ তখনই তারা মর্মে মর্মে অনুভব করবে যে, আল্লাহ্ পাকের আক্রোশ এবং শাস্তি কেমন হয়।

ইতোপূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্পের কারণে বহু মানুষ এবং তাদের সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এবং পাথুরে বৃষ্টি বর্ষণ করেও কোন কোন জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। পবিত্র কোরআন পূর্বেই এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, যাতে করে বিশ্ববাসী সতর্ক হয় এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত থাকে।

আলোচ্য আয়াতে مَّن فِي السَّمَاءِ কথাটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, কাফের মুশরেকদের প্রতি যখন আযাব নাযিল হয় তখন তা সাধারণতঃ আসমান থেকেই হয়, এমনিভাবে যখন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত হয়, তখন তা-ও আসমান থেকেই নাযিল হয়, এ কারণেই এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ

এর দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আবু মুসলিম (রঃ) বলেছেন, আরবরা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, তবে এর পাশাপাশি তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, তিনি আসমানে আছেন। আর এজন্যেই এভাবে বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা কি সেই আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করেনা? যিনি আসমানে আছেন।[১]

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য আয়াতের نذير শব্দটি منذر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর তা হলো ভয় প্রদর্শনকারী, অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

এ মত পোষণ করতেন তফসীরকার আতা (রঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ।

فَسَتَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ অচিরেই তোমরা জানতে পারবে আমার রসূলকে এবং তাঁর সত্যতা সম্পর্কেও তোমরা অবগত হবে, কিন্তু সে অবগতি তোমাদের কোন কাজে আসবেনা।[২]

وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٨﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا
اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۛ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۭ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ﴿١٩﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۭ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢٠﴾
اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۭ بَلْ لَّجُّوْا
فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰي وَجْهِهٖٓ
اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٢﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৭০

তরজমা

(১৮) নিশ্চয় এদের পূর্ববর্তীরাও অবিশ্বাস করেছিল, অতএব কেমন হয়েছিল আমার আযাব।

(১৯) তারা কি তাদের উপরে পক্ষীকূলকে ডানা মেলে এবং ডানা গুটিয়ে চলতে দেখেনা? করুণাময় আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখেনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব বিষয়ে সব কিছুই লক্ষ্য রাখেন।

(২০) করুণাময় আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা রয়েছে বিভ্রান্তিতে।

(২১) এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করবে? যদি তিনি তোমাদের রিয্ক বন্ধ করে দেন, বরং তারা আসলে অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে অবিচল রয়েছে।

(২২) যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে? অথবা যে ব্যক্তি একটি সরল সঠিক পথে চলে এবং সোজা পথে চলে?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে ঐ সতর্কবাণীকে আরো জোরদার করা হয়েছে অতীতের দৃষ্টান্ত দ্বারা, অর্থাৎ ইতোপূর্বে যে সব কাফেররা পৃথিবীতে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে তাদের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ۞

'নিশ্চয় এদের পূর্ববর্তীরাও অবিশ্বাস করেছিল, অতএব কেমন হয়েছিল আমার আযাব'।

অতীতের কাফেরদের শাস্তির কথা স্মরণ কর

অতীতে যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছিল তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছিল, তা স্মরণ করে আত্মসংশোধনে সচেষ্ট হও।

আলোচ্য আয়াতের نكير শব্দটির অর্থ হলো অসন্তুষ্টি, অর্থাৎ তাদের অন্যায় আচরণের কারণে তারা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি অর্জন করে। পরিণামে তারা কোপগ্রস্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যেমন আদ, সামুদ জাতি, লুত (আঃ)-এর জাতি এবং নূহ (আঃ) এর জাতি। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই তাদেরকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় করা হয়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতে একদিকে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে, অন্যদিকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে এতে রয়েছে সান্ত্বনা। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যারা তাঁর প্রতি এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। আর সান্ত্বনা এ মর্মে যে, কাফেরদের এ অন্যায়-অনাচারের অবসান ঘটবে এবং তাদের শাস্তি অবধারিত।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ط

'তারা (মক্কার কাফেররা) কি তাদের উপরে পক্ষীকূলকে ডানা মেলে এবং ডানা গুটিয়ে চলতে দেখেনা'?

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের পূর্বে বহু জাতি যারা তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল, তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ ধ্বংস হয়েছে। তোমাদের উপদেশ গ্রহণের জন্যে তাদের ধ্বংসের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরা কি পক্ষীকূলকে দেখনা, তারা অন্তরীক্ষে উড়ে বেড়ায়, কখনো তারা তাদের ডানা মেলে রাখে, আবার কখনো তা গুটিয়ে ফেলে। তাদের দেহ-ভারের কারণে আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়না, অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে, মনের সুখে তারা আকাশে উড়ে বেড়ায়, পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিও তাদেরকে মাটিতে ফেলে দেয়না। এর একমাত্র কারণ দয়াময় আল্লাহ পাকের একান্ত দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ط

'করুণাময় আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদেরকে স্থির রাখেনা'।

আলোচ্য আয়াতাংশে الرحمن। শব্দটির তাৎপর্য হলো এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যে, আল্লাহ পাকের রহমতই শুধু পক্ষীকূলকে আকাশে উড়ে বেড়ানোর সুযোগ দিয়েছে।

এ পর্যায়ে আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, পাখীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞদেরকে শাস্তি প্রদানে সর্বদাই সক্ষম এবং তারা এ শাস্তির যোগ্যও বটে, কিন্তু যেভাবে পক্ষীকূলকে দয়াময় আল্লাহ্ পাকের রহমত অন্তরীক্ষে স্থির করে রাখে, ঠিক তেমনি করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করার কারণ হয়ে আছে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমত কি অহরহ দেখছে না? তাদের মাথার উপর পাখীরা উড়ে বেড়ায়, আমি তাদের জন্যে বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছি, পাখীরা আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে আর তা থাকে আমার একান্ত দয়ায়, রহমতে এবং নেয়ামতে। তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে যেন তারা আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে।

অতএব, কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ পাকের এসব কুদরত হেকমত লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর গুজার হওয়া।

اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍۢ بَصِیْرٌ۝

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব বিষয়ে সব কিছুই লক্ষ্য রাখেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর আরো একটি অর্থ হতে পারে যে, তিনি সৃষ্টি জগতের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[২]

আর আল্লাহ্ পাক যেখানে যা ইচ্ছা তাঁর মর্জি প্রকাশ করে থাকেন। নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। তিনিই পক্ষীকূলকে অন্তরীক্ষে উড়ে বেড়ানোর ক্ষমতা দান করেছেন। তাদেরকে বাতাসের ঢেউয়ের মোকাবেলা করার এবং এত উঁচুতে তাদের দেহ-ভার ধরে রাখার তৌফিক দিয়েছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে মানব জাতির শিক্ষা গ্রহণের অনেক মূল্যবান উপাদান।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ۝

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৭৩১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৭১

'করুণাময় আল্লাহ পাক ব্যতীত এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা রয়েছে বিভ্রান্তিতে'।

কাফেররা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতো না এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঈমান আনয়নের যে আহ্বান জানাতেন, তার প্রতিও তারা ভ্রুক্ষেপ করতো না। এর দু'টি কারণ ছিলঃ (১) তাদের নিকট অর্থ-সম্পদ ছিল এবং তাদের সামরিক শক্তিও ছিল। তাই তারা ঈমান আনয়নে প্রস্তুত হতোনা। (২) তারা বলতো, আমাদের মূর্তিগুলো হলো সঠিক কল্যাণ লাভের উপকরণ এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করার বাহন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ

'জিজ্ঞাসা করি, দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী রয়েছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে'?

একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট, এমন কেউ নেই যে তাদেরকে আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় সাহায্য করতে পারে এবং আযাবে এলাহী থেকে রক্ষা করতে পারে। অতএব, একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে, কাফেররা চরম বিভ্রান্তিতে রয়েছে। যদি বলা হয় যে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে তবে তা অত্যুক্তি হবেনা। মূলতঃ তারা শয়তানের ধোকায় রয়েছে। শয়তান তাদেরকে এই বলে ধোকা দিত যে, আল্লাহ পাক আযাব নাযিল করবেন না, অথচ আল্লাহ পাক যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে সক্ষম। ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ, আবু জেহেল গয়রহ যথাসময়ে এ দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করেছে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ

'আর নিশ্চয় আখেরাতের আযাব অত্যন্ত কঠিন'।

আর আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করার শক্তি কারোই নেই।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ۞

'এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করবে? যদি তিনি তোমাদের রিয্ক বন্ধ করে দেন; বরং তারা আসলে অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে অবিচল রয়েছে'।

ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কাফেরদের শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হবার অন্যতম কারণ ছিল তাদের অর্থ-সম্পদ, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান না থাকার কারণে তারা এ সত্য উপলব্ধি করতো না যে, রিয্কের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন, তিনি যাকে রিয্ক দান করেন, সে-ই তা পায় আর তিনি যাকে অভাবগ্রস্ত করতে চান অথবা যার রিয্ক বন্ধ করে দিতে চান, কেউই তাকে রিয্ক সরবরাহ করতে পারেনা। এমনকি এ-ও দেখা যায় যে, কেউ কেউ অগাধ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কিছুই আহার করতে সক্ষম হয়না। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ যদি আল্লাহ্ পাক তোমাদের রিয্ক বন্ধ করে দেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তোমাদেরকে রিয্ক দান করতে পারে।

بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ

'বরং তারা আসলে অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে অবিচল রয়েছে'।

মূলতঃ কাফেররা কুফর ও শেরকের কারণে এবং তাদের দুষ্ট প্রবৃত্তির দরুণ সত্য পথে আসেনা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সত্য আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা এবং পৃথিবীর জঘন্যতম কর্ম শেরকের অন্ধকারে সর্বদা তারা হাবুডুবু খেতে থাকে।

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

'যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে? অথবা যে ব্যক্তি একটি সরল সঠিক পথে চলে এবং সোজা পথে চলে'।

এ আয়াতে মোমেন ও কাফেরের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি মাথা সোজা করে সরল সঠিক পূণ্য পন্থায় চলে, আঁকা বাকা পথে যায়না, সে অবশ্যই মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যায়, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সরল-সঠিক পথে চলতে চায়না, সঠিক পথ চেনেও না, যে চেনে তাকে অনুসরণ করেনা, এমতাবস্থায় উপুড়মুখী হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পথ চলে, মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছা যে তার পক্ষে কখনও সম্ভব হবেনা, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

যে প্রকৃত মোমেন, খাঁটি তওহীদবাদী সে সরল সঠিক পথে চলে, ফলে সে জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়।

পক্ষান্তরে, কাফের মুশরেকরা কখনো সঠিক পথে চলেনা, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণও করেনা, কাজেই তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তাদের শাস্তি অবধারিত।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এতে আখেরাতে মোমেন ও কাফেরদের যে অবস্থা হবে তার একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু কাফেররা আল্লাহ পাকের বিধানকে অমান্য করতো সেজন্যে তাদেরকে উপুড়মুখী অবস্থায় হাযির করা হবে, তারা হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, কেননা দুনিয়াতে তারা সরল-সঠিক পথে চলেনি। আর যারা মাথা সোজা করে সহজ সরল পথে তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথে চলবে, তারা কেয়ামতের দিনও সরাসরি জান্নাতের দিকে চলে যাবে।

আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ দৃষ্টান্ত সবার জন্যে নয়; বরং বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যে, কাফেরদের মধ্যে আবু জেহেলকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর ঈমানের প্রতীক ও আহবায়ক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার আতা (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর দ্বারা আবু জেহেল এবং হামজা এবনে আবদুল মোত্তালেবকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর একরামা (রঃ) বলেছেন যে, আয়াতে যে কাফেরের কথা বর্ণিত হয়েছে সে হলো আবু জেহেল, আর যে মোমেনের কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ)।[১]

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষ উপুড়মুখী হয়ে কিভাবে চলবে? তখন তিনি এরশাদ করেন, যিনি পায়ের উপর ভর করে চলার তৌফিক দিয়েছেন, তিনিই উপুড়মুখী হয়ে চলার ব্যবস্থা করবেন।[২]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৭৩
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৯

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَ
الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى
الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا
نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ﴿٢٧﴾ قُلْ اَرَءَيْتُمْ
اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ
مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ
تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ
اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৩) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি এবং অন্তঃকরণ, কিন্তু তোমরা অত্যন্ত সামান্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক।

(২৪) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

(২৫) আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে কখন? (কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে)

(২৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই নিকট রয়েছে, আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

(২৭) যখন কাফেররা তা (কেয়ামত অথবা আযাব) আসন্ন দেখবে তখন তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এটি তাই যা তোমরা কামনা করছিলে।

(২৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন, অথবা আমাদের প্রতি রহমত করেন, তবে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে?

(২৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তিনি অত্যন্ত বড় দয়ালু, আমরা তাঁর প্রতিই ঈমান এনেছি আর তাঁর প্রতিই ভরসা করেছি, অতএব, তোমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে, কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(৩০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি পানি তোমাদের নাগালের বাইরে ভূগর্ভে চলে যায়, তবে কে আছে যে তোমাদেরকে প্রবহমান পানি এনে দেবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঈমানদার ও পরহেযগার লোকদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের বর্ণনা ছিল আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক মোমেন ও কাফেরদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই।

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের আরো কুদরত হেকমত এবং দানের বর্ণনা রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط

আল্লাহ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনিই তাকে জীবন ও জীবনের যাবতীয় উপকরণ দান করেছেন, মানুষের হাত-পা, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা, হৃদয়-মন এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সব কিছুই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, যা তিনি চাওয়ার পূর্বেই তাকে দান করেছেন।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

(তিনিই তাকে শ্রবণ শক্তি দান করেছেন যেন সে উপদেশ শ্রবণ করে।)

وَالْاَبْصَارَ

তিনিই তাকে দান করেছেন দৃষ্টি শক্তি, যাতে করে সে আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্য দেখতে পায় এবং আল্লাহ্ পাকের কালাম দেখে এবং পাঠ করে।

وَالْاَفْـِٕدَةَ

এমনিভাবে তিনি মানুষকে দান করেছেন তার অন্তর, যেন সে দানের প্রতি লক্ষ্য করে দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۞

কিন্তু তোমরা অত্যন্ত সামান্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক।

আল্লাহ্ পাকের দরবারে শোকর গুজার হওয়া কর্তব্য

মানুষের প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, কিন্তু মানুষ অতি অল্পই আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দানের শোকর গুজারীর একটি পন্থা হলো দানকে মহান দাতার মর্জি মোতাবেক ব্যয় করা, কিন্তু মানুষ তার শ্রবণ শক্তি বা দৃষ্টি শক্তি এবং বিবেক বুদ্ধি আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেক ব্যয় করেনা; বরং তাঁর অবাধ্যতায় এবং নাফরমানীতে ব্যয় করে থাকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা অতি সামান্যই আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় কর। মানুষকে আল্লাহ্ পাক যা কিছু দান করেছেন যেমন বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টি শক্তি প্রভৃতি, এর কোনটিই যদি আল্লাহ্ পাক না দিতেন, তবে পৃথিবীতে কেউ তাকে তা দিতে পারেনা, যে জন্মান্ধ পৃথিবীতে কেউ তাকে চক্ষুষ্মান করতে পারেনা, যাকে আল্লাহ্ পাক বাক শক্তি বা শ্রবণ শক্তি দেননি, কেউ তাকে এসব শক্তি দিতে পারেনা। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার থাকা।

قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۞

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই তো তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে'।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই পৃথিবীতে মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং অবশেষে তিনিই তাদের সকলকে গুটিয়ে নেবেন, তথা হাশরের ময়দানে তাদের সকলকে একত্রিত

করবেন। যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি পরবর্তীতে তাদেরকে একত্রিত করবেন, এটিই স্বাভাবিক, তাঁর পক্ষে তা আদৌ কঠিন কাজ নয়।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য সূরার শুরু থেকে আখেরাতের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ .....الْغَفُوْرُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মৃত্যু ও জীবনকে এজন্যে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে ভাল কাজ করে? আর তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল।

এরপর শুরু হয় আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সমূহের বর্ণনা এবং মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দানের কথা এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আর তাঁর নিকটই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে'।

অর্থাৎ যাঁর আদেশে এ পৃথিবীতে মানব জাতির আগমন হয়েছে তাঁর নিকটই তাকে গমন করতে হবে। যিনি সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে একত্রিত করা কঠিন কিছু নয়।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۞

'আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে কখন (কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে)'?

কেয়ামত অনিবার্য

কাফেররা কেয়ামতের কথা শুনে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতো, কেয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্ত কখন আসবে? এখুনি কেন তা আসছে না? কেয়ামতের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তার দিন- ক্ষণ বল। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ص وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে, আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সত র্ককারী মাত্র'।

অর্থাৎ কেয়ামত যে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই, এটি ধ্রুব সত্য তবে এর সঠিক সময়কাল একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন, তিনি ব্যতীত এ সম্পর্কে কেউ জানেনা। আমি তো সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী, আমার কাজ তোমাদেরকে সতর্ক করা।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এখানে দু'টি কথা রয়েছেঃ (এক) কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান (দুই) কেয়ামত সংঘঠিত হওয়ার সময়ের জ্ঞান। প্রথম জ্ঞানটি আমার কাছে অর্থাৎ কেয়ামত সংঘটিত হওয়া অনিবার্য সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তোমাদেরকে সতর্ক করতে আমার এ জ্ঞানই যথেষ্ট।

আর দ্বিতীয় বিষয়ের জ্ঞান তথা কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের জ্ঞান শুধু এক আল্লাহ্ পাকেরই নিকট রয়েছে। তিনি ব্যতীত তা কেউ জানেনা।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ কথাটির অর্থ হলো, কবে আসবে সেই প্রতিশ্রুত আযাব, যে সম্পর্কে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ আযাব আসবে এবং অবশ্যই আসবে, কিন্তু কখন আসবে একথা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যারা আল্লাহর আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চায় অথবা কেয়ামত কবে হবে জানতে চায় তাদেরকে জানিয়ে দিন, কেয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ্ পাকই জানেন, আর কেউ নয়। আমার কাজ হলো তোমাদেরকে সতর্ক করা, তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো আল্লাহ্ পাকের আযাব, সে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি।[১]

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ۞

'যখন কাফেররা তা (কেয়ামত অথবা আযাব) আসন্ন দেখবে তখন তাদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এটি তাই যা তোমরা কামনা করছিলে'।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৭৪
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৮

অথবা এর অর্থ হলো, এটি তাই যে সম্পর্কে তোমরা দাবী করতে যে, কেয়ামত হবেনা।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, যারা থাকে পাপাচারে লিপ্ত, তাদের শাস্তি হয় দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে। কিন্তু নবী রসূলগণ যখন তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন তা তারা বিশ্বাস করেনা এবং এ সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে।

কাফেরদের চেহারা বিকৃত হবে

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, ঐ কাফেররা যখন আল্লাহ্ পাকের আযাব দেখতে পাবে অথবা কেয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন তারা এত ভীত সন্ত্রস্ত হবে যে, ভয়-ভীতির কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ এবং বিকৃত হয়ে যাবে। তখন তাদের হৃদপিন্ড দুরুদুরু করে কাঁপতে থাকবে, তখন তাদেরকে বলা হবে, এ আযাবই তো তোমরা কামনা করছিলে।

অথবা এর অর্থ হলো, এ কেয়ামতকেই তো তোমরা অস্বীকার করেছিলে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, চেহারা বিবর্ণ হওয়ার অবস্থা হলো এমন, যখন কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তদ্রুপ এ কাফেরদের অবস্থাও তেমন হবে, যখন তারা আসমানী আযাব দেখবে অথবা কেয়ামত আসন্ন হবে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন, অথবা আমাদের প্রতি রহমত করেন, তবে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে'।

মক্কার কাফেররা মনে মনে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কামনা করতো, তারা ধারণা করতো, যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়ে যায়, তবে ইসলামের আলো চিরতরে নিস্প্রভ হয়ে যাবে এবং ইসলামের আহ্বান থেকে তারা রেহাই পাবে, আর কেউ তাদেরকে এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাবে না, তারা বিনা দ্বিধায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকতে পারবে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জবাবেই আল্লাহ্ পাক

এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা যে আপনার মৃত্যু কামনা করে, তাদেরকে বলে দিন, যদি আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার সাহাবীদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, অথবা আমাদের মৃত্যুকে বিলম্বিত করে আমাদের প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমরা কি আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নাজাত পাবে? কে তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করবে? তাই এরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা যে আমার মৃত্যু কামনা করছো, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবেনা, তোমাদের মূর্তিগুলো আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। আমি পৃথিবীতে থাকি বা বিদায় গ্রহণ করি, সকল অবস্থায়ই তোমাদেরকে তোমাদের অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই হবে, কেউ তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, তোমাদের নাজাত পাওয়ার একটি মাত্র পথ আছে তাহলো, কৃত অন্যায় থেকে তওবা করা, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, আমার নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রতি ঈমান আনা এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে তার জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করা, শুধু এ পথই তোমাদের জন্যে নাজাত বয়ে আনবে।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তিনি অত্যন্ত বড় দয়ালু, আমরা তাঁর প্রতিই ঈমান এনেছি, আর তাঁর প্রতিই ভরসা করেছি, অতএব তোমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে, কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যাঁর কুদরত হেকমত, অসাধারণ ক্ষমতা এবং একচ্ছত্র কর্তৃত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি অত্যন্ত করুণাময়, বড়ই দয়াবান, আমরা

তাঁর প্রতিই ঈমান এনেছি এবং তাঁর প্রতিই ভরসা করেছি, আমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী করি, তিনিই মহান দাতা, তাঁর অনন্ত অসীম দানের কারণে প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য হলো, শুধু তাঁরই বন্দেগী করা।

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

'অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে'।

অর্থাৎ যখন তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবে গ্রেফতার অবস্থায় দেখবে আর আমাদেরকে দেখবে শান্তি ও নেয়ামতের মধ্যে, তখন তোমরা মর্মে মর্মে অনুভব করবে যে, তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট, আর আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুলের বরকতে ইনশাআল্লাহ আযাব থেকে সংরক্ষিত থাকবো। তখন তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, কার কি পরিণাম হয়েছে, কার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, কে চিরকালীন শান্তি লাভের যোগ্য, আর কে চিরশাস্তি ভোগে বাধ্য।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি পানি তোমাদের নাগালের বাইরে ভূগর্ভে চলে যায়, তবে কে আছে যে তোমাদেরকে প্রবহমান পানি এনে দেবে'।

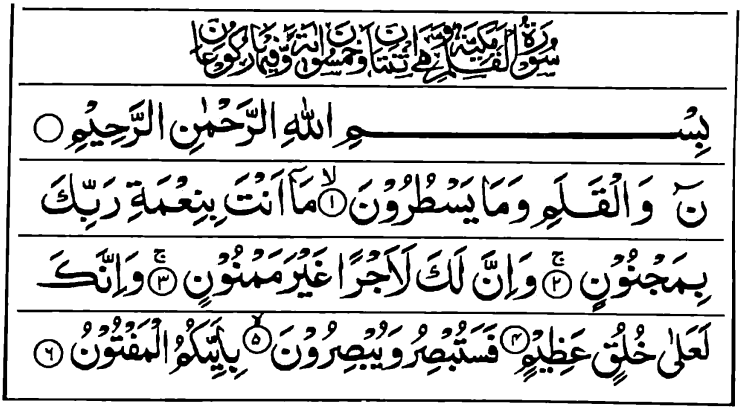
আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের আরো একটি নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষের জীবন ও মৃত্যু, জীবনের যাবতীয় উপকরণ সকল সুখ-সম্পদ, এক কথায় সবকিছুই আল্লাহ পাকের দান, এসব কিছুর নিয়ন্ত্রণ এক আল্লাহ পাকেরই হাতে, এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের অন্যতম নেয়ামত পানির প্রতি লক্ষ্য কর, পানির অপর নাম প্রাণ, পানি পান করেই মানুষের প্রাণ রক্ষা পায় কিন্তু সেই পানি যদি আল্লাহ পাক শুকিয়ে দেন, কূপ ঝর্ণা তো দূরের কথা, কোথাও যদি পানির সন্ধান না পাওয়া যায়, এমনকি পানি চলে যায় তোমাদের নাগালের বাইরে, তখন তোমরা পিপাসায় কাতর হয়ে যাবে, মৃত্যু তোমাদের কাছে চলে আসবে, ঠিক এমনিভাবে হেদায়েতের নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হচ্ছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে, যদি তোমাদের অন্যায় আচরণের কারণে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে এই হেদায়েতের পথ বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের ইহকাল পরকাল সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যেভাবে আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তোমাদেরকে প্রাণ রক্ষাকারী প্রবহমান পানি দিতে পারেনা, ঠিক তেমনি

হেদায়েতের ঝর্ণাধারাও যদি আল্লাহ পাক বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে তা ভেবে দেখ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হেদায়েতের সকল ঝর্ণাধারা বন্ধ হয়ে গেছে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর হেদায়েতই এখনো রয়ে গেছে, এটি করুণাময় আল্লাহ পাকের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঝর্ণাধারা থেকে যারা পান করবে, তাদের আধ্যাত্মিক জীবনই অব্যাহত থাকবে কিন্তু যারা হতভাগা, তারা এ আকাঙ্ক্ষা করে যেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ঝর্ণাধারাও বন্ধ হয়ে যায়, তখন কে তাদেরকে হেদায়েতের উপকরণ সরবরাহ করবে? অতএব, অনতিবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন কর এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে ঈমান ও নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কলম


سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّثَمَانِيَةُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ﴿۱﴾ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

بِمَجْنُوْنٍ ۚ﴿۲﴾ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ﴿۳﴾ وَاِنَّكَ

لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴿۴﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ﴿۵﴾ بِاَيِّيْكُمُ الْمَفْتُوْنُ ﴿۶﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) নুন। কলমের নামে শপথ! এবং সে বিষয়ের যা কিছু তারা লিখে থাকে।

(২) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।

(৩) আর নিশ্চয় আপনার জন্যে এমন বিনিময় রয়েছে, যা কখনো নিঃশেষিত হবেনা।

(৪) আর নিশ্চয় আপনি চরিত্র মাধুর্যের উচ্চতম স্তরে রয়েছেন।

(৫) অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখবে।

(৬) তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত?

সূরা কলম প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ, এতে দু' রুকু এবং ৫২টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ৩০০ বাক্য ও ১,২৪৬ অক্ষর রয়েছে।

মূল বক্তব্য

এ সূরার মূল বক্তব্য হলো প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালত প্রমাণ করা। যারা তাঁর রেসালত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতো, তাদের সন্দেহ দূরীভূত করা। এ সূরা শুরু হয়েছে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানের বর্ণনার মাধ্যমে। কাফেররা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে ভিত্তিহীন এবং আপত্তিকর মন্তব্য করতো, তার জবাব দেয়ার পাশাপাশি তাদের শাস্তির ঘোষণাও রয়েছে এ সূরায়। এরপর কেয়ামতের অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে কাফেরদের নির্যাতন-উৎপীড়নে সবর অবলম্বন করার জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে।

এ সূরার আমল

নূন, ছোয়াদ, ক্বাফ-এসব হলো হরফে মোকাত্তয়াত। এ অক্ষরগুলো যদি আংটির মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়ে কোন ব্যক্তি নিজের কাছে রাখে, তবে তার প্রয়োজন পূরণ করা হয় এবং তার জীবনে কল্যাণ লাভ হয়।

সূরা নূন নামাজে পাঠ করলে অভাব-অভিযোগ দূর হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা নুন পাঠ করতে থাকবে, তবে সে তার দুশমনদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভ করবে এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা মুলকে তওহীদের ব্যাখ্যা এবং তার শুভ-পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতে বিশ্বাসীদের জন্যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ

ن অক্ষরটি হরফে মোকাত্তায়াতের অন্তর্ভুক্ত (এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে)। সংক্ষেপে একথা মনে রাখতে হবে যে, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাই বলেছেন, যদিও কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ মন্তব্য করেছেন যে, ن হলো ناصر অথবা نصر শব্দ থেকে উদ্ভুত, যা এক্ষেত্রে উহ্য রয়েছে। এর অর্থ হলো, এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবো।

কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। তিনি সত্য-ধর্মের প্রচারে যে বক্তব্য রাখতেন, তার কোন সঠিক জবাব দেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব হতোনা, তাই তারা কখনো তাঁকে "পাগল" কখনো "যাদুকর" বলার ধৃষ্টতা দেখাতো। তারা বলতো, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে একা দাঁড়ানো, পূর্বপুরুষদের রীতি-নীতির বিরোধিতা করা, তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা প্রচার করা শুধু উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। তাই আল্লাহ পাক এ সূরার শুরুতেই এরশাদ করেছেনঃ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۞ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۞

'নুন, শপথ কলমের এবং সে বিষয়ের যা কিছু তারা লিখে থাকে। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন'।

কলমের পূর্বে 'و' অক্ষরটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর قلم দ্বারা সে কলমই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার দ্বারা লওহে মাহফুজ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর এরশাদ করেছেন, লেখ, কলম আরজ করেছে, কি লিখব? আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তকদীর লেখ। এরপর কলম সে সব কিছু লিখে দিয়েছে, যা ইতোপূর্বে হয়েছে এবং যা ভবিষ্যতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন যে, আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগতের তকদীর লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তখন তাঁর সিংহাসন ছিল পানির উপর। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তকদীর লিপিবদ্ধকারী কলমটি ছিল নূরের, যার দৈর্ঘ্য ছিল আসমান যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এটি বিশেষ নূরানী কলম নয়; বরং সাধারণ কলম, এর দ্বারা অনেক উপকার হয়। এজন্যে আল্লাহ পাক এর শপথ গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য আয়াতের ن অক্ষরটির অর্থ হলো মাছ, যেমন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনায় وذالنون কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাখ্যা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), মোকাতেল (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ।

এরপরও কথা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এ হলো সেই মাছ যার পৃষ্ঠদেশের উপর আল্লাহ পাক সারা পৃথিবীকে স্থাপন করে রেখেছেন, যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে সপ্তম স্তরের নিম্নদেশে তা রয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি সেই মাছ, যা হযরত ইউনুস (আঃ)-কে তার উদরে ধারণ করে রেখেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো দোয়াত, তখন আয়াতের অর্থ হবে, শপথ দোয়াত এবং কলমের।

তেবরানীতে হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কলম এবং মাছ সৃষ্টি করেছেন। কলম আরজ করেছে, কি লিখব? আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সব লিপিবদ্ধ কর।[১]

وَمَا يَسْطُرُوْنَ

'এবং শপথ সে বিষয়ের, যা কিছু তারা লিখে থাকে'।

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, আয়াতে উল্লেখিত কলমের অর্থ সাধারণতঃ মানুষ যে কলম ব্যবহার করে তা হতে পারে, অথবা তকদীর লিপিবদ্ধকারী কলমও হতে পারে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-৭৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-৩০, পৃষ্ঠা-১১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৭

অথবা কলম উল্লেখ করে যারা কলম ব্যবহার করেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

অথবা যে ওলামায়ে কেরাম কলম দ্বারা এলমে দ্বীন লিপিবদ্ধ করেন তাদেরকে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

'(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাফেররা বলতো, যাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, সে তো প্রকৃত অবস্থায় উন্মাদ (নাউজুবিল্লাহ)।

তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এবনে মুনজের এবং এবনে জোরায়েজ এ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান

মূলতঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর রেসালতের ঘোষণা করলেন এবং মানুষকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন, তখন সমগ্র আরববাসী তাঁর শত্রু হয়ে গেল। তাঁকে "যাদুকর" এবং "পাগল" বলতেও দ্বিধাবোধ করলোনা। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

'(হে রসূল!) আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামতে এবং অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন'।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কটুক্তি করেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে উন্মাদ, বিকৃত মস্তিষ্ক, তারাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, সারা পৃথিবীতে তারাই নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য বলে পরিচিত, পক্ষান্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা পৃথিবীতে নন্দিত এবং প্রশংসিত। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের পরই যে নামটি উচ্চারিত হয়, তা হলো হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৮

আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক নাম। তাঁর মহান আদর্শ চিরস্মরণীয়, চির অনুকরণীয়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা, তাঁর গুণ-মহিমার কথা কখনো শেষ হবেনা। যাঁর শুভাগমনে ধন্য হয়েছে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি, যাঁর নূর বা জ্যোতি বিকীরণে উজালা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব ভূবন, যিনি আগমন করেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত হয়ে, যিনি বহন করে এনেছেন বিশ্ব মানবের জন্যে চির শান্তি ও চির কল্যাণের পয়গাম, যাঁর বরকতে সমগ্র মানব জাতি লাভ করেছে সরল-সঠিক পথ, তিনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীন, তাঁর শান বর্ণনাতীত, তাঁর উচ্চ মর্যাদা কল্পনাতীত। যতদিন আসমান যমীন থাকবে, চন্দ্র-সূর্য উদিত হবে, ততদিন নবুওয়্যতের আকাশের সূর্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক নাম সর্বত্র উচ্চারিত হতে থাকবে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত।

আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে যিনি ধন্য, তাঁর সম্পর্কে এমন অবাস্তব, আপত্তিকর, মন্তব্য করা চরম ধৃষ্টতা এবং নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা গর্দভের নির্বুদ্ধিতার চেয়েও বেশী।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত হালিমা সাদিয়া (রাঃ) শিশু মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নিয়ে একটি গর্দভীর উপর আরোহন করেছিলেন, ঐ গর্দভী কা'বার দিকে ফিরে তিনবার সেজদা করেছিল এবং বলেছিল, আমার উপর আরোহন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের হাবীব, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম।

"মাওয়াহেবে লুদ্দুনিয়া" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে।[১]

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কাফেররা গর্দভের চেয়েও নির্বোধ।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ۝

'আর নিশ্চয় আপনার জন্যে এমন বিনিময় রয়েছে, যা কখনো নিঃশেষিত হবেনা'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বীন ইসলামের প্রচারে-প্রতিষ্ঠায় যে অক্লান্ত সাধনা করেছেন এবং কাফেরদের অকথ্য নির্যাতনের মোকাবেলা করেছেন পরম ধৈর্য ও সহনশীলতা দ্বারা, এজন্যে আল্লাহ্ পাক তাঁর মহান

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৩৮

দরবারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, তাঁর জন্যে রেখেছেন অনেক পুরস্কার।

সুমহান চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী নবী

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۝

'আর নিশ্চয় আপনি চরিত্র মাধুর্যের উচ্চতম স্তরে রয়েছেন' এবং আপনি মহত্তর চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের এত নির্যাতন সহ্য করেছেন, যা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ما اوذى نبى ما اوذيت

'আল্লাহর রাহে আমাকে এত কষ্ট দেয়া হয়েছে, যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি'।

এবনে আসাকের হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! কাফেরদের ব্যাপারে বদদোয়া করুন। তখন তিনি এরশাদ করেন, আমাকে লা'নতকারী রূপে প্রেরণ করা হয়নি; শুধু রহমত রূপেই প্রেরণ করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

"খুলুকে আজীমের" ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের خلق عظيم এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মহান দ্বীন তথা দ্বীন ইসলাম, কেননা আল্লাহ পাক মানব জাতির জন্যে দ্বীন ইসলামকে পছন্দ করেছেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে خلق عظيم এর অর্থ হলো, কোরআনে করীমে বর্ণিত আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন প্রভৃতি, কেননা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আখলাক বা চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেছিলেন, তাঁর আখলাক ছিল কোরআন (বোখারী, মুসলিম)

অর্থাৎ কোরআনে করীমের শিক্ষার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃপবিত্র জীবনে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন জীবন্ত কোরআন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, خلق عظيم হলো আল্লাহ পাকের আদেশ সমূহের বাস্তবায়ন, আর তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। আর خلق عظيم এর ব্যাখ্যার মূলকথা হলো, জীবন-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হতে হবে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা।

চরিত্র-মাধুর্যের দৃষ্টান্ত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্যের যে প্রশংসা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায়। তিনি বলেছেন, আমি দশ বছর একাধারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, কিন্তু আমি যখন কোন কাজ করেছি তখন তিনি একথা বলেননি, কেন এ কাজটি করলে? আর যখন আমি কোন কাজ না করেছি তখনও বলেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে না? বস্তুতঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত মধুর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকের চেয়ে নরম, মসৃণ কোন কিছু আমি দেখিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র ঘর্ম থেকে অধিকতর সুগন্ধি কোন কস্তুরী বা আতর আমি পাইনি।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, বনু সাওয়াদ গোত্রের এক ব্যক্তি উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আলোচ্য আয়াত وانك لعلى خلق عظيم, তেলাওয়াত করেন। সে ব্যক্তি বললো, দু' একটি ঘটনা বর্ণনা করুন। তখন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, শোন, একবার আমি হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করি। আর হযরত হাফসা (রাঃ)-ও তাঁর জন্যে খাবার তৈরী করেন। তখন আমি আমার বাঁদীকে বললাম, দেখ, আমার খাবার তৈরী হওয়ার পূর্বে যদি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর তরফ থেকে খাবার এসে পড়ে, তবে তুমি ঐ খাবার ফেলে দেবে এবং বাঁদী তাই করলো। এভাবে খাবারের পাত্রও ভেঙে গেল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিক্ষিপ্ত খাবারগুলো একত্রিত করলেন এবং বললেনঃ "এ পাত্রের বদলে একটি ভাল পাত্র তুমি দিয়ে দাও"। এরপর আর কোন ধমক দেননি।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-১৩

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন স্ত্রীলোক উম্মাদিনী ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার নিকট আমার কিছু কাজ আছে। তিনি এরশাদ করলেন, মদীনা মোনাওয়্যারায় যে কোন গলিতে তুমি বসে পড় আমি সেখানে বসবো। বাস্তবেও তাই হলো। তিনি যমীনে বসে গেলেন এবং তাঁর কাজ করে দিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মদীনা মোনাওয়্যারার বাঁদীরাও হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারক স্পর্শ করে যেখানে ইচ্ছা তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে পারত। (বোখারী শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যদি কোন ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে করমর্দন করতো, তবে তিনি সে পর্যন্ত তাঁর দস্তে মোবারক পৃথক করতেন না, যে পর্যন্ত না সে তার হাত পৃথক করতো এবং তাঁর চেহারা মোবারকও তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে নিতেন না। এবং কারো সম্মুখে তাঁকে পা লম্বা করতে দেখা যায়নি। (তিরমিজী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাহে জেহাদ ব্যতীত নিজের দস্তে মোবারক দ্বারা কাউকে কখনো প্রহার করেননি। কোন খাদেমকেও নয়, কোন স্ত্রীলোককেও নয়।

তিনি কখনো কারো নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেউ যদি আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করতো, তবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাকে শাস্তি দেয়া হতো। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে পদব্রজে গমন করছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন নাজরান থেকে আনা একটি চাদর পরিধান করে ছিলেন। একজন বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এত জোরে টান দিল, যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঘাড়ের একদিকে চাদরের দাগ বসে গেল। এরপর সে বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ প্রদত্ত যে অর্থ-সম্পদ তোমার নিকট রয়েছে, তা থেকে কিছু আমাকে প্রদান করার আদেশ দাও। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিকে ফিরে মুচকি হাসলেন এবং তাকে কিছু দান করার আদেশ দিলেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক বীরত্বের অধিকারী ছিলেন। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত যাবের (রাঃ) বলেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কোন লোকের সওয়ালের ব্যাপারে "না" বলেননি।

হযরত যোবায়ের এবনে মুতএম (রাঃ) বর্ণনা করেন, হোনায়েন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কতিপয় বেদুঈন লোক কিছু চাওয়ার জন্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো, এমনকি তিনি একটি বৃক্ষের আড়ালে যেতে বাধ্য হলেন।

বেদুঈনরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাদরটি ছিনিয়ে নিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার চাদর আমাকে ফেরত দাও। যদি আমার নিকট এ প্রস্তরখন্ড গুলোর সমান উষ্ট্র থাকে তবে আমি তা-ও তোমাদের মাঝে বিতরণ করে দেব, তোমরা আমাকে কৃপণ পাবে না, মিথ্যাবাদী বা কাপুরুষ পাবেনা। (বোখারী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অশ্লীল কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বানোয়াট কথা বলতেন না, বাজারে চিৎকার দিতেন না। মন্দ ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতেন না, বরং ক্ষমা করে দিতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চরিত্র মাধুর্যের পরিপূর্ণতার জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। (মসনদে আহমদ)

মোয়াত্তায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

নৈতিক গুণাবলীর পরিপূর্ণতা এবং তবলীগর জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মোমেনের নেক আমলের পাল্লায় সব চেয়ে ওজনদার বস্তু হবে তার চরিত্র-মাধুর্য বা মধুর ব্যবহার। আর অশ্লীল ভাষায় যারা গালি দেয়, আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি জান, কোন্ জিনিস মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন,

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই তা জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতে যে জিনিস মানুষকে সর্বাধিক সংখ্যায় নিয়ে যাবে, তা হলো তাকওয়া পরহেযগারী এবং মধুর ব্যবহার।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে শুনেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, মোমেন ব্যক্তি তার মধুর ব্যবহারের কারণে যারা সারা রাত এবাদত করে এবং সর্বদা রোজা রাখে, তাদের মর্তবা পেয়ে যায়। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি সে, যে চরিত্র মাধুর্যে সর্বোত্তম। (বোখারী শরীফ)

সাহাবায়ে কেরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! মানুষকে সর্বোত্তম বস্তু কি দান করা হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেনঃ মধুর ব্যবহার।

হযরত মাআজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, (আমি যখন ইয়ামনের জন্যে রওয়ানা হই), তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে নসিহতটি করেছেন, তা হলো মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।[১]

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ۞

(হে রসূল!) অচিরেই আপনি দেখতে পাবেন এবং তারাও দেখবে, তোমাদের মধ্যে কে বিরকারগ্রস্ত?

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

অর্থাৎ যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করে বলেছিল, তিনি উম্মাদ (নাউজুবিল্লাহি মিন জালেক) তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ (হে প্রিয় রসূল!) কাফেরদের এ অন্যায় আচরণে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না,

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১২-১৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৭৭-৭৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-১৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২ পৃষ্ঠা-৪০-৪১

সবর অবলম্বন করুন, সেদিন দূরে নয়; যখন সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। কে সত্যের উপর রয়েছে আর কে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, কে উম্মাদ, আর কে উম্মাদ নয়, কে সঠিক পথে রয়েছে আর কে বিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট হয়েছে। কেয়ামতের দিন (হে রসূল!) আপনি তো দেখবেনই, তারাও দেখবে, তোমাদের মধ্যে কে ছিল বিকারগ্রস্ত, তখন তারা তাদের বিকারগ্রস্ততার ভয়াবহ পরিণতি দেখতে পাবে।

আয়াত সমূহের মর্মকথা

মক্কাবাসী কাফেররা বিশেষতঃ কুখ্যাত ওলীদ এবনে মগীরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করেছিল যে, তিনি বিকৃত মস্তিষ্ক, তার জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত সমূহে তিনটি কথা বলেছেন।

(১) مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন, কেননা যে মহান ব্যক্তি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভে ধন্য হয়েছেন, যিনি হলেন নবুওয়্যতের উৎস, যিনি নবী না হলে পৃথিবীতে কেউ নবুওয়্যত লাভ করতেন না, যিনি সর্ব প্রথম নবী এবং সর্বশেষ নবীও, যাঁর প্রতিটি কথা রয়েছে সংরক্ষিত, যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী, তিনি উম্মাদ কি করে হতে পারেন?

বস্তুতঃ যারা তাঁর সম্পর্কে এমন আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তারা যে নিঃসন্দেহে উম্মাদ, বিকারগ্রস্ত একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর তারা একথা বলে যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছে, তার শাস্তি তারা অচিরেই দেখতে পাবে। (হে রসূল!) আপনি তাদের শাস্তি দেখবেন।

(২) وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ

'আর নিশ্চয় আপনার জন্যে এমন বিনিময় রয়েছে, যা কখনো নিঃশেষিত হবেনা'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব যেমন বর্ণনাতীত, ঠিক তেমনি সত্য প্রতিষ্ঠায়, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে তাঁর যে অসাধারণ অবদান রয়েছে, তার সওয়াব বা শুভ পরিণতি কখনো শেষ হবার নয়, কেননা তাঁর গুণ-জ্ঞান, তাঁর এলম দ্বারা বিশ্ববাসী কেয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে

থাকবে এবং তাঁর হেদায়েত সারা বিশ্বে কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, তাই তাঁর সওয়াবও কখনো শেষ হবেনা।

যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, তাঁর সম্পর্কে কোন উম্মাদ, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিই এমন আপত্তিকর মন্তব্য করতে পারে, যার শাস্তি চিরকাল অব্যাহত থাকবে।

এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক তৃতীয় যে কথাটি বলেছেন, তা হলো

(৩) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'আর নিশ্চয় আপনি চরিত্র মাধুর্যের উচ্চতম স্তরে রয়েছেন'।

মক্কার কাফেরদের অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে এ তিনটি কথা এরশাদ করেছেন। পরবর্তী আয়াত সমূহেও এ সম্পর্কে আরো কথা রয়েছে।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٨﴾ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ
فَيُدْهِنُوْنَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ
بِنَمِيْمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ﴿١٣﴾
اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ
اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾

তরজমা

(৭) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে আর তিনি হেদায়েত প্রাপ্তদেরকেও খুব ভাল করে জানেন।

(৮) অতএব, আপনি মিথ্যাবাদীদের কথা মানবেন না।

(৯) (হে রসূল!) তারা কামনা করে যে আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।

(১০) যে কথায় কথায় শপথ করে, এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, সে লাঞ্ছিত।

(১১) যে পশ্চাতে নিন্দাকারী এবং একের কথা অন্যের নিকট বলে বেড়ায়।

(১২) যে কল্যাণকর কার্যে বাধা দেয়, সীমা লংঘন করে চলে, যে পাপীষ্ঠ।

(১৩) রুঢ় স্বভাবের অধিকারী, তদুপরি সে কুখ্যাত।

(১৪) সে ধন-সম্পদের মালিক এবং সন্তান-সন্ততিতেও সে সমৃদ্ধশালী।

(১৫) যখন আমার আয়াত সমূহ তাকে পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সে বলেঃ এ-তো প্রাচীনকালের কিস্‌সা কাহিনী মাত্র।

তফসীরুল কোরআন

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞

অর্থাৎ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক খুব ভাল করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কে বিভ্রান্ত-পথভ্রষ্ট হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে কে উন্মাদ, বিকৃত মস্তিষ্ক, আল্লাহ পাক তা ভালভাবেই জানেন।

যে পথভ্রষ্ট, যে দিশেহারা, সে-ই উন্মাদ, আর তাদেরকে আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন। আর যারা হেদায়েত প্রাপ্ত, তারাই বুদ্ধিমান, তারাই ভাগ্যবান, তাদের পুরস্কার সুনিশ্চিত। আল্লাহ পাক তাদেরকেও ভালভাবেই জানেন। (হে রসূল!) কে আপনার আহ্বানে সাড়া দেবে, কে হেদায়েত লাভ করবে তা আল্লাহ পাক জানেন। যার তকদীরে হেদায়েত নেই, শত চেষ্টা সত্বেও সে আপনার হেদায়েত গ্রহণ করবেনা, আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি মিথ্যাবাদীদের কথা মানবেন না'।

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, আপনিই (হে রসূল!) হেদায়েতের উপর রয়েছেন, আর যারা আপনার বিরোধিতা করছে তারা মিথ্যাবাদী, অতএব আপনি তাদের কথা মানবেন না, আপনার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে থাকুন, যে পথভ্রষ্ট, যার তকদীরে হেদায়েত নেই, সে কখনও সঠিক পথ গ্রহণ করবেনা।

وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ۞

"(হে রসূল!) তারা কামনা করে যে আপনি নমনীয় হন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে"।

কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে এ আবদার করতো যে, আপনি আমাদের পূজনীয় দেবতাগুলোকে মন্দ বলবেন না, তাদের বিরুদ্ধে প্রচার করবেন না, তাহলে এর বিনিময়ে আমরাও আপনার বিরোধিতা করবো না। আপনি যদি নমনীয় হন, তাহলে আমরাও নমনীয় হবো।

তওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই প্রিয়নবী (দঃ)-এর আবির্ভাব

কাফেরদের তরফ থেকে পেশকৃত এ প্রস্তাবটি ছিল নিঃসন্দেহে একটি কঠিন পরীক্ষা, আপাতঃ দৃষ্টিতে এ প্রস্তাবটি যত মধুরই মনে হোক না কেন, এর পরিণাম ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখলে পরিণতি হবে বিপদজ্জনক। ধর্মীয় ব্যাপারে যদি একটু নমনীয় হওয়া যায়, তবে বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কিন্তু এ নীতি ইসলামের দৃষ্টিতে কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শেরকের মূলোৎপাটন করে তওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রেরণ করেছেন। অতএব, এ ব্যাপারে সামান্যতম নমনীয়তার কোন অবকাশই নেই। যে কোন মূল্যে তওহীদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শেরক অমার্জনীয় অপরাধ, তার শাস্তি কঠিন কঠোর, অতএব, শেরক বর্জনীয়, আর শেরকের মূলোৎপাটন অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যও ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে।

এতদ্ব্যতীত, কাফেররা (হে রসূল!) আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা-ও মিথ্যা, তাদের মধ্যে কোন প্রকার সত্যতাই নেই, তারা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত নয়, তাই তাদের অনুরোধ রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি যত্নসহকারে নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ۞

'যে কথায় কথায় শপথ করে, এমন ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, সে লাঞ্ছিত, হীন, নীচ'।

যে মিথ্যা বলে, সে কথায় কথায় আল্লাহ পাকের নামে শপথ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। (হে রসূল!) আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, কেননা সে অতি নীচ, হীন এবং লাঞ্ছিত।

هَمَّازٍ

অর্থাৎ যে গীবতকারী, তথা মানুষের পশ্চাতে নিন্দাবাদকারী।

مَشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ

অর্থাৎ যে চোগলখুরী করে,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ

যে কল্যাণকর কাজে মানুষকে বাধা দেয়, যেমন ঈমানের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করে, মানুষকে সৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

مُعْتَدٍ

যে জুলুম-অত্যাচারে সীমা লংঘন করে।

اَثِيْمٍ

সে অত্যন্ত বড় পাপীষ্ঠ।

عُتُلٍّ

রুঢ় স্বভাবের অধিকারী, অহংকারী, বদ মেজাজ।

بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ

তদুপরি সে কুখ্যাত, সে জারয।

এ আয়াত যে কাফেরের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে হলো ওলীদ এবনে মগীরা, সে প্রকৃতপক্ষেই জারয ছিল।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ওলীদ এবনে মগীরার বয়স যখন আঠার বছর, তখন এক ব্যক্তি তাকে পুত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। অথচ এমন লোকেরাই সে যুগে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করেছে। পরবর্তী কালেও যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে এমন আচরণ করে, তারা সাধারণতঃ এমনই হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন এ বিষয়টি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি, কার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু যখন زنيم শব্দটি নাযিল হয় তখন এ আয়াত কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে তা নির্দিষ্ট হয়, আর সে হলো ওলীদ এবনে মগীরা। এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মন্দ কর্মের জন্যে এ ব্যক্তিটি কুখ্যাত ছিল। মন্দ কাজে তার কুখ্যাতি এমন ছিল, যেমন কোন বকরীর কান যদি ঝুলন্ত থাকে, তবে তার দ্বারা ঐ বকরীটিকে চেনা যায়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু زنيم বা জারয সন্তান হওয়া সর্বাধিক মন্দ, তাই সবশেষে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

হারেস এবনে ওহাব খাজায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি বলবো না তোমাদেরকে জান্নাতী কে আর দোযখী কে? জান্নাতী সেই দুর্বল ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে শপথ করে কোন কথা বললে আল্লাহ পাক তার শপথকে বাস্তবায়িত করেন।

আর দোযখী সে ব্যক্তি যে বদ মেজাজ, রুঢ় স্বভাবের অধিকারী, চরিত্রহীন, পাপীষ্ঠ। (বগভী)

আবু দাউদ এবং তেবরানী এই হাদীসকে হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর বর্ণনা দ্বারা উদ্ধৃত করেছেন।

اَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَّبَنِيْنَ۝

'যে ধন-সম্পদের মালিক এবং সন্তান-সন্ততিতেও সে সম্পদশালী'।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি ধন-সম্পদের অধিকারী হয়, তার ধনবলই তার কথা মেনে চলার জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং গুণবলই এ পর্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানদন্ড। মানুষ যদি পাপীষ্ঠ হয়, সম্পদের অধিকারী হয় তবে সে অনুসরণীয় হয়না, অনুসরণীয় হয় তখন যখন কারো মধ্যে দ্বীনদারী, তাকওয়া পরহেযগারী এবং নৈতিক গুণাবলী স্থান পায়।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۝

'যখন আমার আয়াত সমূহ তাকে পাঠ করে শোনানো হয় তখন সে বলে, এ-তো প্রাচীনকলের কিস্‌সা কাহিনী মাত্র'।

কুখ্যাত ওলিদ এবনে মগীরার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি সবই ছিল, কিন্তু সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তার মধ্যে ছিলনা। এজন্যেই তাকে যখন আল্লাহ পাকের মহান বাণী শ্রবণ করানো হতো তখন সে এ উক্তি করার ধৃষ্টতা দেখাতো যে, এসব হলো প্রাচীন কালের কিস্‌সা বাহিনী মাত্র।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا
بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾ وَلَا
يَسْتَثْنُوْنَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿١٩﴾
فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿٢١﴾ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى
حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ﴿٢٣﴾
اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٤﴾ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ
قٰدِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(১৬) আমি অচিরেই তার শুড়ে (নাসিকায়) দাগ দেব।

(১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল।

(১৮) তারা ইনশাআল্লাহ্ পর্যন্ত বলেনি।

(১৯) এরপর সেই বাগানে আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপতিত হলো এক বিপদ যখন তারা ছিল ঘুমন্ত।

(২০) পরিণামে তা দগ্ধ হয়ে এমন হয়ে রইল, যেমন শষ্য কাটা ক্ষেত্র।

(২১) সকাল হতেই তারা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে বললো,

(২২) যদি তোমরা ফসল তুলতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।

(২৩) এরপর তারা চুপি চুপি কথা বলতে বলতে চলে।

(২৪) আজ যেন তোমাদের নিকট কোন মিসকিন প্রবেশ করতে না পারে।

(২৫) এরপর তারা মিসকীনদেরকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এই বিশ্বাস নিয়ে সকালেই বাগানের দিকে রওয়ানা হলো।

(২৬) এরপর তারা যখন বাগানের অবস্থা দেখল তখন বললো, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।

(২৭) বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

(২৮) তাদের মধ্যকার ভাল লোকটি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও কেন তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না?

(২৯) তখন তারা বলে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেছি। নিশ্চয় আমরা ছিলাম জালেম।

(৩০) এরপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।

(৩১) তারা বললো, হায়! আক্ষেপ! দুর্ভোগ আমাদের, নিশ্চয় আমরা ছিলাম সীমা লংঘনকারী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যে সব চারিত্রিক দোষের উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব দোষ পূর্ণমাত্রায় ওলীদ বিন মগীরার মধ্যে ছিল, আর এতে তার শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পবিত্র কোরআন বিশ্বগ্রন্থ, বিশ্বের সকল মানুষের হেদায়েত রয়েছে পবিত্র কোরআনে, তাই কোন ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে বা কোন বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে যখন কোন ঘোষণা আসে তখন তা হয় সর্বকালের সকল মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতে কুখ্যাত ওলীদ এবনে মগীরার শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে যখন, যে কেউ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করবে, তাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

'আমি অচিরেই তার শুড়ে (নাসিকায়) দাগ দেব'।

হাতির শুড় এবং শুকরের থুথনিকে خرطوم বলা হয়, এখানে এ শব্দের দ্বারা কুখ্যাত ওলীদ এবনে মগীরার নাসিকাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, হাতি বা শুকরের সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশার্থে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ফররা (রঃ) বলেছেন, শুধু নাসিকা নয়, এর দ্বারা তার সম্পূর্ণ মুখমন্ডলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকার আবুল আলীয়া এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তার মুখ কালো করা হবে এবং এ চিহ্ন দ্বারাই সেদিন তাকে চেনা যাবে। সকলেই সেদিন তাকে দেখলেই চিনবে, এ হলো সেই দূরাত্মা, যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করেছে।

হতভাগা ওলীদ এবনে মগীরার শাস্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, সে সব লোকদের যারা তার অনুগামী হয়।

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ

'নিশ্চয় আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগান ওয়ালাদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মক্কার অহংকারী, পাপীষ্ঠ, সম্পদশালী লোকদের ঘৃণ্য চরিত্রের কিছু বিবরণ ছিল। সম্পদ এবং শক্তির কারণে তারা ছিল প্রায় দিশেহারা, তাদের আত্মগরিমার অন্ত ছিলনা, ওলীদ এবনে মগীরা ছিল সে দূরাত্মা কাফেরদের অন্যতম, যারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানে বেআদবী করতেও দ্বিধাবোধ করেনি, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা ধন-সম্পদের বড়াই করে সত্য বিমুখ হয়েছ, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় তৎপর হয়েছ, তোমাদের মনে রাখা উচিত, ধন-সম্পদ কখনো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়নি। অর্থ-সম্পদ নিয়ে গর্ব করারও কিছু নেই।

অর্থ-সম্পদ একটি কঠিন পরীক্ষা

কেননা অর্থ-সম্পদ হলো একটি কঠিন পরীক্ষা, আল্লাহ পাক মানুষকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন, আর কখনো অর্থ-সম্পদ না দিয়েও পরীক্ষা করেন। অর্থ-সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে শোকর গুজারীর আর অর্থ-সম্পদ না দিয়ে পরীক্ষা হয় সবরের।

যাহোক, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ

'নিশ্চয় আমি মক্কাবাসীকে পরীক্ষা করেছি'।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে এই বলে বদদোয়া করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! মক্কাবাসীকে ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি কর। তখন আল্লাহ পাক মক্কাবাসীকে দুর্ভিক্ষে পতিত করলেন, পরিণামে তারা মৃতের গোশ্‌ত ভক্ষণেও বাধ্য হলো।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন পরীক্ষা নতুন কিছু নয় এবং অতীতেও এমনি পরীক্ষা অনেকবার হয়েছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, যেমন পরবর্তী বাক্যে এমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছেঃ

كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ

'যেমন আমি (ইতোপূর্বে) বাগান ওয়ালাদের পরীক্ষা করেছিলাম'।

এবনে আবি হাতেম এবনে জোরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ বদরের যুদ্ধের দিন আবু জেহেল মুসলমানদের সংখ্যা কম দেখে বলেছিল, "এদেরকে হত্যা করার দরকার নেই, এমনিই রশি দিয়ে বেধে ফেল"।

সেদিন আবু জেহেলের এ দম্ভোক্তি অসার প্রমাণিত হয়েছিল। মুসলমানগণ সংখ্যায় ছিলেন ৩১৩ জন, আর কাফেররা ছিল ১০০০। কিন্তু আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে বিজয়-মালা শোভা পেয়েছিল মুসলমানদের কণ্ঠে, আবু জেহেল সহ ৭০ জন কাফের নিহত হয় এবং সমসংখ্যক হয় মুসলমানদের হাতে বন্দী। তাদেরকেই রশি দিয়ে বেধে ফেলা হয়, অতএব, শক্তি-সম্পদের বড়াই করতে নেই। জয়-পরাজয় একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে, সত্যকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করেন, আর অসত্যকে করেন পরাভূত। এটিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের অমোঘ নীতি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মোহাম্মদ এবনে মারওয়ান তফসীরকার কালবী (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইয়ামনের সানআ' শহরের অনতিদূরে একজন নেককার ব্যক্তির একটি বাগান ছিল। এ ব্যক্তিকে মারওয়ান বলা হতো, তার বাগানটিতে প্রচুর পরিমাণে ফল-ফসল উৎপন্ন হতো। তার নিয়ম ছিল, যেদিন সে ফল আহরণ করতো সেদিন এতীম মিসকীন তথা দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষ একত্রিত হতো, তাদের প্রত্যেককেই সে ফল-ফসল দান করে বিদায় করতো এবং তারাও সন্তুষ্ট হতো। এতে তার ফলে বরকত হতো। কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার তিন পুত্র ওয়ারিষ সূত্রে বাগানের মালিক হয়। তখন তারা মিসকীনদের দান করার নিয়ম ভেঙে ফেলে এবং শপথ করে বলে, এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে, যাতে মিসকীনদেরকে না দিতে হয়।

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ۞

যখন তারা শপথ করে বলেছিল, সকাল হতেই আমরা ফল আহরণ করে ফেলব, যাতে এতীম-মিসকীনদেরকে না দিতে হয়।

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ

তারা তাদের এ সিদ্ধান্তে এত অনড় ছিল যে, ইনশাআল্লাহ বলার কথাও ভুলে যায়।

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ۞

'এরপর সে বাগানে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপতিত হলো এক বিপদ যখন তারা ছিল ঘুমন্ত'।

অর্থাৎ এতিম-মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যখন তারা নিদ্রিত হয়, তখন আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হলো ঐ বাগানের উপর, আল্লাহ পাকের হুকুমেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাগানটিকে ধ্বংস করে দেয়।

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ۞

'পরিণামে তা দগ্ধ হয়ে এমন হলো, যেমন শষ্য-কাটা ক্ষেত্র'।

তফসীরকার হাসান বসরী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঐ বাগানে আর কিছুই রইল না।

আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো কালো ছাই, অর্থাৎ বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ۞ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ۞ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ۞

(এদিকে) সকাল হতেই তারা পরস্পরকে ডাকা ডাকি করে বললো, যদি তোমরা ফসল তুলতে চাও, তবে সকাল সকাল চল। এরপর তারা চুপি চুপি কথা বলতে বলতে বাগানের দিকে যেতে থাকে।

اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ۞

(তাদের কথা ছিল এই) আজ যেন তোমাদের নিকট কোন মিসকীন প্রবেশ করতে না পারে।

অর্থাৎ কোন এতীম মিসকীনকে আজ বাগানে প্রবেশ করতে দিওনা।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ۝

'এরপর তারা মিসকীনদেরকে নিবৃত্ত করতে পারবে, এ বিশ্বাস নিয়েই রওয়ানা হলো'।

অর্থাৎ তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের সমস্ত ফল-ফলারী তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এতীম মিসকীনদের কাউকে বাগানে প্রবেশ করতে দেয়া হবেনা, এ সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হবেনা।

আলোচ্য আয়াতের حرد শব্দটির অর্থ হলো ইচ্ছা করা, বিরত রাখা, রাগান্বিত হওয়া, এজন্যে তফসীরকার হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ), আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটির অর্থ হলো, এতীম মিসকীনদের বাগানে প্রবেশে বাধা দিতে চেষ্টা করা।

আর কুরতবী (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, যে বিষয়ে তারা একমত হয়েছিল, তা বাস্তবায়নে তারা সম্পূর্ণ সক্ষম।

তফসীরকার আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, মিসকীনদেরকে বাধা দিতে তারা ছিল সম্পূর্ণ সক্ষম। এ বিশ্বাস নিয়েই তারা রওয়ানা হয়েছে।

আর শা'বী (রঃ) এবং সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মিসকীনদের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারে তারা ছিল সক্ষম।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো বাগান এবং তার ফল সংগ্রহ করার ব্যাপারে এবং মিসকীনদের প্রবেশাধিকার না দেয়ার ব্যাপারে তারা ছিল সক্ষম। এমনি উপলব্ধি নিয়েই তারা অতি প্রত্যুষে বাগানের দিকে রওয়ানা হলো।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ۝

এরপর যখন তারা বাগানের (বিরাণ) অবস্থা দেখল তখন বললো, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি, এটিতো আমাদের বাগান নয়; আমাদের বাগানতো ফল-ফলারীতে ভরপুর ছিল।

অথবা এর অর্থ হলো, আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি বলেই এতীম মিসকীনদেরকে বাগানে আসতে বাধা দিয়েছি। তাদের অংশ না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

আমরা পথভ্রষ্ট হয়নি; বরং বাগানের ফল-ফলারী থেকে বঞ্চিত হয়েছি। এটি আমাদেরই বাগান, কিন্তু এখন তা জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ۝

'তাদের মধ্যকার ভালো লোকটি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও কেন তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না'?

এ আয়াতাংশের اوسط শব্দটির দ্বারা মধ্যবয়সী লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ শুধু মধ্যবয়সীই নয়; বরং এ ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় বিচারের গুণ ছিল এবং অন্যদের চাইতে সে বুদ্ধিমান ছিল। এজন্যে তরজমা করা হয়েছে, "তাদের মধ্যে ভালো লোকটি বললো"।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যে ব্যক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সে ভালো লোক ছিল, সেজন্যে সে এতীম মিসকীনদেরকে বঞ্চিত করার পক্ষপাতী ছিলনা, অন্যদিকে তার এ সৎ সাহসও ছিল না যে, অন্য ভাইদের বিরোধিতা করে সে কিছু একটা করবে। এজন্যে তার সম্পর্কে اوسط শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছ।

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ.....

আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও কেন তোমরা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না? অর্থাৎ কেন তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছো না? ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে ইনশাআল্লাহ বলা একান্ত কর্তব্য, কেননা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজই হতে পারেনা, তাই ইনশাআল্লাহ কথাটি উচ্চারণকে তসবীহ বলা হয়েছে।

তফসীরকার আবু সালেহ (রঃ) বলেছেন, সে যুগে ইনশাআল্লাহ বলার স্থলে সোবহানাল্লাহ বলা হতো, এজন্যে ইনশাআল্লাহ'র স্থলে تسبحون শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

অথবা এর অর্থ হলো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, তোমরা কেন আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় কর না? তিনিই তো তোমাদেরকে দান করেছেন এ বাগান। তোমরা কেন মিসকীনদেরকে এ বাগানের ফল থেকে মাহরুম করছো?

এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে 'তসবীহ' কথাটি শোকর গুজারীর অর্থে ব্যবহৃত হবে, কেননা শোকরের তাৎপর্য হলো দাতার দানকে তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা।

অথবা আলোচ্য আয়াতে "তসবীহ" এর অর্থ এস্তেগফার করা বা ক্ষমা প্রার্থনা করা, অর্থাৎ মিসকীনদেরকে বাধা দিয়ে তোমরা যে অপরাধ করেছ, তার জন্যে কেন ক্ষমা প্রার্থী হওনা?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ۝

তখন তারা বলে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি, তিনি পবিত্র, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি কোন প্রকার জুলুম করেননি; বরং আমরা মিসকীনদেরকে বাগানে আসতে না দিয়ে নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছি।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ۝

এরপর তারা একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে থাকে যে, তোমার কারণেই এ অপরাধ হয়েছে, এভাবে একে অন্যকে তিরস্কার করতে লাগল।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ۝

তারা বলতে লাগল, হায়! আক্ষেপ! দুর্ভোগ আমাদের, আমরাই সীমা লংঘনকারী। অন্যায় আমাদেরই। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেয়ামত দান করেছিলেন, আমরা তার শোকর আদায় করিনি, আমাদের কর্তব্য ছিল মিসকীনদের হক্ব আদায় করা, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের চেষ্টা করা, যেমনটি করতেন আমাদের পিতা। কিন্তু তা আমরা করিনি, তাই আজ আমাদের এ পরিণতি।

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾
كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾
اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ ۡ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾
اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾
اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ
لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ
فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩২) আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক দান করবেন আমাদেরকে এর পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর বাগান। আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই মনোনিবেশ করছি।

(৩৩) এভাবেই আযাব আসে। আর আখেরাতের আযাব তো সবচেয়ে বড়, যদি তারা বুঝতে পারে।

(৩৪) নিশ্চয় পরহেযগারদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে নেয়ামতে পূর্ণ জান্নাত সমূহ।

(৩৫) আমি কি অনুগত বন্দাদেরকে অবাধ্যদের ন্যায় গণ্য করবো?

(৩৬) তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিরূপে সিদ্ধান্ত করছো?

(৩৭) তোমাদের কাছে কি এমন কিতাব রয়েছে? যা তোমরা পাঠ কর।

(৩৮) তাতে তোমাদের জন্যে এমন কিছু রয়েছে, যা তোমরা পছন্দ কর।

(৩৯) "তোমরা যা সিদ্ধান্ত করবে, তাই পাবে", এ মর্মে তোমরা কি আমার নিকট থেকে এমন শপথ নিয়েছ যে, কেয়ামত পর্যন্ত তা পূর্ণ হতে থাকবে।

(৪০) (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এই দাবীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

(৪১) তাদের স্থিরকৃত কোন শরীক রয়েছে কি? যদি থাকে তবে তারা তাদের ঐ শরীকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূববর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজের দুঃখী মানুষদেরকে বঞ্চিত করার যে অপচেষ্টা করা হয়েছিল, তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের গজব আপতিত হয়েছিল বাগানের উপর, এটি ছিল তাদের মারাত্মক ভুল, এ ভুলের শাস্তি দেখার পর তারা তওবা করলো, তখন তারা মনে মনে এই আশা করলো যে, হয়তো আল্লাহ্ পাক আমাদের তওবা কবুল করবেন এবং আমাদেরকে এ বাগানের পরিবর্তে এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর বাগান দান করবেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বন্দা যখন আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজার হয়, তখনই তাঁর দরবারে আশা করে। বাগানের মালিকরা যখন আল্লাহ্ পাকের বন্দাদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা করেছিল তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। এরপর তিনি তাদের মনের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন, কৃত অন্যায়ের জন্যে তারা দরবারে এলাহীতে তওবা করেছে। আর এ তওবার বরকতে তাদের অন্তরে লব্ধ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে। ঐ কৃতজ্ঞতাবোধের শুভ পরিণতি স্বরূপ তাদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে নেয়ামত লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আশাবাদই ব্যক্ত করা হয়েছে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ۞

'আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দান করবেন এর পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর বাগান, আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই মনোনিবেশ করছি'।

তওবার ফলশ্রুতি

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে খাঁটি তওবা করেছিল, জন্যে আল্লাহ্ পাক তাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ পাকের

দরবারে তারা ক্রন্দন করেছে। ফলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে গজবের পর নেয়ামত দান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন তারা খাঁটি তওবা করলো এবং আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা করলেন, তখন ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাগানের পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আরেকটি বাগান দান করলেন, যার আঙ্গুরের একটি ছড়া এত বড় যে তা হতো একটি উটের বোঝা।

আবু খালেদ আল ইয়ামীন বলেছেন, আমি ঐ বাগানটি স্বচক্ষে দেখেছি। ঐ বাগানের আঙ্গুরের একটি ছড়া মনে হতো যেন একজন কৃষ্ণ বর্ণের পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে।

আর আবু হাইয়ান (রঃ) বলেছেন, তারা ছিল মোমেন, কিন্তু তাদের গুণাহ্ হয়ে গিয়েছিল, পরে তারা তওবা করেছে। আল্লাহ্ পাকের দিকে তারা মনোনিবেশ করেছে। তাঁর মহান দরবারকেই আশা-ভরসার কেন্দ্র বলে বিশ্বাস করেছে। তাই আল্লাহ্ পাকের রহমত তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে।[১]

ইমাম বায়হাকী হযরত জাফর এবনে মোহাম্মদের সূত্রে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যেন রাত্রিকালে তার ফসল না তোলে এবং তার বাগানের ফল আহরণ না করে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীস হয়তো আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতেই ছিল।

কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের কর্তব্য হলো জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অপরাধী লোকদের অনুসরণ না করা। যারা আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, যারা পাপাচারী, অপরাধী তাদের অনুসরণেও আল্লাহর গজব আপতিত হতে পারে। এজন্যে কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হলো এমন পরিণতি থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেনঃ অর্থাৎ হে লোকসকল!

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৩২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৯

তোমরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর, কেননা অনেক সময় বন্দা কোন প্রকার গুনাহর কাজে লিপ্ত হয়, পরিণামে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত রিয্ক থেকে তাকে মাহরুম করা হয়। এরপর হয রত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কীয় আয়াত তেলাওয়াত করেন।

অতএব, কর্তব্য হলোঃ

(১) গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা।

(২) লব্ধ নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজার থাকা।

(৩) প্রাপ্ত নেয়ামত থেকে দুঃখীজনকে দান করা।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিরন্নকে খাবার দিও, যার পোষাক নেই তাকে পোষাক দিও, আর যখন সারা পৃথিবীর মানুষ নিদ্রায় বিভোর থাকে, তখন তুমি আল্লাহ পাকের দরবরে হাযির হয়ো।

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

'এভাবেই আযাব আসে, আর আখেরাতের আযাব তো সবচেয়ে বড়, যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে'।

অর্থাৎ যেভাবে আমি সানআ'বাসী বাগান ওয়ালাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং যেভাবে আমি মক্কাবাসী মুশরেকদেরকে দুর্ভিক্ষ দ্বারা শাস্তি দিয়েছি, ঠিক এভাবেই দুনিয়াতে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদের শাস্তি হয়ে থাকে। তবে দুনিয়ার বিপদাপদ বা আযাব অবশেষে শেষ হয়ে যায় কিন্তু আখেরাতের আযাব কোনদিন শেষ হবার নয়। ভয়ংকর, চরম বিপজ্জনক এ আযাবকে বাধা দেয়ার শক্তি কারোই নেই। যদি তারা এ সত্য উপলব্ধি করতো তবে তারা নাফরমানী করতোনা, আর তা হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর।

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

'নিশ্চয় পরহেযগারদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছ নেয়ামতে পূর্ণ জান্নাত সমূহ'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে নেককার পরহেযগার লোকদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে এ মর্মে যে, এ জীবনে যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন

করবে, তারা আখেরাতে জান্নাতের অন্তহীন নেয়ামত ভোগ করবে। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্যে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য, আর তাকওয়া পরহেযগারীর প্রাথমিক স্তর হলো ঈমান। ঈমান ব্যতীত কোন নেক আমল আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

'অতএব, যে তার প্রতিপালকের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করে, তার কর্তব্য হলো নেক আমল করা এবং সে কখনো তার প্রতিপালকের সাথে শেরক করবে না'।

মূলতঃ আখেরাতে নাজাত লাভের পূর্বশর্ত হলো ঈমান এবং নেক আমল।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী আখেরাতের নেয়ামতের তুলনায় হীন, তুচ্ছ, যারা নেককার পরহেযগার তাদের জন্যে রয়েছে অনন্ত অসীম নেয়ামত, যা বর্ণনাতীত এবং যা চিরস্থায়ী। অতএব, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সাময়িক সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখেরাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতকে ভুলে থাকা সম্ভব নয়।

কাফেররা বলেছিল, যদি আখেরাত সত্যও হয় তবে যেভাবে দুনিয়াতে আমরা অনেক সুখ-সামগ্রী লাভ করেছি ঠিক তেমনি আখেরাতের নেয়ামতও আমাদেরকেই দেয়া হবে। কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۞

'আমি কি অনুগত বন্দাদেরকে অবাধ্য লোকদের ন্যায় গণ্য করবো'?

অর্থাৎ মোমেন ও কাফেরদের সঙ্গে কখনো এক প্রকার ব্যবহার হবেনা, যারা মোমেন হবে তারা হবে, চির শান্তির কেন্দ্র জান্নাতের অধিবাসী আর যারা পাপীষ্ঠ, অবাধ্য তারা হবে চির শাস্তির কেন্দ্র দোযখের অধিবাসী।

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۞

'তোমাদের কি হলো? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত করছো'?

অর্থাৎ মোমেনদের সঙ্গে কাফেরদের অনুরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

বস্তুতঃ কাফের মুশরেককরা তাদের দম্ভ অহংকারের কারণে এ ভ্রান্ত ধারণা করতো যে, যদি আখেরাত বলতে কিছু থাকেও, তবে তারা নিঃসন্দেহে আখেরাতেও

দুনিয়ার মত সুখ শান্তি ভোগ করবে। তাই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমরা কি মনে করেছ যে, আল্লাহ পাকের অনুগত এবং অবাধ্য সকল লোকের সঙ্গে একই সমান ব্যবহার করা হবে? তা কখনো নয়। দোষী-নির্দোষ, নেককার-বদকার সকলের পরিণতি কখনো এক হতে পারেনা।

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ۞

'তোমাদের নিকট কি এমন কিতাব রয়েছে যা তোমরা পাঠ কর'।

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ۞

'যাতে এমন কিছু রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর'।

অর্থাৎ তোমরা এ ধারণা পোষণ করছো যে, আখেরাতে মোমেনদের ন্যায়ই তোমরা সুখ-শান্তি ভোগ করবে। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, কে তোমাদেরকে একথা বললো? তোমাদের নিকট কি এমন কোন আসমানী গ্রন্থ রয়েছে? যা তোমরা পাঠ কর, যাতে তোমাদের পছন্দনীয় কথাবার্তা রয়েছে।

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ۞

'তোমরা যা সিদ্ধান্ত কর তাই পাবে' এ মর্মে তোমরা কি আমার নিকট থেকে এমন শপথ নিয়েছ যে, কেয়ামত পর্যন্ত তা পূর্ণ হতে থাকবে'।

অথবা তোমরা কি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কোন শপথ বা প্রতিশ্রুতি নিয়েছ যে, তোমরা যা কিছু চাইবে কেয়ামত পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে তা দান করতে থাকবেন এবং আখেরাতেও তোমরা এ পৃথিবীর মত সুখ-সামগ্রী ভোগ করতে থাকবে। যদি তোমাদের নিকট এর কোন বাস্তব প্রমাণ থাকে, তবে তা পেশ কর।

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ۞ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ

'(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে কে এ দাবীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে'?

অর্থাৎ (হে রসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, এ কাফেররা আখেরাত সম্পর্কে যে দাবী করছে তাদের মধ্যে কে আছে যে এ দাবীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে? যা দ্বারা এ দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দান করেননি, আর এমন কোন ব্যক্তিও নেই যে তাদের এ-দাবীর প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে এবং তারা ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক

তাদেরকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি, আর এমন কোন ব্যক্তিও নেই যে, তাদের এ দাবীর দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صٰدِقِيْنَ۞

'তাদের স্থিরকৃত কোন শরীক রয়েছে কি? যদি থাকে তবে তাদের সেই শরীকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়'।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিন মোমেনদের সমান মর্যাদা দেয়া হবে এবং তা দেবে তাদের স্থিরকৃত শরীকরা, যদি এমন কোন শরীক তাদের নিকট থাকে, তবে তা তারা উপস্থিত করুক এবং তাদের মনের মকসুদ পূর্ণ করে দিক। এবং এর কোন নমুনা থাকলে তা-ও তারা দেখাক, অথচ তারা যা কিছুর পূজা করে তারা পূজারীদের চেয়েও দুর্বল। ঐ পূজনীয় বস্তুগুলো তাদের নিজেদেরও কোন উপকার করতে পারেনা, এমন অবস্থায় পূজারীদের কি সাহায্য তারা করবে?

এ আয়াতে কাফের মুশরেকদের নিকট থেকে তাদের ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তা পেশ করতে তারা ব্যর্থ হয়, তবে তাদের দেখা উচিত যে, তারা কার ভরসায় বসে আছে? কে তাদেরকে কেয়ামতের কঠিন দিনে সাহায্য করবে? কে তাদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

এ আয়াতে কাফের মুশরেকদের নিকট থেকে তাদের ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে দলিল-প্রমাণ পেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যদি তা পেশ করতে তারা ব্যর্থ হয় তবে তাদের দেখা উচিত যে, তারা কার ভরসায় বসে আছে? কে তাদেরকে কেয়ামতের কঠিন দিনে সাহায্য করবে? কে তাদের ভিত্তিহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে?

يَوْمَ يُكْشَفُ
عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾
خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ
اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا
الْحَدِيْثِ ۭ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاُمْلِيْ
لَهُمْ ۭ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ
مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ﴿٤٨﴾

তরজমা

(৪২) সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন 'সাক' পর্যন্ত অনাবৃত হবে এবং তাদের সকলকে ডাকা হবে সেজদা করার জন্যে, কিন্তু তা তারা করতে পারবে না।

(৪৩) তাদের দৃষ্টি অবনত হয়ে আসবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করতে থাকবে, অথচ যখন তারা সুস্থ সক্ষম অবস্থায় ছিল তখন তাদেরকে সেজদা করার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল।

(৪৪) অতএব, (হে রসূল!) যারা এই মহান বাণীকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ধরবো এভাবে যে তারা জানতেও পারবে না।

(৪৫) আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত।

(৪৬ (হে রসূল!) আপনি কি তাদের নিকট কোন প্রকার পারিশ্রমিক দাবী করছেন যে তাকে তারা দুর্বহ জরিমানা মনে করছে?

(৪৭) তাদের নিকট কি গায়বের খবর আছে যা তারা লিখে রাখে?

(৪৮) অতএব, (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, আর মৎস্য সহচরের (ইউনুস (আঃ) ন্যায় আপনি অধৈর্য হবেন না, যখন সে অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রাথনা করছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পরহেযগার লোকদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা রয়েছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এ জান্নাত কবে পাওয়া যাবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ

'সেদিনকে স্মরণ কর, যে দিন 'সাক' পর্যন্ত অনাবৃত হবে'।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে স্মরণ কর, যেদিন হবে মহা বিপদের দিন, যেদিন হবে পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন।

يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ কথাটির তাৎপর্য সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

(১) এর দ্বারা কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাকের বিশেষ নূরের তাজাল্লী প্রকাশকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ساق শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো পায়ের গোড়ালীর উপরিভাগ। আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন "সাক" বা তাঁর কদম মোবারকের গোছা প্রকাশ করবেন তথা বিশেষ নূরের তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হবে।

আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোরআনে করীমে يد (হাত) وجه (চেহারা) যেমন ব্যবহৃত হয়েছে ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে ساق শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য শব্দের ন্যায় এ শব্দটিও মোতাশাবেহাতের অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন, এর স্বরূপ কি? তাও তিনিই জানেন।

যেদিন এই 'সাক' অনাবৃত হবে তথা বিশেষ নূরে এলাহী বিচ্ছুরিত হবে, তখন সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদায় রত হতে সচেষ্ট হবে, কিন্তু শুধু প্রকৃত মোমেনগণই আল্লাহ পাককে সেজদা করার সৌভাগ্য লাভ করবে। কাফের মুনাফেকরা সেজদা করতে সক্ষম হবেনা, কেননা একমাত্র মোমেনগণই দুনিয়াতে আল্লাহ পাককে সেজদা করতো। আর যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাককে সেজদা করেনি তাদেরকে এর তৌফিক দেয়া হবেনা।

(২) এর আরও একটি অর্থ হলো কোন কাজ কঠিন হওয়া, মহাবিপদ দেখা দেয়া।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন, অর্থাৎ সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন হবে মহা বিপদের দিন।

وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

আর তখন মানুষকে আল্লাহ পাককে সেজদা করার জন্যে আহ্বান করা হবে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

'কিন্তু তারা সেজদা করতে পারবে না'। কাফের মুনাফেকরা সেদিন সেজদা করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, كشف ساق এর অর্থ হল কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়া।

একরামা (রঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বলেছেন, كشف ساق এর অর্থ হলো কেয়ামতের কঠিন দিনে মহা বিপদের মুখোমুখি হওয়া।

এবনে জরীর বলেছেন, كشف ساق হলো কেয়ামতের সেই কঠিন বিপদ যা প্রত্যেকের উপর আপতিত হবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এ আরজী পেশ করেছেন যে, আমরা কি কেয়ামতের দিন আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দুপুরের সময় যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকে তখন সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? অথবা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্র দেখতে কি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যেভাবে চন্দ্র সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না ঠিক এমনিভাবে কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পাকের দীদার লাভেও তোমাদের কোন অসুবিধা হবেনা। কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী তাদের উপাস্যের পেছনে যেন চলে যায়। তখন মূর্তিপূজকরা একে একে দোযখে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে। যখন শুধু আল্লাহর এবাদতকারী ব্যতীত

কেউ থাকবেনা তখন ইহুদীদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র ওজায়রের। তখন এরশাদ হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী, কেননা আল্লাহ পাক স্ত্রী ও সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র। তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও? তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমরা বড়ই তৃষ্ণার্ত, আমাদেরকে পানি পান করাও। তখন এরশাদ হবে, তোমরা কি পানি দেখনা? তখন দোযখ মরীচিকার মত হবে, তথা পানির ধোকা হবে। এরপর তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন দোযখের অগ্নি এত তেজ হবে যে তার এক অংশ আরেক অংশকে হজম করে ফেলতে চাইবে।

এরপর ঈসায়ীদেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার এবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র ঈসার। তখন এরশাদ হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। এরপর ইহুদীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, ঈসায়ীদেরকেও তাই বলা হবে।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং দারে কুতনীতেও এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, যে কেউ পৃথিবীতে যা কিছুর পূজা করতো তা সূর্য হোক বা চন্দ্র, মূর্তি হোক বা অন্য কিছু, তাদের সে উপাস্যগুলোকে দৈহিক আকার দিয়ে তাদের সম্মুখে রাখা হবে, যারা ওজায়রের উপাসক ছিল, তাদের সম্মুখে ওজায়রের শয়তানকে তাঁর আকৃতি দিয়ে হাযির করা হবে। আর যারা ঈসার উপাসক ছিল, তাদের সম্মুখে ঈসার শয়তানকে তাঁর আকৃতি দিয়ে উপস্থিত করা হবে। এভাবে সকল কাফের তাদের উপাস্যদের সঙ্গে দোযখে চলে যাবে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর যে বর্ণনা রয়েছে, তার অবশিষ্টাংশের প্রতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এভাবে আল্লাহ পাকের এবাদতকারী ব্যতীত আর কেউ থাকবে না। তাদের মধ্যে নেককার ও বদকার সকলেই থাকবে। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা হবে, প্রত্যেক উম্মত তার উপাস্যের পেছনে চলে যাচ্ছে, তোমরা কি দেখছো? লোকেরা আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! দুনিয়াতে যখন আমাদের ভীষণ প্রয়োজন ছিল তখনও আমরা তাদের থেকে দূরে রয়েছি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক। তারা আরজ করবে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করিনি। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এমন কোন নিদর্শন আছে কি? যার দ্বারা তোমরা তোমাদের

প্রতিপালককে চিনতে পার। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁর 'সাক' (পায়ের গোড়ালীর উপরিভাগ) অনাবৃত করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সঠিকভাবে শুধু আল্লাহ্ পাককে সেজদা করতো, তাকে সেদিন সেজদা করার অনুমতি প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি মুনাফেকী করতো, অথবা লোক দেখানোর জন্যে সেজদা করতো, তার পৃষ্ঠদেশকে শক্ত করে দেয়া হবে, সে সেজদা করতে ইচ্ছুক হলে পেছনের দিকে পড়ে যাবে। এরপর দোযখের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে।[১]

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ

অর্থাৎ যখন তাদেরকে সেজদা করার আহ্বান জানানো হবে, তখন তারা সেজদা করতে সক্ষম হবে না।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাককে সেজদা করতো না, তাদের এ পরিণতি হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা সে সব লোকদেরকেও উদ্দেশ্য করা হতে পারে, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কখনও নামাজ আদায় করতো না। অথবা যারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতো না। অথবা যারা লোক দেখানোর জন্যে নামাজ আদায় করতো, তাতে এখলাস বা আন্তরিকতা থাকতো না।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ، وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ.

'তাদের দৃষ্টি অবনত হয়ে আসবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, অথচ তারা যখন সুস্থ সক্ষম অবস্থায় ছিল তখন তাদেরকে সেজদা করার জন্যে আহ্বান করা হয়েছিল।

কেয়ামতের কঠিন দিনে কাফের ও মুনাফেকরা আল্লাহ্ পাককে সেজদা করার ইচ্ছা করলেও তাতে সক্ষম হবে না। সেদিন তাদের লজ্জা ও অপমানের অন্ত থাকবে না। লজ্জার কারণে চোখ তুলে দেখতে পারবে না।

وَقَدْ كَانُوْا

সেদিন তারা যে সেজদা করতে পারবে না, এর কারণ বর্ণিত হয়েছে এ আয়াতাংশে। দুনিয়াতে তাদেরকে সেজদা করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে, প্রতিদিন পাঁচবার করে যথা নিয়মে আযানের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদা করার জন্যে ডাকা হয়েছে। তখন তারা ছিল সুস্থ সবল। আল্লাহ্ পাককে সেজদা করতে কোন অসুবিধা ছিল না, কিন্তু তবুও তারা সেজদা করেনি। তাই তাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হবে এবং সেজদা করার ইচ্ছা করলেও তারা আর সেজদা করতে পারবে না।

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ.

'অতএব (হে রসূল!) যারা এই মহান বাণীকে (পবিত্র কোরআন) মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ধরবো, এভাবে যে তারা জানতেও পারবে না'।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা ৫১-৫২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা ২৮১-৮৩

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি কাফের মুশরেক মুনাফেকদের অন্যায়-আচরণে মনক্ষুন্ন হবেন না। তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেব। তাদের শাস্তি বিধানে কিছুটা বিলম্ব হলেও তারা কখনও রেহাই পাবেনা। তাদের শাস্তি অবধারিত। আমি তাদেরকে পর্যায়ক্রমে এমনভাবে শাস্তি দেব যে তারা কিছুই জানতে পারবে না। আর এভাবে তাদের কৃতকর্মের কঠিন শাস্তি তারা ভোগ করবে।

وَأُمْلِيْ لَهُمْ ط اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ۝

'আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত'।

আল্লাহ পাক কখনও জালেমদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাদের শাস্তি হবে না বা তারা রেহাই পেয়ে গেল; বরং অবকাশের কারণ হলো জালেমদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হওয়া। অথবা তাদের তওবা করার সুযোগ দেয়া। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যারা তাঁর নাফরমানীতে সর্বদা লিপ্ত থাকে এবং জুলুম অত্যাচারে তাঁর এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তোলে, তিনি তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তিনি অবকাশ দিয়ে থাকেন। এটি তাঁর একটি কৌশল। নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কৌশলকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনা। তাদের শাস্তি অবধারিত হয়। وَقَدْ كَانُوْا

আলোচ্য আয়াতের كيد শব্দটি দ্বারা কাফেরদেরকে অবকাশ দেয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফেরদেরকে আমি যে নেয়ামত দিয়ে থাকি, তাদেরকে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা দিয়ে থাকি তা তাদের জন্যে একটি অবকাশ মাত্র। এর দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের শাস্তিকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছে দেয়াই উদ্দেশ্য। এভাবে কাফেরদের শাস্তি হয় কঠিনতর।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদি কোন গুনাহর কাজ হওয়ার পর দুনিয়াতেই কোন প্রকার বিপদাপদ শাস্তি স্বরূপ এসে পড়ে, তবে গুনাহ মাফ হওয়া সম্পর্কে আশা করা যেতে পারে।

পক্ষান্তরে, গুনাহর কাজ করার পরও যদি নেয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে আশঙ্কা থাকে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এই ব্যক্তিকে অবকাশ দিচ্ছেন এবং যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে।

اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ۞ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ۞

'(হে রসূল!) আপনি কি তাদের নিকট থেকে কোন প্রকার পারিশ্রমিক দাবী করেছেন? যে, তাকে তারা দুর্বহ জরিমানা মনে করছে'?

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করা হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি তাদের নিকট (তাদের হেদায়েতের জন্যে) কোন পারিশ্রমিক দাবী করেছেন? যদি তা করতেন তবে বলা যেত যে, অর্থ ব্যয়ের ভয়ে তারা আপনার বিরোধিতা করছে। কিন্তু বাস্তবে তাতো নয়, অথবা তাদের নিকট কি লওহে মাহফুজের কোন খবর বা কোন গায়বী এলম এসেছে যা তারা তাদের ইচ্ছা মাফিক লিপিবদ্ধ করে রাখছে?

সাধারণতঃ নবী রসূলগণের নিকট ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী প্রেরণ করেন। আর আউলিয়ায়ে কেরাম কাশফের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারেন। মক্কার কাফেরদের ব্যাপারে এমন কিছুতো হয়নি।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

অতএব, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে সবর অবলম্বন করুন। তারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আপনাকে মন্দ বলে, বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা করে। আপনি তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার প্রতি দ্বীনের তবলীগের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করতে থাকুন। অদূর ভবিষ্যতে (হে রসূল!) আপনার এবং আপনার অনুসারীদের বিজয় অবশ্যই হবে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য আপনার ও আপনার অনুসারীদেরই। তাই তাদের অন্যায় অনাচারে মনক্ষুন্ন হবেন না এবং তাদের প্রতি আযাব আপতিত হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়াতেও ব্যাকুল হবেন না।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ۞

'আর মৎস্য সহচরের (হযরত ইউনুস (আঃ) ন্যায় আপনি অধৈর্য হবেন না, যখন সে অত্যন্ত বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় দোয়া করেছিল'।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনি ইউনুস (আঃ)-এর ন্যায় ব্যাকুল হবেন না, তিনি তাঁর জাতির প্রতি রাগান্বিত হয়ে এক পর্যায়ে বের হয়ে পড়েন। জাহাজে আরোহন করেন এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। সমুদ্রের মাছ তাঁকে গিলে ফেলে এবং সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে বসে, আর সেখান

থেকে তিনি "লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সোবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালেমিন" বলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিপদ-মুক্তির জন্যে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে ঐ মহা বিপদ্ব থেকে রক্ষা করেছিলেন।[১]

وَهُوَ مَكْظُومٌ

অর্থাৎ হযরত ইউন্নুস (আঃ) যখন অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত ও বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন, দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাঁর ব্যথিত প্রাণের ফরিয়াদ পেশ করেছিলেন মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে, তিনি তখন ছিলেন সমুদ্রের তলদেশে মাছের উদরে। আল্লাহ্ পাক তাঁর ফরিয়াদ্ শ্রবণ করেছিলেন এবং তাঁকে নাজাত দিয়েছিলেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মন ছিল তখন দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ, তাঁর জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, এর দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাকের অনুমতি না নিয়েই নাইনুয়া ত্যাগ করার দুঃখ, তৃতীয়তঃ মাছের উদরে অবরুদ্ধ থাকার দুঃখ, সে কঠিন মুহূর্তে তিনি আল্লাহ্ পাককে ডাক দিয়েছিলেন এই বলে, হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, অপরাধ আমারই, নিঃসন্দেহে আমিই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর এ ফরিয়াদ যখন আল্লাহ্ পাকের আরশ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন ফেরেশতাগণ আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ্! এ ফরিয়াদীর আওয়াজ অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। ইতোপূর্বেও এ আওয়াজ শ্রুত হয়েছে। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, তোমরা তাকে চিনতে পারনি? ফেরেশতাগণ আরজ করেনঃ না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ এ হলো আমার বন্দা ইউনুস, তখন ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে পরওয়ারদেগার! তাঁর নেক আমলের বিবরণ সর্বদা আসমানে এসেছে এবং তাঁর দোয়া সমূহ সর্বদা কবুল হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, তা সত্য। ফেরেশতাগণ আরজ করলেন, হে করুণাময়! সে যখন আরামে ছিল, তখন সে যে নেক আমল করেছে তার ভিত্তিতে তাঁকে এ বিপদ থেকে নাজাত দান করুন। তখন আল্লাহ্ পাক মাছের উদর থেকে হযরত ইউনুস (আঃ)-কে নাজাত দিলেন।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৩৩৫-৩৩৯

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾
فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٥٠﴾ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ
لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৯) তার (হযরত ইউনুস (আঃ)-এর) প্রতিপালকের নেয়ামত যদি তাকে রক্ষা না করতো, তবে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে।

(৫০) তার প্রতিপালক তাকে পুনরায় মনোনীত করলেন এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

(৫১) (হে রসূল!) কাফেররা যখন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে তখন মনে হয় তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আঁছড়ে ফেলে দেবে এবং তারা বলে, এ-তো এক পাগল।

(৫২) প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, সমুদ্র বক্ষে বিরাটকায় এক মাছ যখন তাঁকে তার উদরে স্থান দিল এবং তাঁকে নিয়ে সে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে গেল, তখন হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে বিপদ-মুক্তির জন্যে ফরিয়াদ করলেন, তখন আল্লাহ পাক তাকে তাঁর বিশেষ রহমতে রক্ষা করলেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে মাছ তাঁকে "নায়নুয়া" নামক স্থানে উগড়ে ফেলে, আলোচ্য আয়াতে সে সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ﴿٤٩﴾

'তার (হযরত ইউনুস (আঃ)-এর) প্রতিপালকের নেয়ামত যদি তাকে রক্ষা না করতো, তবে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতো উন্মুক্ত প্রান্তরে'।

অর্থাৎ যদি হযরত ইউনুস (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত না হতো এবং যদি তাঁকে আল্লাহ পাক তওবা করার তওফিক না দিতেন এবং যদি তাঁর তওবা দরবারে এলাহীতে কবুল না হতো তবে তাঁকে মরু-প্রান্তরে নিক্ষেপ করা হতো, যেখানে বৃক্ষ-তরুলতা থাকতো না, বাড়ী-ঘর থাকতো না এমন বিরাণ ভূমিতে তাঁকে নিক্ষেপ করা হতো।

وَهُوَ مَذْمُوم

'এ অবস্থায় তাঁর সমালোচনা করা হতো'।

অর্থাৎ যদি আল্লাহ পাকের রহমত না হতো, তবে তিনি সমালোচিত হতেন। সবর অবলম্বন না করার কারণে আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তাঁর জাতিকে ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁর সমালোচনা করা হতো। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত ইউনুস (আঃ) এ পর্যায়ে যা করেছেন, তা উত্তম পন্থা ছিলনা বলেই তাঁর সমালোচনা করা হতো, কেননা নবীর শান অনেক উচ্চে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের রহমত তিনি পেয়ে গেছেন এবং তাঁকে তওবা করার তওফিক দেয়া হয়েছে এজন্যে তাঁর সমালোচনা করা হয়নি, অবশ্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কারো পক্ষেই এজন্যে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সমালোচনা করা বৈধ নয়, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে।

উফীর বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আঃ) তাঁর জাতির সাথে ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন। এক বাদশাহ তাদের উপর হামলা করে এবং বারজন গোত্রীয় সর্দারের মধ্যে অধিকাংশকে গ্রেফতার করে ফেলে।

আল্লাহ পাক তাঁর নবী শাইআ (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেনঃ হেজকিয়াকে (বনী ইসরাঈলের বাদশাহ) বল, হামলাকারী বাদশাহর নিকট কোন বুদ্ধিমান লোককে যেন প্রেরণ করে, আমি তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেব, যেন তারা বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দেয়। হেজকিয়ার শাসনামলে পাঁচজন নবী ছিলেন। বাদশাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর নিকট হামলাকারী বাদশাহর কাছে গমনের আবেদন করলেন। হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, আল্লাহ পাক কি আমাকে এ কাজের জন্যে মনোনীত করেছেন? বাদশাহ বললো, না।

তখন হযরত ইউনুস (আঃ) বললেন, এখানে আরো নবী রয়েছেন, তাঁদেরকে প্রেরণ কর। এরপরও যখন লোকেরা হামলাকারী বাদশাহর নিকট যাওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করতে থাকে, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে পড়েন এবং সমুদ্র তীরে এসে জাহাজে আরোহন করলেন।[১]

فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۞

'তাঁর প্রতিপালক তাঁকে পুনরায় মনোনীত করলেন এবং তাঁকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করলেন'।

অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ দয়ায় হযরত ইউনুস (আঃ)-কে পুনরায় নবুওয়্যতের জন্যে মনোনীত করলেন এবং তাঁর মর্যাদা পূর্বের চেয়েও বাড়িয়ে দিলেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন এবং রসূল হিসেবেও মনোনীত করলেন, আর তাঁর জাতির পক্ষে তাঁর সুপারিশও গ্রহণ করলেন। তিনি শীর্ষস্থানীয় নবী রসূলগণেরও অন্তর্ভুক্ত হলেন।

শিক্ষণীয়

কোরআনে করীমে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর ঘটনা একাধিক স্থানে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে, এতে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয় ।

প্রথমতঃ কোন ব্যাপারেই অধৈর্য হতে নেই, কেননা সাধনার সাফল্য অর্জনে সবর বা ধৈর্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

দ্বিতীয়তঃ বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, কখনো আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই, যদি আল্লাহ পাককে আন্তরিকভাবে কেউ ডাকে, আর সে ডাক হয় মর্মস্পর্শী, তবে আল্লাহ পাকের রহমতের মহাসাগরে তরঙ্গ স্ফীত হয়, সেই তরঙ্গে মানুষের বিপদাপদ দূরীভূত হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ সমুদ্রের তলদেশে মাছের উদরে থেকেও হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহ পাকের করুণা-ভিক্ষা করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনতিবিলম্বে আল্লাহ পাকের রহমতে হযরত ইউনুস (আঃ) বিপদমুক্ত হলেন। অতএব, যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ পাকের জিকর করা, তাঁর রহমতের আশা করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখা একান্ত কর্তব্য।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬০

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۘ

'(হে রসূল!) কাফেররা যখন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে, তখন মনে হয় তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়ে ফেলে দেবে এবং তারা বলে, এ-তো এক পাগল (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)'।

শানে নযুল

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, তদানীন্তন আরবে এমন এক ব্যক্তি ছিল যে, দু' তিনদিন ক্ষুধার্ত থাকার পর নিজের তাঁবুতে ফিরে আসত। ঐ সময় যদি কোন উট বা বকরী সে দেখত তবে সে বলতো, আজকে আমি এর চেয়ে সুন্দর উট, বকরী দেখিনি। একথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ উট বকরীগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। মূলতঃ এটি ছিল তার বদ নজরের প্রতিক্রিয়া। কাফেররা এ ব্যক্তিকে অনুরোধ করেছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বদ নজর ফেলতে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হেফাজত করেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বদনজর দেয়ার চেষ্টা করতো, তাদের একদল লোক তাঁর দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেছিল, আমরা এমন ব্যক্তি আর কখনো দেখিনি, আর এমন যুক্তি-প্রমাণও কারো নিকট শ্রবণ করিনি। বদ নজর দেয়ার জন্যেই তারা এসব মন্তব্য করেছিল।

বর্ণিত আছে, বদ নজর দেয়ার ক্ষেত্রে বনী আসাদ গোত্রের কুখ্যাতি ছিল। তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাদের সম্মুখে কোন হৃষ্ট-পুষ্ট উষ্ট্র বা গাভী বিচরণ করতো, তবে তারা তাদের বাঁদীকে ডাক দিয়ে বলতোঃ টুকরী এবং দেরহাম নিয়ে যাও, এ উষ্ট্র বা গাভীর গোশ্ত নিয়ে আস। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জন্তুটির মৃত্যু হতো।

এ আয়াতের আমল

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে বদ নজরের অব্যর্থ মহৌষধ রয়েছে। যার উপর বদ নজরের প্রতিক্রিয়া হয়, এ আয়াত পাঠ করে তার উপর ফুঁক দিতে হয়।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (বদ) নজর মানুষকে কবরে নিয়ে যায়, আর উষ্ট্রকে পাতিলে। (আবু নায়ীম)

এবনে আদি হযরত আবুজর (রাঃ)-এর সূত্রেও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বদ নজর সত্য

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে তাতে রয়েছেঃ নজর হক্ব।

মসনদে আহমদ এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, নজর হক্ব, যদি কোন কিছু তকদীরের আগে যেতে পারে তবে তা হলো নজর। যদি তোমাদেরকে গোসল করার অনুরোধ করা হয়, তবে তোমরা গোসল করবে। যার নজর লাগে তার শরীর ধৌত করা পানি সে ব্যক্তির দেহে ঢেলে দাও, যার প্রতি তার নজর লেগেছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নজর হক্ব, নজরের সময় শয়তান উপস্থিত হয় এবং মানুষের প্রতি হিংসা করে।

ওবায়েদ (রাঃ) এবনে রোফাআহ থেকে বর্ণিত, হযরত আসমা বিনতে ওমায়েস আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! জাফর (রাঃ) এর পুত্রদের উপর নজর লাগে। আপনি তাদের হেফাজতের জন্যে দম করে দিন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, তকদীরের আগে কোন কিছু যদি কার্যকর হয়, তবে তা হলো নজর।

আয়াতের মর্মকথা

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ

অর্থাৎ কাফেররা যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতো, তখন ক্রোধে উত্তেজনায় ফেটে পড়ত। তাদের দৃষ্টি বাণে তাঁকে বিদ্ধ করার অপচেষ্টা করতো। তাঁর প্রতি নবুওয়্যত ও রেসালতের যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা পালনে বিরত রাখার অপচেষ্টা করতো।

কাফের মুশরেকরা বদ নজর বা দূষিত দৃষ্টি-বাণ দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতো। তদানীন্তন আরবে যারা বদ নজরের জন্যে কুখ্যাত ছিল, এ অসৎ উদ্দেশ্যে কাফেররা তাদেরকে ব্যবহার করতো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন উপলব্ধি করতেন যে, তাঁর প্রতি বদ নজরের চক্রান্ত চলছে, তখন তিনি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্যা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম পাঠ করতেন। ফলে কাফেরদের ঐ অপপ্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতো।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বদ নজর বা দৃষ্টি-বাণের প্রতিক্রিয়া সত্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ) এবং হোসায়েন (রাঃ)-কে বদ নজর থেকে রক্ষা করার জন্যে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেনঃ

أُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ

অর্থাৎ আমি তাদের উভয়কে আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে সোপর্দ করছি, প্রত্যেক শয়তান থেকে এবং বিষাক্ত জন্তু থেকে এবং বদ নজর থেকে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদ্বয় হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে এ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের হেফাজতে রাখতেন। এই হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

এবনে আসাকেরে রয়েছে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন, তখন তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি এরশাদ করলেন, হাসান হোসায়েনের প্রতি বদ নজর লেগেছে। তখন জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, আপনি এ দোয়া পাঠ করে তাদেরকে আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে কেন দিলেন না? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সে দোয়াটি কি? জীব্রাঈল (আঃ) বললেন, তা হলোঃ

اَللّٰهُمَّ ذَاالسُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ذَاالْمَنِّ الْقَدِيْمِ ذَاالْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِيَّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে বিরাট রাজত্বের অধিকারী, হে মহান উপকারী, হে মহান সত্ত্বা, যিনি দোয়া কবুল করেন। হে আল্লাহ! তুমি হাসান হোসায়েনকে সমস্ত জ্বীনদের বাতাস থেকে, মানুষের চক্ষু থেকে রক্ষা কর এবং তোমার নিজের আশ্রয়ে রাখ।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ দোয়া পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দু'জন শিশু উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাঁর সম্মুখেই খেলাধূলা করতে লাগলো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে লোকেরা! তোমরা নিজেদের প্রাণকে, নিজেদের স্ত্রীকে, নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে এভাবে আল্লাহ পাকের আশ্রয়ে রেখ। আল্লাহ পাকের আশ্রয়ের জন্যে এর চেয়ে ভাল কোন দোয়া নেই।

এবনে মাজা শরীফে রয়েছে, সাহল এবনে হানিফ গোসল করছিলেন। আমের এবনে রবীয়া তাঁকে দেখে বললেন, এমনটি আর আমি দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে সাহল এবনে হানিফ বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। তখন লোকেরা এসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজী পেশ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাঁর খবর নিন, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কারো প্রতি তোমাদের কি সন্দেহ হয়? লোকেরা বললো, আমের এবনে রবীয়ার প্রতি সন্দেহ হয়। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে কেন হত্যা করে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার ভাইয়ের এমন কিছু দেখে যা তার ভাল লাগে, তবে তার কর্তব্য হলো ঐ ব্যক্তির জন্যে বরকতের দোয়া করা। এরপর পানি আনিয়ে আমেরকে বললেন, তুমি অজু কর। এভাবে যার প্রতি বদ নজর লেগেছে তার দেহ ঐ পানি দ্বারা ধৌত করা হলে বদ নজরের বিপদ দূরীভূত হয়।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এসব ক্ষেত্রে যার নজর লাগতো তাকে হুকুম দেয়া হতো, সে যেন অজু করে, আর অজুতে ব্যবহৃত পানি দ্বারা সে ব্যক্তিকে গোসল করানো হতো যার প্রতি সে নজর দিয়েছিল। (মসনদে আহমদ)

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ

অর্থাৎ কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কোরআনে করীম শ্রবণ করতা এবং বলতো, এ-তো এক পাগল (নাউজুবিল্লাি মিন জালিক)।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

'প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়'।

বস্তুতঃ যিনি সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, তিনি পাগল হতে পারেন না। যারা তাঁর সম্পর্কে এমন অন্যায় কথা বলে প্রকৃত অবস্থায় তারাই পাগল। আর যা তাঁর প্রতি নাযিল হয়েছে তা পাগলের প্রলাপ নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে মহান শিক্ষা এবং উপদেশ মাত্র। সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে নিহিত রয়েছে এতে সার্বিক কল্যাণ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল্‌হা-ক্কাহ

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَآقَّةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْحَآقَّةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحَآقَّةُ ؕ﴿۳﴾

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ؕ﴿۴﴾ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا

بِالطَّاغِيَةِ ؕ﴿۵﴾ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ﴿۶﴾

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ﴿۷﴾

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ﴿۸﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ

وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ﴿۹﴾ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ

فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿۱۰﴾ اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ

فِي الْجَارِيَةِ ۙ﴿۱۱﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ﴿۱۲﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

(২) কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

(৩) (হে রসূল!) আপনি জানেন কি, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কত ভীষণ?

(৪) আদ ও সামুদ জাতি অস্বীকার করেছিল সেই মহা প্রলয়কে।

(৫) আর সামুদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকরী বিপর্যয়ের মাধ্যমে।

(৬) আর আদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা।

(৭) আল্লাহ পাক তা অনবরত সাত দিন এবং আট রাত্রি তাদের উপর অব্যাহত রাখেন, পরিণামে (হ রসূল!) আপনি তাদেরকে দেখবেন সার শূণ্য খেজুর কান্ডের ন্যায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

(৮) এরপর লক্ষ্য করে দেখুন তাদের কেউ কি রক্ষা পেয়েছে?

(৯) ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং লুতের জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল।

(১০) এরপর তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলের আদেশ অমান্য করে, পরিণামে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন অত্যন্ত কঠিনভাবে।

(১১) নিশ্চয় পানি যখন উথলে ওঠে, আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌকায় তুলে নেই।

(১২) আমি তা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে, আর তোমাদের যে কেউ স্মরণ রাখতে পারে সে যেন তা স্মরণ রাখে।

সূরা আল্ হা-ক্কাহ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে দু' রুকু এবং ৫২টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায় ২৫৬টি বাক্য ও ১,৪৮০টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হা-ক্কাহ কেয়ামতের একটি নাম। আর এ নামকরণের কারণ এই, কেয়ামতের দিনই সকল প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কবাণীর সঠিক বাস্তবায়ন হবে। এজন্যেই এ নামকরণ করা হয়েছে। কেয়ামত ধ্রুব সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

অথবা এ নামকরণের কারণ এ-ও হতে পার যে, কেয়ামতের দিনই সকল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য জানা যাবে, সেদিনই সকল আমলের বদলা দেয়া হবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় তওহীদের আলোচনার পাশাপাশি কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। যারা পৃথিবীতে ইতোপূর্বে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, লুত (আঃ)-এর জাতি এবং ফেরাউন ও তার দলবল- এসবের ধ্বংসের কথা এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের জন্যে শিংগায় ফুঁক দেয়ার পর যে ভয়াবহ অবস্থা হবে, তার বিবরণও রয়েছে এ সূরায়।

সূরার পরিসমাপ্তিতে পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে, আর যারা এর সত্যতাকে অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে সে যদি কোন কাজের দায়িত্বে থাকে, তবে তাকে শূলে চড়ানো হবে। আর যদি সে রুগ্ন থাকে তবে এ রোগেই তার মৃত্যু হবে। যদি স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্ত্রীলোক হয় তবে তার স্বামী তাকে তালাক দেবে, অথবা যে স্বপ্নে দেখবে যে, সে এ সূরা পাঠ করছে সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

এ সূরার আমল

এ সূরা লিপিবদ্ধ করে যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের হাতে বেধে রাখা হয়, তবে সন্তানের হেফাজত করা হয়। যদি সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সূরা পাঠ করে দম করা পানি মুখে দেয়া হয়, তবে তার ধী-শক্তি বৃদ্ধি হয়। এ সূরা পাঠ করে জয়তুনের তেলের উপর দম করে মালিশ করা হলে সন্তানের হেফাজত হয় এবং শারীরিক দিক থেকে উপকৃত হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। অহংকার এবং নাফরমানীর শোচনীয় পরিণতির কথাও বলা হয়েছে। আর এ সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। ইতোপূর্বে যে সব জাতি আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তা-ও বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য সূরায়।

তফসীরুল কোরআন

اَلْحَآقَّةُ ۞ مَا الْحَآقَّةُ ۞ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحَآقَّةُ ۞

'সেই সাব্যস্ত, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা? (হে রসূল!) আপনি কি জানেন, সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কত ভীষণ'?

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে الحاقة শব্দটি দ্বারা কেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এবনুল মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ "আল্ হা-ক্কাহ" কেয়ামতের দিনের অন্যতম নাম।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)-ও এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো কেয়ামত, যেদিন প্রত্যেকটি মানুষ তার আমলের বদলা পাবে। মোমেনগণ সেদিন তাদের ঈমানের ফলশ্রুতি স্বরূপ জান্নাত লাভ করবে, আর কাফেররা তাদের কুফরী ও নাফরমানীর দরুণ দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

অতএব, এর অর্থ হলো কেয়ামতের সে কঠিনতম মুহূর্ত অবশ্যই আসবে, কেয়ামত ধ্রুব সত্য, এতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্রও। কেয়ামতের সে মুহূর্ত কত কঠিন, কত ভয়াবহ হবে তা উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়, তাই এরপরই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحَآقَّةُ

'(হে রসূল!) আপনি কি জানেন, সে অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি কত ভীষণ'?

কেয়ামতের ভয়াবহতা প্রকাশ করার জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এ প্রশ্ন করা হয়েছে।

তফসীরকার ইয়াহয়া এবনে সালাম (রঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমে যেখানেই ما ادرك (আপনি কি জানেন) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আর যেখানে ما يدرك শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিষয়টি তাঁর নিকটও গোপন রাখা হয়েছে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮৬
তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১০২

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কেয়ামত যা অনিবার্য সত্য, যা অবশ্যম্ভাবী, যা সাব্যস্ত বিষয়, যা ঘটবার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন মানুষের পুরস্কার এবং শাস্তির ফয়সালা হবে। সেদিন হক্ব ও বাতিল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। সেদিনের ভয়াবহতার সত্যিকার উপলব্ধি কারোই নেই, মানুষের জন্যে তা কল্পনাতীত।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۞

'আদ ও সামুদ জাতি অস্বীকার করেছিল সেই মহা প্রলয়কে'।

কেয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করার জন্যে আদ ও সামুদ জাতির ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আদ ও সামুদ জাতি কেয়ামতের সে মহা প্রলয়কে অস্বীকার করেছিল, তাই দুনিয়াতেই তারা কেয়ামতের কিছুটা নমুনা প্রত্যক্ষ করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, আদ এবং সামুদ জাতি আরবেই বসবাস করতো, তাদের ধ্বংসের ঘটনা লোকমুখে প্রচারিত ছিল।

সামুদ জাতির বসবাস ছিল আরবের উত্তর-পশ্চিমে, পাহাড় কেটে তারা বাড়ী-ঘর নির্মাণ করতো। তাদের পূর্বে আদ জাতি ছিল ইয়ামনের অধিবাসী, তাদেরকেও সত্য গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং শেষ বিচারের দিন তথা কেয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। সামুদ জাতির হেদায়েতের জন্যে হযরত সালেহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আদ জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত হুদ (আঃ)। সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-কে অস্বীকার করেছিল, আর আদ জাতি অমান্য করেছিল হযরত হুদ (আঃ)-এর উপদেশ।

হযরত সালেহ (আঃ) যখন সামুদ জাতিকে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন তখন তারা বললো, আপনার সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ একটি মোজেযা প্রদর্শন করুন। এ পাথর থেকে একটি উষ্ট্রী বের করে আনুন, যা হবে দশ মাসের গর্ভবতী। যদি আপনি তা করেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো।

হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তাদের ইচ্ছানুযায়ী উষ্ট্রী বের হয়ে আসল এবং সকলের সম্মুখেই তা একটি বাচ্চা প্রসব করলো, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলোনা, তারা বললো, এ-তো যাদু ব্যতীত আর কিছুই

নয়। আল্লাহ পাক ঐ উষ্ট্রীটিকে তাদের জন্যে আযাবে পরিণত করলেন। ঐ এলাকায় পানির অভাব ছিল অথচ সমস্ত পানি উষ্ট্রীটি একদিন একাই পান করে ফেলত, আর একদিন সকলের জন্যে ছেড়ে দিত। ঘাসের ব্যাপারেও তার এই একই নীতি ছিল। অবশেষে সামুদ জাতি সিদ্ধান্ত নিল যে, উষ্ট্রীটিকে হত্যা করতে হবে, আর এ উদ্দেশ্যে কাজার এবনে সালেফ নামক এক ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পিত হলো। সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করলো, তাদের ঔদ্ধত্ব সীমা অতিক্রম করলো, তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে বললো, আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে আমাদেরকে যে আযাবের ভয় প্রদর্শন করছেন, তা নিয়ে আসুন।

হযরত সালেহ (আঃ) বললেন, তোমরা তিন দিন নিজেদের বাড়ী-ঘরে আনন্দ-উল্লাস করে নাও, প্রথম দিন তোমাদের চেহারার বর্ণ হবে হলুদ, দ্বিতীয় দিন হবে লাল, আর তৃতীয় দিন তোমাদের বর্ণ হবে কালো। চতুর্থ দিন সকালে তোমাদের প্রতি আযাব আসবে। আর তাই হয়েছিল। একটি বিরাট চিৎকারই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। ভূমিকম্প তাদের সব কিছু তছনছ করে দিয়েছিল। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) একটি হুংকার দিয়েছিলেন। পরিণতিতে সামুদ জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির কলজে ফেটে যায়, ক্ষণিকের মধ্যেই তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۞

'আর সামুদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্করী বিপর্যয়ের মাধ্যমে'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, সামুদ জাতির ধ্বংসের পর তাদের জনপদ এমন বিরাণ মৃতপুরীতে পরিণত হয়েছিল, যেন কখনো এখানে মানুষ বসবাস করেনি, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপই তাদের এ ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল। কেয়ামতের ভয়াবহতা উপলব্ধির জন্যে সামুদ জাতির ধ্বংস সহায়ক হতে পারে।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ

'আর আদ জাতি, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা। আল্লাহ পাক তা অনবরত সাত দিন এবং আট রাত তাদের উপর অব্যাহত রাখেন'।

আদ জাতির নিকট আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, বরং আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

তখন তাদের প্রতি আযাব আপতিত হয়। দারুণ হিম প্রবাহে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তীব্রগামী ঝড়-ঝঞ্ঝা তাদেরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আর এ ঝড়-ঝঞ্ঝা অব্যাহত থাকে অনবরত সাত দিন এবং আট রাত পর্যন্ত।

বর্ণিত আছে, আদ জাতির একজন বৃদ্ধা তীব্র বাতাসের কারণে একটি গর্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা তাকে সে গর্ত থেকে বের করে দেয়। এটি আদ জাতির প্রতি আযাবের অষ্টম দিনের ঘটনা।

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞

'(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা সারশূণ্য খেজুর কান্ডের ন্যায় লুটিয়ে পড়ে আছে'।

অর্থাৎ আদ জাতিকে তীব্রগামী ঝড়-ঝঞ্ঝা এভাবে ধ্বংস করেছে যে, যদি তুমি ঐ দৃশ্য দেখ তবে দেখবে যে, উৎপাটিত খেজুরের কান্ডের ন্যায় লুটিয়ে পড়ে আছে, অথচ এই আদ জাতি তাদের দৈহিক শক্তির জন্যে গৌরব করতো। তারা বলতো,

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

'(এ পৃথিবীতে) আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে'?

সেই শক্তিশালী লোকগুলোকেই আল্লাহ পাকের গজব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আদ জাতিকে 'ধ্বংস করার জন্যে বাতাসের ভান্ডার থেকে একটি আংটির সমান উন্মুক্ত করা হয়েছে, আর সেখান থেকেই বাতাস বের হয়ে এসেছে। প্রথমতঃ গ্রামীন এলাকার উপর প্রবাহিত হয়েছে এবং গ্রামের নারী-পুরুষ-আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাদের ধন-সম্পদ এবং পালিত জন্তুসহ সকলকে আসমান যমীনের মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখেছে। নগরবাসী ধারণা করেছে যে, কৃষ্ণ বর্ণের মেঘমালা দেখা যাচ্ছে, এতে তারা খুশী হয়েছে। গরমের কারণে তাদের যে কষ্ট হচ্ছে তা দূরীভূত হবে বলে মনে করেছে, এমন সময় বাতাসের উপর আদেশ হয়েছে এবং বাতাস যাদেরকে ইতোপূর্বে উপরে তুলেছিল, সকলকে শহরবাসীর উপর নিক্ষেপ করেছে। ফলে উভয়ই ধ্বংস হয়েছে।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আদ জাতির প্রতি যে গজবী বাতাস প্রবাহিত হয়েছে তা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এ বাতাসের ডানা এবং লেজ ছিল। এটি ছিল আদ জাতির কুফরী ও নাফরমানীর পরিণতি।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ۝

'এরপর লক্ষ্য করে দেখ, তাদের কেউ কি রক্ষা পেয়েছে'?

শক্তিধর আদ জাতিকে আল্লাহ্ পাকের গজব দ্বারা যখন ধ্বংস করা হয় তখন তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলনা। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তুমি লক্ষ্য কর, তাদের কেউ কি আসমানী গজব থেকে রক্ষা পেয়েছে? আছে কি কেউ তাদের নাম নেয়ার মত? কেউ নেই, তাদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেছে।

বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি যখন আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের নাফরমানী সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের আযাবের সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই আযাবের সময়ও নির্ধারিত হয়, তখন আসমানী গজব তাদের প্রতি আপতিত হয় এবং তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। এটিই আল্লাহ্ পাকের অমোঘ বিধান। কোরআনে করীমে এ বিধানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এভাবেঃ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا

'আর যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎকাজ করার আদেশ প্রদান করি। কিন্তু তারা সেখানে অন্যায় অসুন্দর কাজ করে। এরপর তাদের প্রতি আমার দন্ডাজ্ঞা ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায়, এরপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেই'। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১৬)

এ হলো আল্লাহ্ পাকের নিয়ম-নীতি, যা সর্বকালে কার্যকর হয়ে থাকে। যেমন সামুদ ও আদ জাতির ক্ষেত্রেও তা কার্যকর হয়েছে। এ নিয়ম নীতির কোন ব্যতিক্রম নেই। ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীর বহু জাতি এ নিয়ম মাফিকই ধ্বংস হয়েছে, তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا

'নূহের পর আমি কত মানব গোষ্টীকে ধ্বংস করেছি। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকই তাঁর বন্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্যে যথেষ্ট'। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-১৭)

তাই পরবর্তী আয়াতেও আরো কয়েকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির উল্লেখ রয়েছেঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۞

'ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীরা এবং লুতের জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। এরপর তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলের আদেশ অমান্য করে, পরিণামে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন অত্যন্ত কঠিনভাবে'।

وَالْمُؤْتَفِكٰتُ

অর্থাৎ সেই বস্তিসমূহ, যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছে।

এর দ্বারা হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তাদের বস্তি সমূহকে আল্লাহ পাকের হুকুমে উল্টে দেয়া হয়েছিল এবং এভাবে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে, আর তা করা হয়েছিল তাদের কুফরী নাফরমানী এবং অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ

'তারা তাদের প্রতিপালকের রসূলের আদেশ অমান্য করেছিল'।

সদুমবাসী হযরত লূত (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করেছিল, এমনিভাবে ফেরাউন ও তার দলবল হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউন ও তার দলের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু ফেরাউন ও তার দল হযরত মূসা (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করেছিল।

فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً

'তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন অত্যন্ত কঠিনভাবে'।

আল্লাহ পাক ফেরাউন ও তার নয় লক্ষ সৈন্য সহ সকলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে ফেরাউনের জুলুমের অবসান হয়। তদানীন্তন পৃথিবীর মানুষ বিশেষতঃ মিশরের মজলুম অধিবাসীরা ফেরাউনের জুলুম থেকে রক্ষা পায়। এ ছিল তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত। যুগে যুগে এভাবেই জালেমদের শাস্তি হয়। তাদের জুলুমের অবসান ঘটে। এরপর আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির উল্লেখ করেছেন। সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে হেদায়েত করেন। কিন্তু তাঁর জাতি সেই হেদায়েত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, উপরন্তু তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, এরপর তাদের প্রতি শাস্তি আপতিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ۞

'নিশ্চয় পানি যখন উথলে উঠে, আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌকায় তুলে নেই'।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ

'আমি তা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে'।

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি যখন শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তখন আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে একটি বিরাটাকারের নৌকা তৈরীর আদেশ দেন, যথাসময়ে তা করা হলো এবং মোমেনদেরকে তাতে আরোহন করার নির্দেশ দেয়া হলো। এরপর একদিকে যমীনের অভ্যন্তর থেকে পানি উথলে উঠতে লাগল, অন্যদিকে অবিরাম বারি বর্ষিত হতে থাকল, এভাবে বন্যার মাধ্যমে তদানীন্তন পৃথিবীর কাফের মুশরেকদেরকে ধ্বংস করা হলো, মানব জাতি যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেজন্যে এসবের অবতারণা। আর এজন্যে

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ۞

যেন তোমাদের যে কেউ স্মরণ রাখতে পারে, সে যেন স্মরণ রাখে।

আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন এবং তার দলবল, লুত (আঃ)-এর জাতি এবং নূহ (আঃ)-এর জাতি কি কি অপরাধে শাস্তি পেয়েছিল তা দেখা এবং সেসব অপরাধ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সমগ্র জাতির সলিল সমাধি হলো, কিন্তু যারা মোমেন ছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক রক্ষা করলেন, ঠিক এভাবেই তিনি কেয়ামতের দিন মোমেনদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, আর কাফেররা ভোগ করবে দোযখের কঠিন কঠোর শাস্তি।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَ
الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾
وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ
تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّي
ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾

তরজমা

(১৩) এরপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁক।

(১৪) আর যমীন এবং পাহাড় উত্তোলিত হবে এবং সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে।

(১৫) সেদিনই সংঘটিত হবে কেয়ামত।

(১৬) এবং আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তা সেদিন সম্পূর্ণ নিস্তেজ হবে।

(১৭) আর ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের আরশ সেদিন আটজন ফেরেশতা বহন করতে থাকবে তাদের উপরে।

(১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবেনা।

(১৯) অতএব, যে কেউ তার ডান হাতে তার কিতাব (আমলনামা) লাভ করবে, সে বলবে, আস, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

(২০) আমি জানতাম যে, আমার হিসাব আমি দেখতে পাব।

(২১) তাই সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।

(২২) উচ্চস্তরের উদ্যানের মধ্যে,

(২৩) যার ফলগুচ্ছ ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কেয়ামতের কথা যারা অস্বীকার করেছে, তাদের ধ্বংসের বিবরণ রয়েছে। আর এ আয়াত থেকে কেয়ামত সম্পর্কীয় আরও বর্ণনা স্থান পেয়েছে। কেয়ামতের সময় কী ঘটবে তার সম্যক বিবরণ রয়েছে এতে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۞

"এরপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, একটি মাত্র ফুঁক"।

এ ফুঁকের পরিণতিতে আসমান যমীন এবং যা কিছু এর মধ্যে রয়েছে, সবই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলোচ্য আয়াতের صور হল একটি শিং, যাতে ফুঁক দেয়া হবে আর ফুঁক দেবেন হযরত ইস্রাফীল (আঃ)। এটি হবে একটি ফুঁক। ঐ ফুঁকের কারণে সমগ্র মানব জাতি প্রথমে সংজ্ঞাহীন হবে, এরপর সকলেই মৃত্যু বরণ করবে। শিঙ্গায় ফুঁক কতবার হবে, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তিনবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। (১) প্রথমবার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। (২) দ্বিতীয় বার যখন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, তখন সমগ্র মানব জাতি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে, এরপর সকলের মৃত্যু হবে। (৩) তৃতীয়বার যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে পুনর্জীবন লাভ করবে। যারা এ মত পোষণ করেন, তারা কোরআনে করীমের নিম্নোক্ত আয়াত সমূহকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

'সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান যমীনের সকল অধিবাসী সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে, তবে যার সম্পর্কে আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, সে বেহুশ হবেনা'।

আর দ্বিতীয় বারের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান যমীনের সকল অধিবাসী সেদিন বেহুশ হয়ে পড়বে'।

আর তৃতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ

'এরপর যখন আরেকবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সকলে দন্ডায়মান হয়ে একে অন্যের দিকে দেখতে থাকবে'।

এ মত পোষণ করেন শায়খ এবনে আরবী (রঃ)।

আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় রয়েছে, কেয়ামতের দিন তিনবার ফুঁক দেয়া হবে, প্রথম ফুঁকের কারণে মানব মনে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হবে, দ্বিতীয় ফুঁকের কারণে মানুষ সংজ্ঞাহীন হবে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে, আর তৃতীয় ফুঁকের কারণে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে আহ্বান করা হবে।

এবনে জরীর (রঃ) তাঁর তফসীরে, তেবরানী মোওয়ালাতে এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, দু'বার ফুঁক দেয়া হবে। যে ফুঁক দ্বারা মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তার দ্বারাই বেহুশ হবে। অতএব, দু'বারই শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। আর এ দু'বার ফুঁক দেয়ার মাঝে চল্লিশ বছর সময় অতিবাহিত হবে।

যাহোক, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন আয়াতে কেয়ামতের এ ভয়াবহ ঘটনাকে الواقعة- القيامة- القارعة- الحاقة প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৬৮-৬৯

কেয়ামতের এ ঘটনা শুরু হবে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে, এর পরিসমাপ্তি ঘটবে সে সময় যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে পৌঁছে যাবেন, আর দোযখীদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

এবনে আসাকের বলেছেন, হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম একরামা (রঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেয়ামতের দিন দুনিয়ার দিনের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি তা আখেরাতের মধ্যে শামিল হবে? একরামা (রাঃ) জবাবে বলেছেনঃ তার প্রথমাংশ দুনিয়ার হবে, আর শেষাংশ আখেরাতের হবে।

এ প্রেক্ষিতে যখন সর্ব প্রথম শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন মানুষের মৃত্যু হবে, এরপর মানুষ পুনর্জীবন লাভ করবে এবং হিসাব-নিকাশ হবে, আসমান বিদীর্ণ হবে, নক্ষত্রগুলো বিচ্ছিন্ন হবে, আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় লোকগণ জান্নাতে যাবে এবং তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে, এসব কথাই আলোচ্য আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۞

'আর যমীন এবং পাহাড় উত্তোলিত হবে এবং সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে'।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যমীন এবং পাহাড় বালুতে পরিণত হবে। আর সে বালু কাফেরদের চেহারায় চড়ানো হবে, মোমেনদের চেহারায় নয়। কাফেরদের চেহারাই সেদিন কর্দমাক্ত হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, যমীন এবং পাহাড় উত্তোলিত হবে", তখন কী হবে তারই জবাব রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۞

'সেদিনই সংঘটিত হবে কেয়ামত এবং আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তা সেদিন সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে যাবে'।

অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার দিন সে মহা প্রলয়ের ঘটনা ঘটে যাবে। কোরআন ও হাদীসের আলোকে যা ধ্রুব সত্য, অনিবার্য।

অথবা এর অর্থ হলো, যে সব বিষয় অবশ্য অবশ্যই আসবে, যেমন প্রতিটি মানুষের হিসাব-নিকাশ এবং প্রত্যেকের কর্মের বদলা তথা সৎ কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কর্মের জন্যে শাস্তি, সেদিন অবশ্যই তা হবে।

সেদিন সমগ্র মানব জাতি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবে, প্রত্যেকের ভাল-মন্দ আমল সকলের সম্মুখে প্রকাশ পাবে। যারা ভাগ্যবান তথা যারা ঈমানদার ও নেককার, তাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। এটি হবে তাদের সৌভাগ্যের নিদর্শন। পক্ষান্তরে, যারা হবে ভাগ্যাহত তথা বেঈমান ও বদকার, তাদের আমলনামা দেয়া হবে বাম হাতে।

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ط

কেয়ামতের জন্যে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, আসমান ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে, তখন ফেরেশতাগণ আসমানের মাঝখান থেকে সরে যাবে এবং তার কিনারায় দাঁড়াবেন।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝

'সেদিন আল্লাহ পাকের মহান আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করবেন'।

বর্তমানে চারজন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের আরশ বহন করে থাকেন, সেদিনের গুরুত্বের কারণে তাঁদের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

এ পর্যায়ে আল্লামা সয়ুতি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আটজন ফেরেশতা বলে ফেরেশতাদের আটটি কাতার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর সংখ্যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। সেদিনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এবং সেদিন আল্লাহ পাকের যে ভয়-ভীতি প্রকাশ পাবে, সে কারণেও আরশের ওজন বৃদ্ধি পাবে। তাই আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৮৯
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৫১

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন, কেয়ামতের দিন আরো চারজন ফেরেশতা তাদের সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত হবেন।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۞

'সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না'।

এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করা হবে, সেদিন কারো কোন আমল গোপন থাকবেনা, সবই দিবালোকের মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। সেদিন প্রত্যেকের হাতে তার জীবনের কৃতকর্মের বিবরণ সম্বলিত আমলনামা দেয়া হবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ۞

'অতএব, যে কেউ তার ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে, সে বলবে আস, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ'।

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ۞

'আমি জানতাম যে, আমার হিসাব আমি দেখতে পাব'।

অর্থাৎ যার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে সে সানন্দে সকলকে ডাক দিয়ে বলবে, দেখ! আমার আমলনামা। আমি দুনিয়ার জীবনে একথা বিশ্বাস করতাম যে, একদিন আমাকে অবশ্যই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজিযর হতে হবে এবং আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদেহী করতে হবে, আমি সে হিসেবেই আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করেছি।

এবনে মোবারক আবু ওসমান নাহদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মোমেনদেরকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অন্যদের থেকে গোপন করে আমলনামা দেয়া হবে। মোমেন ব্যক্তি স্বীয় গুনাহর ফিরিস্তি দেখলে তার চেহারার বর্ণ বদলে যাবে। এরপর যখন সে তার নেক আমলের বিবরণ পাঠ করবে, তখন তার চেহারার স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসবে। এরপর সে দেখবে তার মন্দ কাজগুলোকে সৎকার্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে, তখন সে বলবে, তোমরা আমার আমলনামা পড়ে দেখ।

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۙ

তাই সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন। যে জীবন হবে চিরস্থায়ী, যে জীবনে থাকবে অন্তহীন আরাম-আয়েশ, সীমাহীন আনন্দ উল্লাস।

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ

আর সে জীবন অতিবাহিত হবে উচ্চ স্তরের উদ্যানের মধ্যে।

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ۙ

যে উদ্যানের ফলগুচ্ছ থাকবে প্রত্যেকের নাগালের মধ্যে।

এমনকি, কোন কোন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীগণ কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে, সে খাবার তার মুখে প্রবেশ করছে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا
هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَاَمَّا مَنْ
اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٥﴾
وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ
اَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوْهُ
فَغُلُّوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٤﴾

তরজমা

(২৪) তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার কর, তোমরা অতীত কালে যে নেক আমল করেছিলে তার বিনিময়ে।

(২৫) আর যাকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে (আক্ষেপ করে) বলবে! হায়! যদি আমাকে আমার আমলনামা দেয়া না হতো।

(২৬) যদি আমি না জানতাম আমার হিসাব!

(২৭) হায়! এ মৃত্যুই যদি (আমাকে) শেষ করে দিত।

(২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসলো না।

(২৯) আমার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়েছে।

(৩০) (এমন লোকদের সম্পর্কে আদেশ হবে) তাকে ধর এবং গলায় শিকল পরিয়ে দাও।

(৩১) এরপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ কর।

(৩২) পুনরায় সত্তর গজ লম্বা জিঞ্জিরে তাকে বেধে ফেল।

(৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনতো না।

(৩৪) এবং ফকির মিসকীনকে খাদ্য প্রদানে অনুপ্রাণিত করতো না।

তফসীরুল কোরআন

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا ۢ بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۞

'তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার কর, তোমরা অতীত কালে যে নেক আমল করেছিলে তার বিনিময়ে'।

অর্থাৎ সেদিন জান্নাতীদেরকে বলা হবে, তোমরা তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার কর, তোমরা অতীতে তথা দুনিয়ার জীবনে যে নেক আমল করেছিলে, তারই বিনিময়ে আল্লাহ্ পাকের এ অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ কর।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۞

'আর যাকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সে (আক্ষেপ করে) বলবে! হায়! যদি আমাকে আমার আমলনামা দেয়া না হতো'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঈমানদার ও নেককারগণের শুভ-পরিণতি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা চির সুখ ও চির শান্তির প্রাণ কেন্দ্র জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আর আলোচ্য আয়াত সমূহে বেঈমান ও পাপীষ্ঠ লোকদের শোচনীয় পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। তাদের দুর্ভাগ্যের প্রথম নিদর্শনই হবে এই যে, তাদের বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া

হবে সে আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি আমাকে এ আমলনামা না দেয়া হতো তবে কত ভাল হতো! সে তখন অবশ্যম্ভাবী মহা বিপদের মুখোমুখি হয়ে আক্ষেপ করে আরও বলবেঃ

وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهْ۞

'যদি দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের হিসাব-নিকাশকে সত্য বলে বিশ্বাস করতাম, তবে আজ এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না'।

يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۞

অর্থাৎ যদি আমার মৃত্যুই আমাকে শেষ করে দিত, যদি আমাকে পুনর্জীবিত না করা হত!

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে অপ্রিয় বস্তু হলো মৃত্যু, অথচ কেয়ামতের কঠিন দিনে মানুষ সে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে। যদি সে মৃত্যুই জীবনের চির অবসান ঘটাতো, তাহলে এ বিপদের সম্মুখীন হতাম না, যেমন অন্যত্র আল্লাহ পাক বিষয়টিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

'সেদিন সে বলবে, হায় আক্ষেপ! 'যদি পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে আমি কিছু করে আসতাম'। (সূরা ওয়াল ফাজর)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

'সেদিন কাফের বলবে, 'হায়! আমি যদি মানুষ না হয়ে মাটি হয়ে যেতাম, তবে এমন বিপদে পড়তাম না'। (সূরা নাবা)

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ۞

অর্থাৎ সেদিন ঐ ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলবে, 'আজ আমার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসছে না'।

দুনিয়ার জীবনে মানুষ সর্বক্ষণ অর্থ-সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থাকে, এমনকি দ্বীন ও ঈমান উপেক্ষা করে অন্যায়-অসুন্দর পথে অর্থ-সম্পদ আহরণ করা হয়, সে সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ যমীনের উপরই পড়ে থাকে, আর ঐ অর্থ-সম্পদের ক্ষণস্থায়ী মালিক নিঃস্ব অবস্থায় দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে। পরকালীন জীবনে তার এ ধন-সম্পদ

কোন কাজেই আসেনা, তাই কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আক্ষেপ করে বলবে, আমার ধন-সম্পদ এ বিপদ মুহূর্তে কোন কাজেই আসলো না!

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۞

এমনকি, সেদিন সে এ আক্ষেপও করবে, দুনিয়াতে আমার ক্ষমতা ছিল, প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, আজ সে ক্ষমতাও ধ্বংস হয়েছে, কোন কিছুই কাজে আসছে না। আমার দুনিয়ার জীবনের ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি-সামর্থ্য কোন কিছুই রয়নি, আমি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি। তখন এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নির্দেশ হবে,

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۞

'তাকে পাকড়াও কর এবং তার গলায় শেকল পরিয়ে দাও এবং তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ثم শব্দটি দ্বারা এ সত্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য, প্রত্যেক বিপদ পূর্ববর্তী বিপদের চেয়ে ভয়াবহ। প্রথমতঃ গ্রেফতার হওয়া, এরপর হাত ও ঘাড়ে তাকে বেধে ফেলা, এরপর দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়া, এরপর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হওয়া। প্রত্যেকটি শাস্তিই একটির পর অপরটি কঠোরতর হবে।

خُذُوْهُ

আল্লাহ পাক সেদিন ফেরেশতাগণকে আদেশ দেবেন, তাকে ধর এবং বেধে ফেল আর দোযখে নিক্ষেপ কর।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত মিনহাল এবনে আমর (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের সম্পর্কে এ ফরমান জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৭০ হাজার ফেরেশতা ঐ কাফেরের দিকে দৌড়াবে, যাদের একজন ৭০ হাজার দোযখীকে একসঙ্গে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করতে পারে।

ফেরেশতাগণ ঐ ব্যক্তিকে বলবে, তোর প্রতি আল্লাহ পাক রাগান্বিত, এজন্যে সব কিছুই তোর প্রতি রাগান্বিত।

হযরত ফোজায়েল এবনে ইয়াজ (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের ফরমান জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৭০ হাজার রাগান্বিত ফেরেশতা তার দিকে দৌড়াবে এবং প্রত্যেকেরই ইচ্ছা হবে, সে যেন তাকে পাকড়াও করে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৯

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ۞

(পুনরায় সত্তুর গজ লম্বা জিঞ্জিরে তাকে বেধে ফেল।)

কেয়ামতের কঠিন দিনে দোযখের মুখোমুখি হয়ে মানুষ যত বিলাপই করুক না কেন সে বিলাপ ক্রন্দন এবং আক্ষেপ-অনুতাপ তার কোন উপকারেই আসবে না, কেননা আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে নির্দেশ প্রদান করবেন, দূরাত্মা কাফেরদেরকে শেকল পরিয়ে দোযখে নিক্ষেপ কর।

এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শেকল পরানোর যে আদেশের কথা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে তার এই ব্যবস্থা হবে যে, শেকলকে কাফেরদের পেছনের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করানো হবে এবং তাদের নাক দিয়ে বের করা হবে।

এবনে আবি হাতেম এবনে জরীরের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের পেছনের রাস্তা দিয়ে জিঞ্জির প্রবেশ করানো হবে এবং তাদের মুখ দিয়ে তা বের করা হবে। সে কখনও আর পায়ের উপর দাড়াতে পারবে না।

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ۞

'নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতো না'।

এ আয়াত থেকে কাফেরদের প্রতি এ কঠিন শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদের অন্যায়-অনাচারের অন্ত ছিল না, তারা ছিল অহংকারী, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে, যিনি লালন পালন করছেন আমাদেরকে, সেই আল্লাহ পাকের প্রতি তারা ঈমান আনেনি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে العظيم শব্দটি ব্যবহার করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী আল্লাহ পাকই, সর্বময় ক্ষমতা তাঁরই, তিনিই পরাক্রমশালী। অথচ কাফেররা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনি, হীন তুচ্ছ সৃষ্টির কাছে মাথা নত করেছে। তাই তারা কঠোর আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর,

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব ও বুজর্গীর পর্দায় আমি আবৃত, যে কেউ আমার পোষাক নিয়ে টান দেবে তথা আমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবো।

অতএব, মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন না করাই হবে দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এটি আল্লাহ্ পাকের হক্ব যে, মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর অনুগত থাকবে। কিন্তু যারা এ হক্ব বিনষ্ট করে তাদের শাস্তি অবধারিত। এটি হলো আল্লাহ্ পাকের হক্বের কথা। এরপর হক্কুল এবাদের কথা, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞

কাফেরদের শাস্তির আরও একটি কারণ হলো, তারা শুধু যে আল্লাহর হক্ব আদায় করতো না তাই নয়; বরং তারা বন্দার হক্বও আদায় করতো না, তারা দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বিপদগ্রস্ত এতিম মিসকীনকে নিজেতো সাহায্য করতো না, এমনকি অন্যকেও এজন্যে অনুপ্রাণিত করতো না।

তফসীরকারগণ বলেছেন, অত্যন্ত মন্দ ও ঘৃণ্য আকীদা হলো কুফর ও নাফরমানী। আর আমলের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হলো কৃপণতা। আর কাফেরদের মধ্যে এ দুটি চারিত্রিক দুর্বলতাই থাকে।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۙ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ
غِسْلِيْنٍ ۙ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا
تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ
كَرِيْمٍ ۚ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿٤١﴾
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ؕ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ﴿٤٤﴾
لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ﴿٤٦﴾ فَمَا
مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৩৫) অতএব, আজ এখানে তার কোন বন্ধু নেই।

(৩৬) এবং (দোযখীদের) ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত তার কোন খাদ্যও নেই।

(৩৭) পাপীষ্ঠরা ব্যতীত আর কেউ তা খাবেনা।

(৩৮) অতএব, আমি সে সব বস্তুর শপথ করছি, যা তোমরা দেখতে পাও,

(৩৯) আর যা তোমরা দেখতে পাওনা।

(৪০) নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত ফেরেশতা কর্তৃক আনীত মহান বাণী।

(৪১) এটি কোন কবির কথা নয়, তোমরা অতি অল্পই বিশ্বাস কর।

(৪২) আর এটি কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অতি সামান্যই চিন্তা করে দেখ।

(৪৩) এটি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

(৪৪) আর যদি তিনি আমার উপর কোন (মিথ্যা) কথা আরোপ করতেন,

(৪৫) তবে আমি তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধরতাম।

(৪৬) এরপর কেটে দিতাম তাঁর প্রাণ-শিরা।

(৪৭) এরপর তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে এ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারতো না।

(৪৮) নিশ্চয় এই কোরআন পরহেযগার লোকদের জন্যে এক উপদেশ মাত্র।

(৪৯) আর আমি নিশ্চয় জানি যে, তোমাদের মধ্যে কিছু লোক মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

(৫০) আর নিশ্চয় এই কোরআন কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ হবে।

(৫১) আর নিশ্চয় এই কোরআন ধ্রুব সত্য।

(৫২) অতএব, (হে রসূল!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফেরদের কঠিন-কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যে অপরাধের কারণে এ শাস্তি হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছে এ মর্মে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনতো না, মানুষের হক্বও আদায় করতো না; তথা দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণেও কোন ভূমিকা রাখত না।

আর এ আয়াত থেকে পুনরায় দোযখীদের কঠিন শাস্তির আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾

'অতএব, আজ এখানে তার কোন বন্ধু নেই'।

দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ হলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামতের কঠিন দিনে পাপীষ্ঠদের জন্যে কোন বন্ধু-বান্ধব কাজে আসবেনা। এমন কেউ থাকবে না যে তার বিপদে সাহায্যকারী হতে পারে, যে তার দুঃখ নিবারণে

এগিয়ে আসতে পারে, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا

'সেদিন কোন বন্ধুকে বন্ধু জিজ্ঞাসা করবে না'।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ

'সেদিন জালেমদের কোন বন্ধু থাকবেনা'।

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ۞

'আর দোজখীদের ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত তাদের কোন খাদ্যও থাকবেনা'।

এবনে আবি হাতেম একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, গিসলীন হলো দোযখীদের দেহের ক্ষত -নিঃসৃত পুঁজ, যা তাদেরকে খেতে দেয়া হবে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) এবং রবী (রঃ) বলেছেন যে, গিসলীন দোযখের একটি বৃক্ষ, যা দোযখীদেরকে খেতে দেয়া হবে।

এবনে আবি হাতেম মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরো একটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গিসলীন কি? তা আমার জানা নেই তবে মনে হয় তা জাক্কুম বৃক্ষ হবে।

لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ۞

'পাপীষ্ঠরা ব্যতীত তা আর কেউ খাবেনা'।

দোযখীরা ব্যতীত এমন খাদ্য গ্রহণ করার কথা আর কেউ কল্পনাও করবেনা। ক্ষুধা নিবারণ হয় কিংবা পুষ্টি যোগায় এমন কোন খাদ্য দোযখীদেরকে কখনো দেয়া হবেনা। জঠর-জ্বালায় নিতান্ত অনন্যোপায় হয়ে "গিসলীন" ভক্ষণ করবে, তখন তারা উপলব্ধি করবে, এ খাবারের যে কষ্ট তার চেয়ে ক্ষুধার জ্বালাই ছিল ভালো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "খাতেউন" শব্দ দ্বারা মুশরেকদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ মুশরেকদেরকে এমন ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য দেয়া হবে, যার দিকে কোন মানুষ ফিরেও তাকাতে রাজি হবেনা।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ۞ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ۞

'অতএব, আমি শপথ করছি এমন কিছুর যা তোমরা দেখতে পাও এবং যা তোমরা দেখতে পাওনা'।

পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম

এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম বর্ণনা করেছেন। বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে শপথ করেছেন এমন কিছুর যা মানব জাতি দেখতে পায়, আর যা দেখতে পায়না।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, আল্লাহ পাকের দরবারে থেকে যা বহন করে এনেছেন হযরত জীব্রাঈল (আঃ), যাঁকে দেখা যায়না, আর পবিত্র কোরআনকে বিশ্ব মানবের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁকে সকলেই দেখতে পেয়েছেন।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সকল বস্তুকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। একভাগ, যাকে মানুষ চর্ম চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, যেমন আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, আর একভাগ এমন কিছু যা দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন জান্নাত-দোযখ, আরশ-কুরসী, লওহ কলম। এমনিভাবে মানুষ দেখে, যেমন পৃথিবীতে যে সব ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছে তার অনেক জীবন্ত নিদর্শন পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, আর যা মানুষ দেখেনা যেমন কেয়ামত, যা একদিন অবশ্যই ঘটবে, আল্লাহ পাক উভয় ধর্মী বস্তুরই শপথ করেছেন এ আয়াতে।

এভাবে অনেক কিছু আমরা দেখি কিন্তু চর্মচক্ষে নয়; বরং জ্ঞান এবং বিবেক-বুদ্ধির চোখে, অনেক কিছুর রহস্য আমরা বুঝিনা, বিজ্ঞানীরা যা বলে তাতে বিশ্বাস করি। কিন্তু সমস্যা হলো এই, বিজ্ঞান আজ যাকে সত্য বলছে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ধারাবাহিকতায় তাকে কালই মিথ্যা বলছে, কেননা মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে নয়। এক্ষেত্রে মানুষ অসহায়, নিরূপায় কিন্তু যা সকল ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে, তা হলো আল্লাহ পাকের ওহী বা প্রত্যাদেশ, এই ওহী যা সুদীর্ঘ ২৩ বছর যাবত আল্লাহ পাকের দরবার থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছে, তাই হলো পবিত্র কোরআন আর তাই কোরআনের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানব জাতি সত্যের সন্ধান পায়। অতএব, পবিত্র কোরআন মহাসত্য, এ ঘোষণাই রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۞

'নিশ্চয় এই কোরআন এক সম্মানিত রসূলের আনীত মহান বাণী, এটি কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর'।

আলোচ্য আয়াতে رسول শব্দ দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হতে পারে অথবা জীব্রাঈল (আঃ)।[১]

আর ইমাম রাজী (রঃ), এবনে সায়েব (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং এবনে কোতায়বা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ শব্দটি দ্বারা জীব্রাঈল (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

অর্থাৎ এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের বাণী, যা জীব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বহন করে এনেছেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মসজিদে হারামে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পেছনে দাঁড়ানো ছিলাম, তিনি সূরা আল্‌হা-ক্কাহ পাঠ করছিলেন, পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম, মনে মনে ভাবছিলাম ইনি হলেন কবি, আর কোরআনে করীম হলো তাঁর রচনা, তখনই তিনি পাঠ করলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ

'এটি কোন কবির কথা নয়, তোমরা অতি অল্পই ঈমান আন'।

তখন আমি ভাবলাম, এটি গণকের কথা হবে। তখনই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন,

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

'আর এটি কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অতি সামান্যই চিন্তা করে দেখ'। এরপর তিনি পাঠ করলেন,

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'এটি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ'।

যখন দেখলাম আমার মনে যে প্রশ্ন উত্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব পাওয়া যায় পবিত্র কোরআনে, তখন আমার অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[২]

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ঈমানদার ও নেককারদের শুভ-পরিণতি এবং বেঈমান ও বদকারদের শোচনীয় বর্ণিত হয়েছে। এমন অবস্থায় কোন কাফের মুশরেক কোরআনে করীমের এসব বিবরণকে কবির অসার কল্পনা অথবা গণকদের

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৭৭
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৩৯

কথা মনে করতে পারে। তাই এসব ভিত্তিহীন সন্দেহ দূরীভূত করার নিমিত্তে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোরআনে করীম আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যা হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করা হয়েছে। এতে সামান্য কোন বাড়তি কথা নেই, কোন অপ্রয়োজনীয় কথা নেই, এটি কবির কল্পনা নয়, ভিত্তিহীন চিন্তা নয়, এটি গদ্যও নয়, পদ্যও নয়, বাস্তবের আলোকে মানব জাতির কল্যাণার্থেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীম নাযিল করেছেন।

قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ

এর একটি অর্থ হলো, তোমরা অতি অল্পই ঈমান আন।

অথবা এর অর্থ হলো, অতি অল্প সময়ের জন্যে ঈমান আন, যখন কোরআনে করীম নাযিল হয় আর মানব জাতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে বহু বাস্তব সত্য তথ্য পরিবেশিত হয়, তখন কিছুক্ষণের জন্যে লোকেরা পবিত্র কোরআনের সত্যতা মেনে নেয়। কিন্তু এরপর জেদ এবং শত্রুতার কারণে পবিত্র কোরআনের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করতো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ

'তোমরা অতি অল্পই ঈমান আন'।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ

অর্থাৎ এটি কোন গণকের কথা নয়, তোমরা অতি সামান্যই চিন্তা কর।

গণকরা জ্বীন শয়তানদের পরিবেশিত সত্য-মিথ্যাকে একাকার করে মানুষের নিকট প্রকাশ করতো। এভাবে তাদের গায়বী সংবাদ প্রচারের নামে মানুষকে প্রতারণা করতো। অনেকে এ কাজকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতো। তাদেরকে আরব দেশে كاهن বলা হত। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এটি গণকের কথা নয়, বরং এটি হল বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বাণী। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাকে লালন-পালন করছেন, যিনি দান করেছেন মানুষকে তার জীবন-যৌবন-সবকিছু, তিনিই প্রেরণ করেছেন মানব জাতির জন্যে পবিত্র কোরআন, এক পরিপূর্ণ হেদায়েত-নামা, যার বাস্তবায়নে মানব জীবনের সাধনা হবে সার্থক সুন্দর এবং সফলকাম।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۞ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۞ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ۞

'যদি তিনি আমার উপর কোন (মিথ্যা) কথা আরোপ করতেন, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরতাম, এরপর কেটে দিতাম তার প্রাণ-শিরা'।

অর্থাৎ যদি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক সম্পর্কে কোন অসত্য কথা প্রচার করতেন, তবে আল্লাহ পাক কখনও তাঁকে ছেড়ে দিতেন না; বরং তাঁকে কঠোর শাস্তি দিতেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদি রসূল একটি বাক্য, এমনকি একটি অক্ষরও পরিবর্তন করতেন, অর্থাৎ যা আল্লাহ পাকের কথা নয় তা আল্লাহ পাকের বলে দাবী করতেন, অথবা তিনি যদি নিজের কথাকে আল্লাহ পাকের বাণীর সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করতেন, তবে অনতিবিলম্বে তাঁর প্রতি আযাব নাযিল হতো, আর আল্লাহ পাকের আযাবকে বাধা দেয়ার মত কোন শক্তিও নেই যে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যা ধ্রুব সত্য, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۞

'আর নিশ্চয় পবিত্র কোরআন, অবশ্যই পরহেযগার লোকদের জন্যে উপদেশ মাত্র'।

পবিত্র কোরআন মোত্তাকীদের জন্যে উপদেশ

অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় থাকে, যারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা চিন্তা করে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে, তথা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে, তারা কোরআনে করীমের নসিহত দ্বারা উপকৃত হয়। আর যারা মোত্তাকী পরহেযগার নয়, যারা আল্লাহ পাককে মানেনা, তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস করেনা, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কেও বিশ্বাস করেনা, তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়না। নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের জীবন্ত রহমত, আর এ রহমত লাভের পূর্বশর্ত হলো ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারী।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, للمتقين শব্দটির لام অক্ষরটির তাৎপর্য হলো, শুধু মোত্তাকীগণই পবিত্র কোরআনের উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো, ঔষধের মাধ্যমে সে-ই উপকৃত হয় যে তা সেবন করে। তাই যারা পবিত্র কোরআনের উপদেশ মোতাবেক তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করে শুধু তারাই উপকৃত হয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আত্ম সংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং আত্মোন্নতি লাভের লক্ষ্যে যখন কোন ব্যক্তি সত্য-সাধনায় নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখন সে আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি লাভ করতে পারে। নিজের আমিত্বকে বজায় রেখে কোরআনে করীমের মহান বাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া অচিন্তনীয়। নিজেকে আল্লাহ পাকের বন্দা মনে করে তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণভাবে মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ। যদি কেউ আল্লাহর কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে এবং আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করে, তবে আল্লাহ পাকের কালামের আলোকে নিজেকে আলোকিত করতে পারবে না।

ইসলাম শব্দটি سلم শব্দ থেকে নিস্পন্ন। আর سلم অর্থ হল কোন কিছুকে কারো নিকট সমর্পণ করা। বন্দা যখন নিজেকে আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ণভাবে সর্মপন করে তখনই সে প্রকৃত মুসলমান হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি পুত্র ইসমাঈলকে কোরবান করার যে আদেশ হয়েছে, তা বিনা বাক্য ব্যয়ে অনতিবিলম্বে তিনি পালন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের সেই অবস্থাকে আল্লাহ পাক فَلَمَّآ اَسْلَمَا বলে বর্ণনা করেছেন। যখন উভয়ে আত্মসমর্পণ করলো, অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুত্রকে কোরবানী করার জন্যে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) কোরবান হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন, সে অবস্থাকেই আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ বলা হয়।

অতএব যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তারাই আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম কোরআনে করীম দ্বারা উপকৃত হয়।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۞

'আর নিশ্চয় আমি জানি তোমাদের মধ্যে কিছু লোক কোরআনে করীমকে মিথ্যাজ্ঞান করে থাকে'।

অতএব, তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۝

'আর নিশ্চয় কোরআনে করীম কাফেরদের জন্যে অবশ্যই অনুতাপের কারণ হবে'।

যখন তারা দেখবে কোরআনে করীমের অনুসারীগণ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করছে, তখন তাদের আক্ষেপের অন্ত থাকবে না।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, দুনিয়াতে যখন কাফেররা মোমেনদের শান মর্যাদা দেখবে তখনও তারা আফসোস করবে।[১]

আখেরাতে পবিত্র কোরআনের অবিশ্বাসীদের আক্ষেপ-অনুতাপ এজন্যে অধিকতর হবে, তখন পবিত্র কোরআনের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তাদের কঠিন শাস্তি হবে। তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি দুনিয়ার জীবনে কোরআনে করীমের প্রতি বিশ্বাস করতাম এবং তার উপর আমল করতাম তবে আজ এ বিপদ হতো না।

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ۝

'আর নিশ্চয় পবিত্র কোরআন বিশ্বাসযোগ্য, ধ্রুব সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই'।

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় রয়েছে তাদের জন্যে এই কোরআন নিঃসন্দেহে নসিহত ও হেদায়েত।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কোরআনে করীম অবশ্যই এক অনিবার্য সত্য। আল্লাহ পাকের কালাম হওয়ার ব্যাপারে এতে আদৌ কোন সন্দেহ নেই। একীন কথাটির অর্থ হলো, সন্দেহ না থাকা। অর্থাৎ কোরআনে করীম সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত, সুস্পষ্ট, প্রামাণ্য। পবিত্র কোরআনের সত্যতার দলিল সমূহ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। বুদ্ধিমান মাত্রেরই পরিপূর্ণ একীন রয়েছে পবিত্র কোরআনের সত্যতার উপর। আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস বা একীনের জন্যে নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআন হলো বিশেষ উপকরণ।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ۝

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১২০

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকুন'।

যাঁর মহান বাণী এই পবিত্র কোরআন (হে রসূল!) আপনি তাঁর পবিত্র নামের তসবীহ্ পাঠ করতে থাকুন। যারা পবিত্র কোরআনের সত্যতায় বিশ্বাস করেনা, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলে না। আপনি আল্লাহ্ পাকের নাম স্মরণ করুন, তাঁর শোকর আদায় করুন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের "তসবীহ্" শব্দটি নামাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি আল্লাহকে স্মরণ করুন, নামাজ আদায় করতে থাকুন।

হযরত আকাবা এবনে আমের জুহানী থেকে বর্ণিত, যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই কথাটিকে নামাজের রুকুতে পাঠ কর, আর যখন سبح اسم ربك الاعلى নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এ আয়াতকে তোমাদের সেজদার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর। (আবু দাউদ এবনে মাজা)

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকুতে سبحٰن ربى العظيم আর সেজদায় سبحٰن ربى الاعلى পাঠ করতেন। যখন কোরআনে কোন রহমতের আয়াত আসতো তখন তিনি দোয়া করতেন। আর যখন কোন আযাবের আয়াত আসতো তখন তিনি আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি سبحٰن ربى العظيم وبحمده বলে, তার জন্যে জান্নাতে খেজুরের একটি বৃক্ষ বপন করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হল (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের আদেশ মোতাবেক নামাজ আদায় করুন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের তসবীহ্ কথাটি নামাজ আদায়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৮৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মাআরিজ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۝١ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ
لَهٗ دَافِعٌ ۝٢ مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ
الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۝٤

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) এক ব্যক্তি কামনা করলো, সে আযাব আসুক, যা অবধারিত।

(২) কাফেরদের জন্যে, যাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারেনা।

(৩) তা আসবে আল্লাহ্ পারে তরফ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

(৪) ফেরেশতাগণ এবং রুহ আল্লাহ্ পাকের দিকে উর্দ্ধগামী হয়, এমন এক দিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

সূরা মাআরিজ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এতে ২ রুকু এবং ৪৪খানি আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ২১৬ এবং এতে ৮৬১টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

সূরা মাআরিজকে সূরাতুল মাওয়াকে বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূরা আল্ হাক্কাহ'র পরই এ সূরা নাযিল হয়।

এ সূরার আমল

নিদ্রার পর যদি কেউ এ সূরা পাঠ করে তবে মন্দ স্বপ্ন দেখা থেকে তার হেফাজত করা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে, জীবনের শুরুতে যদি সে পাপাচারে লিপ্তও থাকে, তবে শেষ বয়সে তওবা নসীব হবে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

মূল বক্তব্য

পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য এবং ব্যর্থতার ভিত্তি বা মানদন্ড কী, তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরকালীন জীবনের আরাম ও আনন্দ অথবা দুঃখ-কষ্ট কেন হবে তার বর্ণনাও রয়েছে এ সূরায়। পাশাপাশি মোমেন ও কাফেরদের অবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মক্কার কাফেরদের ইসলাম বিরোধিতা, মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপ প্রভৃতির জবাব রয়েছে এ সূরায় এবং মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় কত বেশী তৎপর ছিল, তারও উল্লেখ রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۞

'এক ব্যক্তি কামনা করলো, সে আযাব আসুক, যা অবধারিত'।

শানে নুযুল

নজর এবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি আযাব ত্বরান্বিত করার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিল। সে ছিল মক্কার কুখ্যাত কাফের। সে এভাবে দোয়া

করেছিলঃ "হে আল্লাহ! যদি এই কোরআন এবং এই রসূল সত্যই তোমার তরফ থেকে হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর, আর আমাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল কর"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বর্ণনা করেছেন[১]। (নেসায়ী, এবনে আবি হাতেম)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর তিনি মক্কাবাসীকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, তারা তাঁর বিরোধিতা করলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। তখন কাফের মুশরেকরা বললোঃ এ আযাব কার জন্যে? তখন আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত সমূহ নাযিল করলেন।[২]

এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ নজর এবনে হারেস যে আযাব চেয়ে আরজী পেশ করেছিল, তা এসেছে বদরের যুদ্ধের দিন। বদরের রণাঙ্গণে ৭০ জন কাফের সেদিন নিহত হয়েছিল এবং সমসংখ্যক কাফের মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল।

এবনুল মুনজের বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন যে, যখন এ সূরার প্রথম আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকেরা জানতে চায় যে কার প্রতি আযাব আসবে? তখন দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়ঃ

لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ

'কাফেরদের জন্যে, যাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবেনা'।

যেহেতু আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আযাব নাযিল হবে, তাই তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারোই থাকবেনা।

مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۞

'তা আসবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, "মাআরিজ" হলো মর্তবার বিভিন্ন স্তর। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এমনিভাবে জান্নাতেও উচ্চ মর্তবার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১২১

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর রয়েছে আর প্রত্যেক স্তরের মধ্যে উচ্চতায় পার্থক্য এতটুকু যতটুকু আসমান যমীনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জান্নাতুল ফেরদাউসের মর্তবা সর্বোচ্চে, আর জান্নাতুল ফেরদাউস থেকেই জান্নাতের চারি পার্শ্বে নহর প্রবাহিত রয়েছে। জান্নাতুল ফেরদাউসের উপরে রয়েছে মহান আরশ। তোমরা যখন আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাতের জন্যে আরজী পেশ করবে তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্যে আরজী পেশ কর। (তিরমিজী)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ বিভিন্ন মর্তবায় একে অন্যকে দেখবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তের নক্ষত্রপুঞ্জ সমূহকে দেখে থাক, জান্নাতীগণের মধ্যে মর্তবার দিক থেকে এমন পার্থক্য হবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এমন উচ্চ-মর্তবায় হয়তো আম্বিয়াগণ ব্যতীত কেউ পৌঁছতে পারবেন না।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ কেন পৌঁছতে পারবে না? শপথ সেই পবিত্র সত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং নবী রসূলগণের প্রতিও বিশ্বাস করে, তারা এমন উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে। (বোখারী, মুসলিম)

আলোচ্য আয়াতে معارج শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, المعارج। অর্থ السَّمٰوٰت। হলে এমন অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে, আসমান সমূহের মালিক আল্লাহ পাক, কেননা ফেরেশতাগণ আসমান সমূহে আরোহন করতে থাকেন।

তফসীরকার হযরত মুজাহেদ (রঃ)-ও এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যিনি নেয়ামত সমূহের মালিক এবং যিনি দয়াবান, সেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হবে এই শাস্তি।

সুফী-সাধকগণ বলেছেন, المعارج। ذى অর্থ যদি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী গ্রহণ করা হয় এবং معارج কে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের বিভিন্ন স্তর অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এতে সাধকের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত বড় সান্ত্বনা এ মর্মে যে, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সাধনায় যে স্তর পর্যন্তই কেউ পৌঁছুক না কেন, তা দরবারে এলাহীতে গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ এতে আল্লাহর পথের সাধকের জন্যে অনুপ্রেরণাও রয়েছে। সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের সাধনায় যে মকাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাতে ক্ষান্ত হবেনা; বরং সর্বক্ষণ এ পথে সাধনা অব্যাহত রাখবে এবং উন্নতি করতে থাকবে।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ

'ফেরেশতাগণ এবং রুহ আল্লাহ পাকের দিকে উর্দ্ধগামী হয়'।

আলোচ্য আয়াতে "রুহ" শব্দ দ্বারা হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, ফেরেশতাগণের মধ্যে যেহেতু তাঁর মর্যাদা সর্বোচ্চে, তাই তাঁর সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, "রুহ" শব্দটি দ্বারা মানুষের রুহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এমন অবস্থায় রুহ উর্দ্ধগামী হয় একথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের স্মরণে গাফলতের অবস্থা থেকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মকামে পৌছা।

অথবা এর অর্থ হলো মৃত্যুর পর মানুষের রুহকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আসমানে পৌছে, যেমন হযরত বরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, ফেরেশতা যখন মানুষের পবিত্র রুহ বের করে তখন তা নিয়ে একের পর এক আসমান অতিক্রম করে সপ্তম আসমানে পৌছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত আছে।

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۞

এমন একদিনে যা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, অর্থাৎ কেয়ামতের দিন। সেদিন দুনিয়ার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে, যারা আল্লাহর রসূলকে অবিশ্বাস করে, যারা কোরআনকে অবিশ্বাস করে, সেদিন তাদের প্রতি কঠিন কঠোর আযাব আপতিত হবে, আর সে আযাব হবে অপ্রতিরোধ্য।

আর সেদিনের সময় হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

বায়হাকী একরামার (রঃ) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ কথারই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

ইয়ামান বলেন, কেয়ামতের দিনের পঞ্চাশটি মঞ্জিল হবে, আর প্রত্যেক মঞ্জিল হবে এক হাজার বছরের।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৮৩-৮৪

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এ পর্যায়ে আরো একটি অভিমত হলো এই, যখন থেকে আল্লাহ পাক এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত হবে, তাই মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, দুনিয়ার বয়স পঞ্চাশ হাজার বছর।

একরামা (রঃ) বলেছেন, দুনিয়ার পূর্ণ বয়স হলো পঞ্চাশ হাজার বছর, কিন্তু আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো জানা নেই যে, এর কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে, আর কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। এ পর্যায়ে তৃতীয় মত হলো, দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যকার তফাত হলো কেয়ামতের দিন। অর্থাৎ কেয়ামতের পূর্বের সম্পূর্ণ সময় দুনিয়া আর কেয়ামতের পর চিরকালীন জিন্দেগী আখেরাত। এ মত পোষণ করেছেন হযরত মোহাম্মদ এবনে কা'ব।

এক্ষেত্রে চতুর্থ অভিমত হলো, পঞ্চাশ হাজার বছরের যে দিনের কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো কেয়ামতের দিন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিনকে কাফেরদের জন্যে ৫০ হাজার বছরের সমান সুদীর্ঘ করে দেবেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। লোকেরা বললো, এ ব্যক্তি তার গোত্রের সবচেয়ে বড় ধনী। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কি সত্য যে, তুমি তোমার গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী? সে বললো, হ্যাঁ আমার নিকট বিভিন্ন বর্ণের বহু উষ্ট্র, বহু প্রকার গোলাম, উঁচুমানের অশ্ব প্রভৃতি রয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তখন বললেন, দেখ! খবরদার, এমন যেন না হয়, এ জন্তুগুলো তোমাকে আঘাত না করে, তোমাকে পদদলিত না করে। তিনি বারবার একথাটি বলতে থাকলেন। এমন অবস্থায় ঐ ব্যক্তির চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বললো, হযরত এমনটি কেন হবে? তখন তিনি বললেনঃ শোন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি, যে তার নিজের উষ্ট্রগুলোর হক্ব আদায় না করবে, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তাকে একটি ময়দানে শায়িত করবেন আর ঐ জন্তুগুলোকে হুকুম দেবেন, যেন তাকে পদদলিত করে। যখন সর্বশেষ জন্তুটি তাকে পদদলিত করে, তখন প্রথমটি পুনরায় আসবে, তার প্রতি এ আযাব হতে থাকবে সেদিন, যেদিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে মানুষের মধ্যে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত। এরপর সে

নিজের পথ দেখে নেবে। আর এভাবেই গাভী, অশ্ব, ছাগল প্রভৃতি জন্তুগুলো তাদের শিং দিয়ে তাকে আঘাত করতে থাকবে। তখন সেই আমেরী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে (হযরত) আবু হোরায়রা (রাঃ)! উষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের হক্ব কি? তিনি বললেন, মিসকীনদেরকে আরোহন করার জন্যে দান করা। গরীব জনগণের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, অর্থাৎ তাদেরকে দুধ পানের জন্যে দান করা। যদি তাদের নর জন্তুর প্রয়োজন হয় তবে তাদের বিনামূল্যে দেয়া।

এই হাদীস অন্য সূত্রে আবু দাউদ শরীফে এবং নেসায়ী শরীফেও সংকলিত হয়েছে।

মসনদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কোন স্বর্ণ রৌপ্যের মালিক যদি তার হক্ব আদায় না করে, তবে ঐ স্বর্ণ রৌপ্যের পাত তৈরী করা হবে এবং ঐ পাত দ্বারা স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকের মুখমন্ডলে, পাঁজরে এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের ব্যাপারে মীমাংসা করবেন, আর সেদিন হবে দুনিয়ার সময় মোতাবেক পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এরপর সে তার পথ দেখে নেবে, অর্থাৎ জান্নাত বা দোযখ।[১]

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, সেদিন কি এত সুদীর্ঘ হবে যে দুনিয়ার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সেই আল্লাহ পাকের শপথ! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! মোমেনদের জন্যে তা সহজ করে দেয়া হবে, এমনকি তা একটি ফরজ নামাজ আদায়ের সমান হয়ে যাবে, যা সে দুনিয়াতে আদায় করেছে।[২]

আবদুর রাজ্জাক এবং আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত ইব্রাহীম তাইমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, মোমেনদের জন্যে কেয়ামতের দিনের সময় হবে জোহর আছরের মধ্যবর্তী সময়ের সমান।

আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন কাফেরদের জন্যে হবে অত্যন্ত কঠিন, তারা তাদের ঘামের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেদিন

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৫৭

মোমেনদের কী অবস্থা হবে? তখন তিনি বললেন, তাদের জন্যে স্বর্ণ নির্মিত আসনের ব্যবস্থা হবে, মেঘমালার ছায়া তাদের উপর থাকবে। তাদের প্রতি দিনটিকে সংক্ষিপ্ত এবং সহজ করা হবে। তাদের জন্যে দুনিয়ার একদিনের সমান হবে কেয়ামতের দিন।

এবনে আবি হাতেম, বায়হাকী, হাকেম হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন মোমেনদের জন্যে হবে জোহর আছরের মধ্যবর্তী সময়ের সমান।

আর আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মোমেনদের জন্যে কেয়ামতের দিন একটি ফরজ নামাজ আদায়ের সময়ের সম পরিমাণ হবে।[১]

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ
قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ
الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَ
صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً
لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾

তরজমা

(৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনি উত্তম রূপে সবর অবলম্বন করতে থাকুন।

(৬) নিশ্চয় তারা তাকে (কেয়ামতকে) দূরে দেখছে।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১৩

(৭) আর আমি দেখছি তাকে অতি নিকটে।

(৮) যেদিন আসমান গলিত তাম্রের ন্যায় হয়ে যাবে।

(৯) আর পাহাড়-পর্বত হবে রঙ্গীন উলের ন্যায়।

(১০) বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবেনা।

(১১) সব কিছুই তারা দেখতে পাবে, পাপীষ্ঠরা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! যদি সেদিনের আযাব থেকে নাজাত পেতে পারে নিজের সন্তানদেরকেও মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে,

(১২) নিজের স্ত্রীকেও এবং ভাইকেও,

(১৩) এবং যেখানে সে থাকত, সেই পরিবারবর্গকে দিয়েও,

(১৪) এমনকি, পৃথিবীর সব কিছু দিয়েও, তবু যদি নিজেকে (দোযখের শাস্তি থেকে) রক্ষা করতে পারে।

(১৫) কখনও না, তা যে জ্বলন্ত অগ্নি।

(১৬) কলিজাকে টেনে বের করে আনে।

(১৭) যে কেউ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই সে ডাকে।

(১৮) এবং যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং সামলে রেখেছে, তাকেও সে ডাকে।

তফসীরুল কোরআন

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

মক্কার কাফের নজর এবনে হারেস গং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং কোরআনে করীমকে সত্যজ্ঞান করতো না; এজন্যে সে বিদ্রুপ করে বলেছে, যদি কোরআনে করীম ও আল্লাহ পাকের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্যিই আল্লাহর তরফ থেকে এসে থাকে, তবে হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর এবং আযাব নাযিল কর।

তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সবর অবলম্বনের এবং কাফেরদের ব্যাপারে অধৈর্য না হওয়ার কথা এরশাদ করেছেন এ মর্মে যে, (হে রসূল!) তারা যতই আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করুক, বিদ্রুপ করুক এবং

তাদের প্রতি আযাব ত্বরান্বিত করার কথা বলুক, আপনি তাদের প্রতি মনক্ষুন্ন হবেন না, তাদের প্রতি আযাব ত্বরান্বিত করার কথাও বলবেন না।

কাফেরদের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই তবে তা যথাসময়েই আসবে। তাই কাফেরদের মন্দ ব্যবহারে ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই, আপনি উত্তমরূপে সবর অবলম্বন করুন এবং আপনার প্রতি যে মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা পালন করতে থাকুন।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۞

'নিশ্চয় তারা কেয়ামতকে দূরে দেখছে, আর আমি দেখছি তাকে অতি নিকটে'।

অর্থাৎ কাফেররা কেয়ামতকে বা তাদের প্রতি আসন্ন আযাবকে অনেক দূরে মনে করে, আর আমি দেখছি তা অতি নিকটে, কেননা কাফেরদের প্রতি আযাব নাযিল করা বা কেয়ামত কায়েম করা আল্লাহ্ পাকের কুদরতে অতি সহজ, আদৌ কঠিন কিছু নয়, কেননা যা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তা নিকটেই মনে হয়। আর কাফেরদের যেহেতু আযাব বা কেয়ামত বোধগম্য নয়; তাই তারা তাকে দূরে মনে করছে।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের বিদ্রুপাত্মক আচরণে সবর অবলম্বনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা জেহাদ সম্পর্কীয় নির্দেশ প্রদানের পূর্বে নাযিল হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতে "ছবরে জামিল" বা উত্তম রূপে সবর অবলম্বনের যে নির্দেশ রয়েছে তার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। তিনি বলেছেনঃ কাফেরদের অন্যায়-অনাচার, জুলুম-নির্যাতন এবং বিদ্রুপাত্মক ব্যবহার প্রভৃতির ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট অভিযোগ না করা।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, "সবরে জামিল" এর তাৎপর্য হলো, তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা, কোন চিৎকার, হাহাকার, আর্তনাদ ব্যতীত কাফেরদের থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার কথাই বলা হয়েছে এ আয়াতে।[২]

তবে সাধারণতঃ তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো কাফেরদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ-অনুযোগ না করা। তাদের হালে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আপন মনে নিজের কাজ করে যাওয়া।[৩]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১২৫
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৫৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯৩
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৮৫
৩। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-১১৪০

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, "কাফেররা কেয়ামতের আযাবকে দূরে দেখে", একথার তাৎপর্য হলো তারা কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করে। তারা মনে করে এমন ঘটনা কখনো ঘটবেনা। তাদের ধারণা, আসমান যমীন, চন্দ্র-সূর্য সব ঠিকই থাকবে, এজন্যেই বলা হয়েছে–

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا

তারা কেয়ামতের আযাবকে দূরে দেখে, অর্থাৎ অসম্ভব মনে করে। তাদের ধারণা, আর যদি তা সম্ভব হয়ও তবে বাস্তবে তা কখনো ঘটবেনা।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ۞

'যেদিন আসমান গলিত তাম্রের মত হয়ে যাবে'।

যেদিনের সময় হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান, সেদিন হবে এত ভয়াবহ যে, সেদিন আসমান গলিত তাম্রের ন্যায় হয়ে যাবে।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আসমানের বর্ণ বিভিন্ন হবে, কখনও গলিত তাম্রের ন্যায়, আর কখনও লাল বর্ণের। এমনিভাবে–

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

পাহাড়-পর্বতগুলো রঙ্গীন উলের ন্যায় হয়ে যাবে এবং খন্ড-খন্ড হয়ে উড়তে থাকবে, মনে হবে রঙ্গীন উল উড়ছে।

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا۞

অবস্থা এত বিপজ্জনক হবে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন-প্রিয়জন কারো কাছে আসা তো দূরের কথা, একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করবেনা, কেননা প্রত্যেকে নিজে এত বড় বিপদে থাকবে, অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার মত পরিস্থিতিই থাকবেনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন যে, আপনজন সামনেই থাকবে, কিন্তু ইনি যে আপনজন বিপদের ভয়াবহতার কারণে তা ভুলে যাবে। একান্ত আপনজন দেখলেও কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করবেনা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন সকলেই সকলের সম্মুখে থাকবে, একে অন্যকে দেখবে কিন্তু নিজের মুসিবতে এমনভাবে গ্রেফতার থাকবে যে, অন্যকে কিছু বলার মত অবস্থায় থাকবেনা।

يُبَصَّرُونَهُمْ
يُبصرونهم

সব কিছুই তারা দেখতে পাবে, কিন্তু কারো কোন প্রকার সাহায্য তারা করতে পারবেনা।

এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, يبصرونهم অর্থ يعرفونهم অর্থাৎ তারা বন্ধু-বান্ধবকে চিনতে পারবে, কিন্তু চেনার পর একজন অন্যজন থেকে পলায়ন করবে।[১]

আর চিনতে পারার কারণ এই, মোমেনদের চেহারা হবে অতি সুন্দর, গৌড়বর্ণ আর কাফেররা হবে কৃষ্ণ বর্ণের।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُئْوِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

পাপীষ্ঠরা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! যদি সেদিনের আযাব থেকে নাজাত পেতে পারে নিজের সন্তান-সন্ততিকেও মুক্তিপণ হিসেব দিয়ে, শুধু তাই নয়; নিজের স্ত্রীকেও এবং ভাইকেও এবং পরিবারবর্গের সকল সদস্যদেরকে দিয়েও, এমনকি যদি পৃথিবীর সব কিছু দিয়ে (দোযখের শাস্তি থেকে নিস্তার পায়)।

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۝

কখনও না, অর্থাৎ কোন মুক্তিপণই গ্রহণ করা হবেনা। সমগ্র বিশ্বের বিনিময়েও শাস্তি থেকে তাদেরকে নিস্কৃতি দেয়া হবেনা, তা যে জ্বলন্ত অগ্নি, সে নিদারুণ অগ্নিতে তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। মানুষের কলিজা পর্যন্ত টেনে বের করা হবে, কোন অপরাধীই সেদিন রেহাই পাবেনা।

কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা

এ আয়াত সমূহে সুস্পষ্টভাবে কেয়ামতের দিনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ পর্যায়ে ঘোষণা করা হয়েছে কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব একে অন্যকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবেনা।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৪

দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার একান্ত আপনজনকে নিজের মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েও দোযখের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু তাতেও কোন অপরাধী রেহাই পাবেনা। এ অবস্থা হবে কাফেরদের। পক্ষান্তরে, মোমেনগণ নিজেদের আপনজনদের খবর নেবে, তাদের জন্যে সুপারিশও করবে। মোমেন বন্দা তার ভাইদের নাজাতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজী পেশ করতে থাকবে এই বলে যে, হে পরওয়ারদেগার! এই ব্যক্তি আমার সাথে রোজা রাখত।

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى

'যে কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের প্রত্যেককেই সে ডাকে'।

হাদীস শরীফে এসেছে যে, কেয়ামতের দিন দোযখ হে কাফের! হে মুনাফেক! বলে ডাক দিয়ে বলবে, আমার দিকে আস।

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى۝

'আর যে কেউ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং সামলে রেখেছে, তাকেও সে ডাকবে'।

দোযখ বলে, হে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়কারী! আমার নিকট আস। তখন সে ব্যক্তি ভয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু তাতেও নাজাত পাবেনা, তখন দোযখ থেকে একটি ঘাড় বের হয়ে আসবে, পাখীরা যেমন খাদ্য দানা চয়ন করে, সেভাবে ঐ ঘাড়টি দোযখীদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করেছে কিন্তু তার হক্ব আদায় করেনি, অর্থাৎ যাকাত আদায় করেনি, তাকে দোযখ ডাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, দোযখ সুস্পষ্ট ভাষায় কাফের ও মুনাফেকদেরকে ডাকবে। আর হঠাৎ করে দোযখ তাকে এভাবে নিয়ে যাবে, যেমন পাখী তার খাদ্য চয়ন করে থাকে।

إِنَّ
الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾
وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(১৯) নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল চিত্ত করে।

(২০) যখন তাকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন সে অধৈর্য হয়ে যায়।

(২১) আর যখন সে সম্পদ লাভ করে তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে।

(২২) শুধু ঐ নামাজীগণই এর ব্যতিক্রম,

(২৩) যারা তাদের নামাজে সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকে।

(২৪) আর যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত অংশ রয়েছে

(২৫) সাহায্য প্রার্থী এবং নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের জন্যে।

(২৬) এবং যারা কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

(২৭) আর যারা তাদের প্রতিপালকের আযাবকে ভয় করে।

(২৮) নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আযাব থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না।

(২৯) আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহকে হেফাজত করে।

(৩০) তবে তাদের স্ত্রী এবং বাঁদীদের বেলায় দোষ হবেনা।

(৩১) যে কেউ এতদ্ব্যতীত কামনা করবে, তারাই সীমা লংঘনকারী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মানব চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى

'এবং যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে এবং সামলে রেখেছে, তাকেও সে ডাকে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক তাঁর রাহে ব্যয় করতে বিরত থাকে, এমনকি অবশ্য কর্তব্য যাকাত পর্যন্ত আদায় করেনা, মানবতার কল্যাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেনা; বরং সে নিজের জন্যে তা কুক্ষিগত করে রাখে।

আর এ আয়াতে মানব চরিত্রের দুর্বলতার আরো কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে। উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন এসব চারিত্রিক দুর্বলতা দূরীভূত করে এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۞ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۞

'নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলচিত্ত করে'।

মানুষের মন অত্যন্ত দুর্বল। কোন ব্যাপারে দুঃখ পেলে বা বিপদে পড়লে সে ভেঙে পড়ে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা

ইমাম রাজী (রঃ) هلوعا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো চরম লোভ-লালসা এবং ধৈর্যের অভাব, অধীর ও ব্যাকুল হওয়া, অথচ মানুষের কর্তব্য হলো দুঃখ-দুর্দশায় সবর অবলম্বন করা, অটল অবিচল থাকা। ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায়, সামান্য বিপদে অধৈর্য হয়ে মানুষকে হতে হয় মহা বিপদের সম্মুখীন, এজন্যে পবিত্র কোরআন মানুষকে সবর অবলম্বনের এবং অধৈর্য না হওয়ার শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের আরেকটি চারিত্রিক দুর্বলতা হলো, মানুষ যখন ধন-সম্পদ লাভ করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখে, তখন সে আল্লাহ পাককে ভুলে যেতেও বিলম্ব করেনা। যিনি দান করেছেন তাকে সম্পদ, তাঁর রাহে দান করতে সে কার্পণ্য করে,

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۞

'আর যখন সে সম্পদ লাভ করে, তখন সে কার্পণ্য করতে শুরু করে'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ চরিত্র হলো কৃপণতা, আর এটি হলো চরম কাপুরুষতা। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি মানুষ অর্থ-সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ দু'টি ময়দান পেয়ে যায়, তবু সে তৃতীয় ময়দান লাভের জন্যে প্রার্থী হয়। মানুষের উদরকে কবরের মাটি ব্যতীত কোন কিছু দিয়েই পূর্ণ করা যায়না। যে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ বৃদ্ধ হয়, কিন্তু তার মধ্যে দু'টি জিনিষ যৌবন লাভ করে (১) অর্থ-সম্পদের লোভ (২) বয়স বৃদ্ধির লোভ।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জান্নাতের নিকটবর্তী, তবে দোযখের অগ্নি থেকে দূরে, আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ পাক থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জান্নাত থেকেও দূরে, তবে দোযখের নিকটবর্তী। মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে এবাদত গুজার কৃপণ ব্যক্তি থেকে পছন্দনীয়। (তিরমিজী শরীফ)

মূলতঃ মানুষের নিকট যখন অর্থ-সম্পদ পৌঁছে যায় তখন ঐ অর্থ-সম্পদের সাথে তার অন্তরের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, এজন্যে সে আল্লাহ পাকের রাহে দান করতে কার্পণ্য করে। নিঃসন্দেহে এটি মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা। কিন্তু ওলী আল্লাহগণ এমন দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকেন।

কুতুবুল আকতাব হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রাঃ)-এর দরবারে হাযির হলেন সুলতান মাহমুদ গজনভী। তিনি কয়েকটি থলেতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা তাঁর নিকট হাদীয়া স্বরূপ পেশ করলেন। হযরত আবুল হাসান খেরকানী (রঃ) সুলতান মাহমুদকে আহার করার জন্যে শুকনো রুটি দিলেন। তিনি রুটি চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তখন হযরত খেরকানী (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই রুটি

ভেতরে প্রবেশ করেনা? সুলতান মাহমুদ বললেনঃ জ্বী-না, যায় না। তখন হযরত খেরকানী (রঃ) বললেন, যেভাবে আমার রুটি তোমার উদরে যায়না, তেমনি তোমার থলের সম্পদও আমার উদরে যাবেনা, অতএব তা তুমি তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।

এ হলো আল্লাহ ওয়ালাদের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের চরিত্র হলো সম্পদ যখন সে পায় তখন তা আঁকড়ে ধরে রাখে, হাতছাড়া করতে চায় না।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ۞ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ۞

'শুধুই নামাজীগণই এর ব্যতিক্রম, যারা তাদের নামাজে সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকে'।

প্রকৃত নামাজীর বৈশিষ্ট্য

অর্থাৎ যারা যথাসময়ে নামাজ আদায় করে, নামাজের অবশ্য কর্তব্য সমূহকে সঠিক এবং সুন্দর ভাবে আদায় করে, শান্তিপূর্ণভাবে খুশু খুজুর সঙ্গে নামাজ আদায় করে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

(অবশ্যই সফলকাম হয়েছে সে মোমেনগণ, যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়) সঠিকভাবে যারা রুকু সেজদা করে, সর্বদা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকে, এজন্যে একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

'আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল তাই, যা সর্বদা করা হয়, যদিও কম হয়'।

স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদত মোবারক ছিল, তিনি যখন কোন কাজ করতেন, তখন তা সর্বদা করতেন।

তফসীরকার হযরত কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের নবী হযরত দানিয়াল (আঃ) উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রশংসা করে বলেছেন, তারা এমনিভাবে নামাজ পড়বে, যদি নূহ (আঃ)-এর জাতি তেমনি নামাজ পড়ত, তবে তারা নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হতো না। যদি আদ জাতি উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ন্যায় নামাজ আদায় করতো তবে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করা হতো না। যদি সামুদ জাতির নামায উম্মতে মোহাম্মদীয়ার নামাজের ন্যায় হতো, তবে তাদেরকে

হুংকার দিয়ে ধ্বংস করা হতো না। অতএব, হে লোক সকল! তোমরা সঠিকভাবে নামাজ আদায় কর। নামাজ হলো মোমেনের অলংকার এবং তার উত্তম চরিত্র।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ (শুধু ঐ নামাজীগণই এর ব্যতিক্রম, যারা তাদের নামাজে সর্বদা নিষ্ঠাবান থাকে।)

এর অর্থ হলো, যারা নামাজে সর্বদা সেজদার স্থলে নজর রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে থাকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আবুল খায়ের হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ আয়াতের অর্থ কি যারা সর্বদা নামাজ আদায় করে? তিনি বলেছিলেন না, তা নয়; বরং এর অর্থ হলো, যারা নামাজরত অবস্থায় ডানে-বামে না দেখে।

আহমদ, আবু দাউদ এবং নেসায়ীতে সংকলিত, হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজের মধ্যে বন্দা যতক্ষণ এদিক সেদিক না দেখে, ততক্ষণ আল্লাহ পাকের রহমতের নজর তার প্রতি থাকে। কিন্তু যখন বন্দা এদিক সেদিক দেখে, তখন আল্লাহ পাক তার উপর থেকে রহমতের নজর সরিয়ে নেন।

এমনিভাবে বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে আনাস! (নামাজের অবস্থায়) তোমার দৃষ্টি সেজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখ।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তিরমিজী শরীফেও সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাজের অবস্থায় এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করা ধ্বংসের কারণ হয়। বস্তুতঃ নামাজে "হুজুরে কলব" বা মনের একাগ্রতা অর্জনের জন্যে এবং ওয়াস ওয়াসা দূর করতে সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা।[২]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং মসরুক (রঃ) বলেছেন, "সর্বদা নামাজে নিষ্ঠাবান" থাকার তাৎপর্য হলো, সর্বদা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৮
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-৯১
৩। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৬৩

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۞ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۞

'আর যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত অংশ রয়েছে সাহায্যপ্রার্থী এবং নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের জন্যে'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং এবনে সীরিন (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা যথানিয়মে যাকাত আদায় করে, কেননা যাকাতের অংশটিই শরীয়তে নির্ধারিত রয়েছে, সাধারণ সদকা নির্ধারিত নয়।

আর মুজাহেদ (রঃ), আতা (রঃ) এবং নখয়ী (রঃ) বলেছেনঃ এটি যাকাত নয়; বরং যাকাত ব্যতীত সাধারণ সদকা।

অর্থাৎ যে সাহায্যপ্রার্থী তাকেও দান করতে হবে, আর যে সাহায্যপ্রার্থী হয় না, কিন্তু সে দরিদ্র, সাধারণতঃ মানুষের দান থেকে তারা বঞ্চিত থাকে, এমন বঞ্চিতদেরকেও দান করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, محروم সেই ফকির, যে মানুষের কাছে সাহায্য চায়না এবং তাকে দেয়াও হয়না, এমন লোকদের অনুসন্ধান করে দান করার তাগিদ করা হয়েছে এ আয়াতে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, محروم তাকে বলা হয়, যার আয়-রোজগারের কোন পথ না থাকে।

আর আবু কোলাবা (রঃ) বলেছেন, محروم তাকে বলা হয়, যার অর্থ-সম্পদ কোন দুর্ঘটনার কারণে ধ্বংস হয়েছে।[১]

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۞

'আর যারা কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে'।

অর্থাৎ যারা একথায় বিশ্বাস রাখে যে, কেয়ামতের কঠিন দিনে প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযিরী দিতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। সৎ কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪৮৫
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৪১

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

'অতএব, যে সামান্যতম নেক আমলও করবে সে তার শুভ-পরিণতি দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে, যে সামান্যতম মন্দ কাজও করবে সে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করবে'।

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ۞

'আর যারা তাদের প্রতিপালকের আযাবকে ভয় করে'।

আর আল্লাহর আযাবকে ভয় করা ঈমানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করা এবং তাঁর আযাবকে ভয় করা ঈমানের দাবী। এজন্যই বলা হয়েছেঃ "ঈমান হলো আশা ও ভয়ের মাঝে"।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۞ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

'(হে রসূল!) আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, আর নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক'।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে ভয়ের কথা বলা হয়েছে তার দু'টি কারণ হতে পারে।

(১) আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ফরজ ওয়াজিব কাজের নির্দেশ রয়েছে, তা পালন না করার কারণে।

(২) তাঁর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে।

যে আযাবের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে, তার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ۞

'নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আযাব থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায়না'।

কেননা, আল্লাহ পাকের আযাবকে প্রতিরোধ করার শক্তি কারোই নেই। যদি আল্লাহ পাক কাউকে আযাব দিতে ইচ্ছা করেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা। আর তিনি কারো প্রতি যদি রহমত করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাতেও বাধা দেয়ার শক্তি কারোই নেই, এজন্যে অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'হে পরওয়ারদেগার! যদি তুমি তোমার বন্দাদেরকে আযাব দিতে চাও, তা দিতে পার, কেননা তারা তোমারই বন্দা, আর যদি তুমি তাদেরকে মাফ করে দিতে চাও তবে তাতেও কেউ বাধা দিতে পারেনা, কেননা, তুমি মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়'। (সূরা মায়েদাহঃ আয়াত ১১৮)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۞ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

'আর যারা নিজেদের কামনার স্থানকে হেফাজত করে, শুধু তাদের স্ত্রীগণ ও বাঁদীদের ব্যতীত' আর কারো সাথে কামাচারে লিপ্ত হয়না, এদের বেলায় কোন দোষ হয়না।

অর্থাৎ যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়না।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۞

'যে কেউ এতদ্ব্যতীত কামনা করবে, তারাই সীমালংঘনকারী'।

অর্থাৎ যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তারাই সীমা লংঘনকারী, তাদের কঠিন কঠোর শাস্তি অবধারিত, নিশ্চয় তাদের জীবন-সাধনা ব্যর্থ, কেননা তাদের কর্ম ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়।

এ আয়াত সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যারা যথানিয়মে সঠিক সময়ে সর্বদা একাগ্র চিত্তে নামাজ আদায় করে এবং দান খয়রাত, সদকা যাকাত প্রভৃতির মাধ্যমে বন্দার হক্ব আদায় করে, কেয়ামতের দিনের প্রতি যারা পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করে এবং জীবনের প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে, সংযম অভ্যাস করে, অবিচার ও ব্যভিচার পরিহার করে চলে, আমানতদারীর গুণ অর্জন করে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, সত্য সাক্ষ্য প্রদান করে, নামাজের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে, তাদের জীবন-সাধনাই সাফল্য মন্ডিত, তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে ধন্য, তারা বেহেশতের মনোরম বাগানে বাস করবে। তাই অন্যত্র আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের পরওয়ারদেগার তাদেরকে সুখের জান্নাতের পথ নির্দেশ করবেন, যাদের তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হবে'। (সূরা ইউনুস-৯)

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ
بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ
يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ
عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ
نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ اُقْسِمُ
بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ
خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا
وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ
مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً
اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৩২) আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে।

(৩৩) আর যারা তাদের সঠিক সাক্ষ্য প্রদানে থাকে অটল।

(৩৪) এবং যারা তাদের নামাজ কায়েম করতে যত্নবান থাকে।

(৩৫) তারাই সসম্মানে জান্নাতে বাস করবে।

(৩৬) কাফেরদের কি হলো যে, (তারা এসব কিছু জানা সত্ত্বেও হে রসূল!) আপনার দিকে ছুটে আসছে।

(৩৭) ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, দলে দলে,

(৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি এ আশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে।

(৩৯) তা কখনও হবেনা, আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে।

(৪০) অতএব, আমি শপথ করছি মাশরিক ও মাগরিব সমূহের প্রতিপালকের, নিশ্চয় আমি সম্পূর্ণ সক্ষম।

(৪১) তাদের স্থলে তাদের থেকে উৎকৃষ্টতর মানব গোষ্ঠীকে আনয়ন করতে এবং আমি এতে আদৌ অক্ষম নই।

(৪২) অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতে দিন, যেদিন সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

(৪৩) যেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হয়ে আসবে, মনে হবে তারা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলেছে।

(৪৪) তাদের দৃষ্টি (লজ্জায় অনুতাপে) অবনমিত থাকবে, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, এটি সেদিনই, যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সে সব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, যা অর্জন করার মাধ্যমে মানুষ পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্য অর্জন করতে পারে। আলোচ্য আয়াত থেকে এমনি আরও কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ۞

'আর যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে'।

আমানত দু' প্রকার (১) আল্লাহ পাক ও তাঁর বন্দার মধ্যে কিছু আমানত থাকে, যেমন নামাজ, রোজা, হজ্ব এসব আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবশ্য কর্তব্য ঘোষিত কাজ।

একবার হযরত আলী (রাঃ) অজু করলেন। অজু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারার বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, তাঁর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপতে লাগলো, মনে হলো তিনি অসুস্থ। তখন খাদেম জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? তিনি বললেন, তুমি জান না আমি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাঁর আমানত আদায় করতে যাচ্ছি, তথা নামাজ আদায় করতে যাচ্ছি।

যাহোক, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ বন্দা মাত্রের নিকটই তাঁর আমানত, যেমন বাক শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি। এসব নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে ব্যয় না করা বন্দার কর্তব্য।

(২) মানুষের নিজেদের মধ্যে যে আমানত থাকে তার হেফাজত করা এবং মালিকের নিকট তা পৌঁছে দেয়াও একান্ত কর্তব্য।

এমনিভাবে মানুষ পরস্পরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা রক্ষা করাও মানুষের একান্ত কর্তব্য।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুনাফেকের তিনটি আলামত, কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণ করেনা, আমানত রাখা হলে তাতে খেয়ানত করে।

মুসলিম শরীফে এতটুকু কথা সংযোজিত করা হয়েছে, যদিও সে নামাজ আদায় করে এবং মুসলমান হওয়ার দাবী করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ চারটি কথা এমন, যার মধ্যে এ চারটি কথা পাওয়া যাবে কার্যতঃ সে মুনাফেক হবে। যার মধ্যে একটি কথা থাকবে মুনাফেকীর একটি আলামত তার মধ্যে পাওয়া গেল, যদি সে তা পরিত্যাগ না করে (১) আমানতে খেয়ানত করা, (২) মিথ্যা কথা বলা, (৩) প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা, (৪) ঝগড়া করার সময় গালি দেয়া।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি একজনের সঙ্গে প্রদত্ত কথা রাখার জন্যে ৩ দিন ৩ রাত একটি নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করেছিলেন।

আবদুল্লাহ (রাঃ) এবনে উবাই আল হোসমা বর্ণনা করেন, নবুওয়্যত লাভের পূর্বে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কিছু লেনদেন করেছিলাম। তাঁকে কিছু মূল্য পরিশোধ করা আমার দায়িত্ব ছিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, আমি এখনই তা আদায় করবো, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি বাড়ী যাওয়ার পর তা ভুলে গেলাম। তিনদিন পর এসে দেখি তিনি সেখানেই রয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছো, তিন দিন থেকে আমি এখানে তোমার অপেক্ষা করছি।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۞

'আর যারা তাদের সঠিক স্বাক্ষ্য প্রদানে অটল'।

অর্থাৎ যারা সত্য স্বাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকার করেনা, সত্য স্বাক্ষ্য গোপনও করেনা এবং স্বাক্ষ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তনও করেনা এবং সত্য স্বাক্ষ্য প্রদানে কোন সমালোচকের সমালোচনাকেও ভয় করেনা।

এ স্বাক্ষ্য প্রদান দু' প্রকার, প্রথমতঃ আল্লাহ পাকের তওহীদের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য প্রদান করা, সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ পাক মানব জাতিকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোরআনে করীমের ভাষায়ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই'? তখন সকলেই বলেছিল, 'হ্যাঁ! তুমিই আমাদের প্রতিপালক'। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহ পাকের একত্ববাদের স্বাক্ষ্য প্রদান করেছিল।

এমনিভাবে তৌরাতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা উল্লেখ ছিল। আহলে কিতাবদের কর্তব্য ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার স্বাক্ষ্য প্রদান করা।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের পরস্পরের দেনা-পাওনা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাক্ষ্য প্রদান করা। যারা সঠিক স্বাক্ষ্য প্রদান করে এমনকি যদি সত্য স্বাক্ষ্য নিজের একান্ত আপনজনদের বিরুদ্ধেও দিতে হয়, তবু সত্য সঠিক স্বাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ۞

'এবং যারা তাদের নামাজ কায়েম করার ব্যাপারে যত্নবান থাকে'।

اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ۞

'তারাই সসম্মানে বেহেশতে বাস করবে'।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এসব গুণ অর্জন করবে তারাই জান্নাত লাভে ধন্য হবে।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ۞

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মোমেনগণের সে সব গুণের উল্লেখ রয়েছে, যা অর্জন করলে জীবন-সাধনা সার্থক হয়, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। আর এ আয়াত থেকে দূরাত্মা কাফেরদের যে দুর্গতি কেয়ামতের দিন হবে, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদের একটি দল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হতো, তাঁর মহান বাণী শ্রবণ করতো, এরপর বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করতো। তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ۞ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ

'(হে রসূল!) কাফেরদের কি হলো যে, তারা আপনার দিকে ছুটে আসছে ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে, দলে দলে'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত এবং বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিবরণ শ্রবণ করে কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ছুটে আসত এবং বিদ্রুপ করতো–

اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ۞

'তাদের প্রত্যেকেই কি এ আশা করে যে, তাকে প্রবেশ করানো হবে প্রাচুর্যময় জান্নাতে'?

কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো, তারা বলতো, এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে. এ আসমান ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, এসব কথা অযৌক্তিক, অবিশ্বাস্য। এরপর তারা একথাও বলতো, যদি একথা মেনেও নেয়া হয় যে কেয়ামত আসবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তবু কোন ক্ষতি নেই, কেননা আমরা এ পৃথিবীতে যেভাবে সম্পদশালী, ভাগ্যবান হিসেবে অবস্থান করছি, পরকালেও আমরা ভাগ্যবান হয়েই থাকবো।

তাদের এ আস্ফালনের জবাবেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ তারা কি এ আশা করে যে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে? তাদের এ আশা দূরাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, কাফেররা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক যুগে ছিল, তাঁর দীদার লাভের সুযোগ পেয়েছিল, তাঁর অনেক বিস্ময়কর মোজেযা দেখতে পেয়েছিল, এতদসত্বেও তারা পলায়নপর ছিল, বাঘ দেখলে গাধা যেমন পালিয়ে যায়, তারা তেমনি ডানে বামে পালিয়ে বেড়াত, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ

'তাদের কি হলো? তারা উপদেশ থেকে বিমুখ হয়ে পলায়নপর হয়'।

এ আয়াতেও অনুরূপভাবে এরশাদ হয়েছে যে, কাফেরদের কি হলো, তারা সব কিছু জানা সত্বেও আল্লাহর রসূলের দিকে ছুটে আসে, কিন্তু সত্য গ্রহণে বিমুখ হয় এবং সত্য বিরোধিতায় হয় তৎপর। তারা কি এ আশা করে যে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে? এর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করবে? এটি তাদের ভিত্তিহীন স্বপ্ন, যা কখনো বাস্তবায়িত হবেনা।

كَلَّا

অবশ্যই নয়, কাফেরদের এমন আশা কখনো পূরণ হবেনা, কেননা জান্নাতে প্রবেশের জন্যে যে দু'টি পূর্বশত রয়েছে ১. ঈমান ও ২. নেক আমল, এর কোনটিই তাদের নিকট নেই।

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ۝

'আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মানুষের প্রথম সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে পরকালে পুনর্জীবনের বাস্তবতার প্রতি দলিল পেশ করা হয়েছে, অর্থাৎ কাফেররা ভাল করেই জানে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অথবা শুক্র বিন্দুর মত তুচ্ছ নগণ্য বস্তু দ্বারা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যে আল্লাহ পাক এ কাজটি করেছেন, তিনি পুনরায় যে মৃত্যুর পর জীবন দান করবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর দস্তে মোবারকে একটু থুথু দিয়ে তাঁর অঙ্গুলি স্থাপন করেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আদম সন্তান! তুই আমাকে অক্ষম করতে পারবি? অথচ আমি তোকে অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তোর গঠনকে সুন্দর করেছি, আজ তুই দু'টি চাদর পরিধান করে চলাফেরা করছিস? এবং তুই অর্থ-সম্পদ রোজগার করে সঞ্চয় করছিস এবং তাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিস। অবশেষে যখন প্রাণ-বায়ু বের হওয়ার সময় আসে তখন তুই বলছিস, মৃত্যু এবং আল্লাহ পাকের সামগ্রিক ক্ষমতা সত্য। কিন্তু সত্যের এ স্বীকৃতির সময় এখন আর কোথায়?

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, যে উদ্দেশ্যে হে মানব জাতি! তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্পর্কে তোমরা অবগত, আল্লাহ পাক নিজেই কোরআনে করীমে ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আর আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে এজন্যে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার পরিচয় পায়, আমার মা'রেফাত হাসিল করে এবং আমার বন্দেগী করে'।

কিন্তু যারা এলম হাসিল করে আমলের সাধনার মাধ্যমে আত্মসংশোধন না করে এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য না হয় তারা কীভাবে আশা করতে পারে যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণ যেখানে থাকবেন, তারাও সেখানে পৌঁছতে পারবে? এমন আশা কখনও পূর্ণ হবার নয়।

কেননা তারা আল্লাহ পাকের কিতাব কোরআনে করীম এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ঈমান নিয়ে হাযির হয়না, বরং শত্রুতা নিয়ে হাযির হয়, তাই তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠেনা। আর তারা যে কেয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তার প্রমাণ তারা দেখতে পাবে তাদের নিজেদের

সৃষ্টির মধ্যে, তারা ভাল করেই জানে যে, তাদেরকে তুচ্ছ পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, অতএব তাদেরকে পুনর্জীবন দান করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পক্ষে কঠিন কিছুই নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى ط بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

'তারা কি লক্ষ্য করেনা? যে আল্লাহ পাক আসমান সমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করেননি। তিনি মৃতকে জীবিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কেন সক্ষম হবেন না? নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'। (সূরা আহকাফ ঃ আয়াতঃ ৩৩)

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আসমান জমীনের সৃষ্টি অবশ্যই বড়, তবে অধিকাংশ লোকই তা জানেনা'। (সূরা মো'মেন, ৫৭)

কোরআনে করীমে কেয়ামত এবং মানব জাতির পুনর্জীবন লাভ করা এবং হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হওয়ার বিষয়কে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ এ জীবনের ব্যস্ততায় পরজীবনকে ভুলে না যায়। দুনিয়ার উন্নতির জন্যে ব্যাকুল থেকে আখেরাতের পরিণতি সম্পর্কে গাফলত না করে, আত্মবিস্মৃত না হয়। আর কেয়ামতের দিন সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করা আল্লাহ পাকের পক্ষে যে আদৌ কঠিন নয়, এ সত্যে বিশ্বাসী হওয়া কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। এজন্যে পবিত্র কোরআন কোন জটিল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেনি; বরং যা সহজ, স্বাভাবিক এবং সবার বোধগম্য হয়, এমন কথা বলেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তুমি তোমার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য কর, এরপর তোমার পুনর্জীবনের সত্যতা অনুধাবন কর। পবিত্র কোরআনের সূরা হজ্বে বিষয়টিকে কত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ.....ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ

'হে মানব জাতি! যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে (জেনে রাখ যে) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, এরপর শুক্র থেকে,

এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর আকৃতি বিশিষ্ট এবং আকৃতি বিহীন মাংস খন্ড থেকে, আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃ-গর্ভে রেখে দেই। এরপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, এরপর যেন তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও'। (সূরা হজ্ব, আয়াত-৫)

এ হলো মানব সৃষ্টির ধারা। কোরআনে করীমের এ ঘোষণা প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোরআনে করীমের এ বর্ণনার সত্যতাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করেছে, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ

'আমি তাদেরকে যা থেকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে'।

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ۞

'অতএব, আমি শপথ করছি মাশরেক ও মাগরেব সমূহের প্রতিপালকের, নিশ্চয় আমি সম্পূর্ণ সক্ষম'।

"মাশরেক" হলো সূর্যের উদয়ের স্থল, আর "মাগরেব" হলো সূর্যের অস্তগমনের স্থল, এক কথায় চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় ও অস্তগমনের স্থল সমূহ। উদয়-অস্ত প্রতিদিন বিভিন্ন হয়, তাই মাশরেক ও মাগরেব শব্দের বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, মাশরেক ও মাগরেবের শপথ করার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সৌরজগত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত যাওয়া এবং গমনাগমন সবই রয়েছে আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন, যিনি এমন বিশাল শক্তির অধিকারী তাঁর পক্ষে কেয়ামতের দিন মানুষকে পুনর্জীবন দেয়া অথবা মানব গোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে উত্তম লোকদেরকে নিয়ে আসা আদৌ কঠিন কিছু নয়। যদি তোমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে প্রস্তুত না হও, তবে তোমাদের স্থলে অন্য মানব গোষ্ঠীকে হাযির করা আল্লাহ পাকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ۞

'আর আমি এতে আদৌ অক্ষম নই'।

অর্থাৎ যদি আমি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাই, তবে কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবেনা। কাফেরদের দৌরাত্ম বন্ধ করার নিমিত্তে যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে বিদায়

করে দিয়ে উত্তম কোন জাতি সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۞

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতে দিন। যেদিন সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যখন অবগত আছেন যে, আমি তাদেরকে যে কোন সময় ধ্বংস করতে সক্ষম, আর তাদের দৌরাত্ম ও ঔদ্ধত্বে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা, আপনি তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না; বরং তাদেরকে তাদের বাক-বিতন্ডায়, খেলা-ধূলায় মত্ত থাকতে দিন, যখন কেয়ামত আসবে তখনই তাদের গাফলতের নিদ্রা ভঙ্গ হবে, তখন তাদের পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা হবেনা।

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ۞

'সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন তারা কবর থেকে দ্রুত বেগে বের হয়ে আসবে। মনে হবে, তারা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে চলেছে'।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, যেভাবে কোন সৈন্যদল তাদের জাতীয় পতাকার দিকে দ্রুতবেগে ছুটে যায়, ঠিক এমনিভাবে তারাও ছুটে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে, তাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের পরিণতি দেখার জন্যে। আর তখন তাদের যে অবস্থা হবে তার বিবরণ রয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

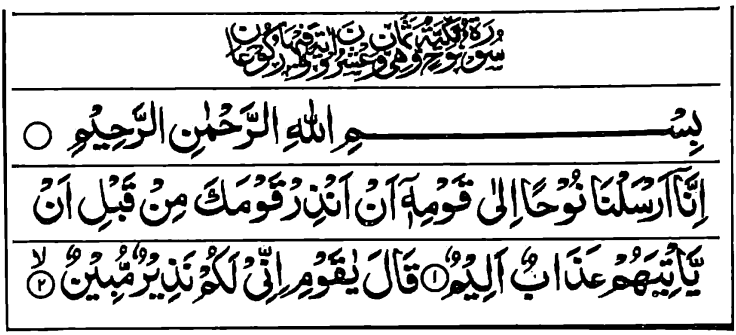
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۞

'(সেদিন) তাদের দৃষ্টি (লজ্জায় অনুতাপে) অবনমিত থাকবে। অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এটি সেদিনই, যেদিন সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল'।

অর্থাৎ এই সেই কেয়ামতের দিন, যেদিন সম্পর্কে দুনিয়াতে আসমানী গ্রন্থ সমূহের মাধ্যমে, নবী রসূলগণের প্রেরণের মাধ্যমে মানব জাতিকে সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সতর্ক হওয়ার স্থলে এদিনকে অস্বীকার করেছে। ফলে এদিনের জন্যে তারা কোন সম্বল সংগ্রহ করেনি, তাই তারা আজ নিঃস্ব-ঋতসর্বস্ব এবং তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নূহ


سورة نوح مكية وهي ثمان وعشرون آية وهي مائتان وتسعة وعشرون كلمة وألف وتسعمائة وتسعة وعشرون حرفا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ

يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ① قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) নিশ্চয় আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমার জাতিকে তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে সাবধান কর।

(২) তিনি বললেন, 'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সাবধানকারী'।

সূরা নূহ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ, এতে দু' রুকু, ২৮ আয়াত রয়েছে। এর বাক্য সংখ্যা ২২৪ এবং অক্ষর সংখ্যা ৯২৯।

এ সূরার আমল

সূরা নূহ সর্ব প্রকার প্রয়োজন পূরণে এবং দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে উপকারী হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে, সে যদিও মূর্খ সমাজে বাস করবে, অবশেষে সে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সে সাহায্য লাভ করবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় তওহীদের আহ্বান এবং শেরকের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, বিশেষতঃ হযরত নূহ (আঃ) তওহীদের প্রতি আহ্বানে যে অক্লান্ত সাধনা করেছেন, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাঁর হতভাগা জাতি তাঁর বিরোধিতা করেছে, তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর তাদের হেদায়েত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর জাতি কোন অবস্থাতেই তাঁর হেদায়েতে মেনে নিতে রাজী হয়নি। অবশেষে তিনি তাদের ব্যাপারে বদদোয়া করেছেন এবং প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত হয়ে তারা ধ্বংস হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পৌত্তলিকদেরকে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন, তখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের স্থলে তাঁর বিরোধিতা করেছে এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি জুলুম অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে। সে সময় সূরা নূহ নাযিল হয়েছে। এ সূরার মাধ্যমে মক্কাবাসীকে এবং পৃথিবীর সকল কাফের মুশরেকদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করার পরিণতি হয় অত্যন্ত ভয়াবহ, যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর বিরোধিতার কারণে তাঁর জাতির সলিল সমাধি হয়েছিল।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরাতুল মাআরিজে রয়েছেঃ

إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۞ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ

(নিশ্চয় আমি তোমাদের স্থলে উত্তম জাতি আনয়নে সক্ষম।)

এরপরই সূরা নূহে হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির কথা বর্ণিত হয়েছে, কিভাবে তাদেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছে, পৃথিবীতে তাদের কোন নিদর্শন রয়নি। এভাবে পূর্ববর্তী সূরার ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়েছে।

কেয়ামতের দিন সূরা নূহ পাঠ করা হবে

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন সূরা নূহ পাঠ করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম হযরত নূহ (আঃ) এবং

তাঁর জাতিকে হাযির করবেন (কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে সর্ব প্রথম নূহ (আঃ)-ই প্রেরিত হয়েছিলেন)। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ যখন তওহীদে বিশ্বাসের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে? তারা বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে কেউ তওহীদের আহ্বান জানায়নি, কেউ আমাদেরকে তবলীগ করেনি, আর কেউ আমাদেরকে কোন আদেশও দেয়নি এবং কোন কিছু সম্পর্কে নিষেধও করেনি। তখন নূহ (আঃ) বলবেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তাদেরকে তওহীদে বিশ্বাসের আহবান জানিয়েছি, আমার তওহীদের এ আহ্বান জানিয়েছেন সকল যুগে সকল দেশে নবী রসূলগণ এমনকি, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই একই আদেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ পাক আদেশ দেবেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে হাযির করা হোক। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নিয়ে এমনভাবে উপস্থিত হবেন যে, নূহ (আঃ) তাদের সম্মুখে থাকবেন। হযরত নূহ (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনারা কি জানেন যে, আমি আমার উম্মতকে সত্য গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছি, তাদেরকে উপদেশ দান করেছি, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি তাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়ার জন্যে, কিন্তু তারা আমার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করবেন, আমরা সাক্ষ্য দেই, আপনি যা বলেছেন, সবই সত্য। তখন নূহ (আঃ)-এর উম্মত বলবে, আপনারা হলেন সর্বশেষ উম্মত, আর আমরা হলাম সর্ব প্রথম উম্মত, আপনারা কিভাবে জানলেন যে, নূহ (আঃ) আমাদেরকে তৌহীদের আহবান জানিয়েছেন? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা নূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করবেন। এর তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা। তখন আল্লাহ পাক ঐ মুহূর্তে আদেশ দেবেন–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

'হে পাপীষ্ঠরা! আজকের দিনে তোমরা নেককার লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও'।)[১] –সূরা ইয়াসিন ঃ আয়াতঃ ৫৯

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-২৯৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৬৭
হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৪৪-৮৩

তফসীরুল কোরআন

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ

'নিশ্চয় আমি নূহকে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেছি'।

আল্লামা হযরত শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আদম (আঃ) থেকে প্রায় ষোলশ' বছর পর হযরত নূহ (আঃ)-এর জন্ম হয়। তিনি কোন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং কোন্ এলাকায় নবী হিসেবে প্রেরিত হন এর বিস্তারিত প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সে এলাকার অধিবাসীদের জন্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। তবে একথা ঐতিহাসিক সত্য, হযরত নূহ (আঃ)-ই প্রথম রসূল, যাঁকে শেরক ও মূর্তিপূজার অন্ধকার দূরীভূত করার লক্ষ্যে প্রেরণ করা হয়।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) নবী রসূলগণের মধ্যে সর্বাধিক বয়স পেয়েছিলেন। অর্থাৎ ১০৫০ বছর। তন্মধ্যে ৯৫০ বছরই তিনি তবলীগ করেছিলেন। তাঁর জাতি যখন কোন অবস্থাতেই তাঁর আহবানে সাড়া দিতে রাজি হলোনা তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে বদদোয়া করলেন। পরিণতিতে প্রলয়ংকরী বন্যার মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করা হলো। এরপরও তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

এবনে জরীর লিখেছেন, হযরত আদম (আঃ)-এর এন্তেকালের ১২৬ বছর পর হযরত নূহ (আঃ)-এর জন্ম হয়।

আল্লাম আলুসী (রঃ) আরও লিখেছেন, তিনি কুফা এলাকায় জীবন যাপন করেছেন।[২]

যাহোক, হযরত নূহ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর জাতিকে হেদায়েত করার জন্যে তথা তাদেরকে শেরক ও মূর্তি পূজার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

১। তফসীরে হক্কানী পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৭৩
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৬৮

'এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমার জাতিকে তাদের প্রতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার পূর্বে সাবধান কর'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণের কথাটি তাঁর জাতির সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, তাঁর নবুওয়্যত পৃথিবীর সব মানুষের জন্যে নয়; বরং শুধু তাঁর জাতির জন্যেই ছিল।

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে পাঁচটি এমন বৈশিষ্ট দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি (১) আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এভাবে, এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত দুশমনের অন্তরে আমার ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) সমগ্র যমীনকে আমার জন্যে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ যমীনের যে কোন অংশে দাঁড়িয়ে আমার উম্মত নামাজ পড়তে পারে এবং মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। যেখানেই নামাজের সময় হোক আমার উম্মত সেখানে নামাজ আদায় করতে পারে। (৩) আমার জন্যে গনিমতের মাল (যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ) হালাল করা হয়েছে, ইতোপূর্বে আর কারো জন্যে হালাল করা হয়নি। (৪) আমাকে শাফায়াত করার হক্ব প্রদান করা হয়েছে। (৫) পূর্ববর্তী কালের নবীগণ বিশেষতঃ তাঁদের নিজ নিজ জাতির জন্যে প্রেরিত হতেন, কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

(বোখারী ও মুসলিম)

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞

'তিনি বললেন, হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সাবধানকারী'।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বললেন, আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের উপকারার্থে স্পষ্ট সতর্ককারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। যদি তোমরা আমার হেদায়েত না মান তবে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য মনে করবে। তোমরা যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্য থাক, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য হবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা প্রলয়ংকরী বন্যাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা অবশেষে তাঁর জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্টা-৯৯

আল্লাহ পাক যখন হযরত নূহ (আঃ)-কে আদেশ দিলেন যে, তুমি তোমার জাতিকে ভয় প্রদর্শন কর। এ আদেশ পালনার্থেই তিনি বললেনঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী'।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ
ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ
اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ
دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا
فِرَارًا ۝٦ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ
فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا
اسْتِكْبَارًا ۝٧

তরজমা

(৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর ও তাঁকেই ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।

(৪) (যদি তোমরা তা কর) তবে আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয়না, যদি তোমরা বুঝতে পার।

(৫) নূহ বলেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে রাত দিন (সত্য গ্রহণে) আহ্বান করেছি।

(৬) কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে।

(৭) আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি তোমার ক্ষমা লাভের জন্যে, তখন তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করেছে এবং জেদ করতে থাকে, আর তারা অত্যন্ত বেশী দম্ভ ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করে।

তফসীরুল কোরআন

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ

অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে এই উপদেশ দেন, তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, তাঁকেই ভয় কর। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে এবাদতে শরীক করোনা, শেরক সর্ব নিকৃষ্ট কাজ। অতএব, এমন ঘৃণ্য ও মন্দ কাজ পরিহার কর। জীবনের সকল অবস্থায় যাবতীয় কর্মকান্ডে আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। আর আমার কথা মেনে চল, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে আমি যে আদেশ দেই তা পালন কর।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে তিনটি আদেশ দিয়েছেন (১) আল্লাহ পাকের এবাদত কর, এতে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (২) আল্লাহকে ভয় কর, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাক। (৩) আর আল্লাহর নবীর অনুসরণ কর।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

এই তিনটি কাজ যদি তোমরা কর, তাহলে এর শুভ-পরিণতি স্বরূপ ঈমান আনয়নের পূর্বে কৃত গুনাহ সমূহ তিনি ক্ষমা করবেন।

মাগফেরাত লাভের পূর্বশর্ত

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য তোমাদের মাগফেরাত লাভের কারণ হবে। এ পর্যায়ে হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার দস্তে মোবারক বাড়িয়ে দিন, আমি বয়আত করতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি এরশাদ করলেন, আমর কি হল? আমি আরজ করলাম, আমি বয়আতের পূর্বে কিছু শর্ত পেশ করতে চাই। তিনি এরশাদ করলেন, কি শর্ত বল। আমি আরজ করলাম, আমার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়। তিনি এরশাদ করলেন, আমর তুমি জান না ইসলাম গ্রহণ করা হলে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, হিজরতের কারণেও পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আর হজ্জ পূর্বের গুনাহ দূরীভূত হওয়ার কারণ হয়। (মুসলিম শরীফ)

হযরত মাআজ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পশ্চাতে উষ্ট্রের উপর আরোহন করেছিলাম, আমি তাঁর অতি

নিকটে ছিলাম। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে মাআজ! তুমি কি জান, বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের কি হক্ব রয়েছে, আর আল্লাহ পাকের প্রতি বন্দাদের কি হক্ব রয়েছে? আমি আরজ করলাম, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই তা জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, বন্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের হক্ব হলো এই, বন্দা শুধু আল্লাহ পাকের এবাদত করবে, আর কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর আল্লাহ পাকের প্রতি বন্দার হক্ব হলো এই, যে মুশরেক নয়, তাকে তিনি আযাব দেবেন না। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি কি মানুষকে এ সুসংবাদ দেব না? তিনি এরশাদ করলেন, মানুষকে এ সুসংবাদ দিওনা, কেননা তাহলে মানুষ এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে (নেক আমলের সাধনায় রত হবেনা)। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মাআজ (রাঃ) সত্য গোপন করার গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। (বোখারী ও মুসলিম)

مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ

'আল্লাহ পাক তোমাদের কিছু গুনাহ মাফ করে দেবেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের হক্ব সম্পর্কে যে সব গুনাহ হয়ে থাকে, সেগুলো তিনি মাফ করবেন, কিন্তু বন্দার কোন হক তিনি মাফ করবেন না।

وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

'এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন'।

আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের কারণে প্রথমতঃ আখেরাতের উপকারের কথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তোমাদের পাপাচার ক্ষমা করবেন। আর এ আয়াতাংশে দুনিয়ার উপকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকটি মানুষের অবস্থানের জন্যে যে সময় নির্ধারিত রয়েছে সে সময় পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে (১) মানুষের জন্যে যে আযাব নির্ধারিত থাকে, তা সে পর্যন্ত আসবেনা যে পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া হবে। (২) প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্যে আল্লাহ পাক যে সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, তার পূর্বে মৃত্যু আসবেনা, আর যখন নির্ধারিত সময় আসবে, তখন তা বিলম্বিতও হবেনা।

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে থাক, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির বংশ রক্ষা পাবে। পক্ষান্তরে, যদি মানুষ আল্লাহ পাকের বন্দেগী পরিত্যাগ করে, এমনকি এক ব্যক্তিও আল্লাহ বলার মত না থাকে তবে মহাপ্রলয় তথা কেয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। আর এমন অবস্থায় কেউ রক্ষা পাবেনা।

হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় যে প্রলয়ংকরী বন্যা এসেছিল, তাতে কারোই বাঁচার সম্ভাবনা ছিলনা। কিন্তু যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর কথা মোতাবেক ঈমান এনেছিল এবং তাঁর তরীতে আরোহন করেছিল, তাদের মাধ্যমেই এ পৃথিবীতে মানব বংশ রক্ষা পায়।

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাকের নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয়না'।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে মৃত্যুর যে সময় নির্ধারিত রয়েছে, তা কখনও বিলম্বিত হয়না। তাই আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত থাকা কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য।

لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۞

যদি তোমরা এ সত্য বুঝতে, তাহলে তোমরা আমার প্রতি অনুগত থাকতে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ) ৪০ বছর বয়সে পয়গম্বর হয়েছেন, তুফানের পর তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ) যখন নবী হয়েছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১০০ বছর।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর।

কারো কারো মতে, হযরত নূহ (আঃ)-এর বয়স ১৪৫০ বছর হয়েছিল। আর একথা সুনিশ্চিত যে, তিনি ৯৫০ বছর যাবত তবলীগ করেছেন।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে এত প্রহার করতো যে তাদের ধারণা হতো তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। একথা মনে করে তারা তাঁকে তাঁর বাড়ীর সম্মুখে ফেলে যেত, এরপর আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থ করে দিতেন।

এমনকি মোহাম্মদ এবনে এসহাক লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতি এত দৈহিক নির্যাতন করতো যে, তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতেন, যখন চেতনা ফিরে পেতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে মাফ করে দাও, তারা জানেনা। এরপরও যখন তারা তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করতে লাগলো, তখন তিনি পরবর্তী বংশের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এ জাতির দুর্ভাগ্য ছিল এই, যে প্রজন্মই আসতো, তারা পূর্ববর্তী লোকদের অনুসরণ করে নাফরমানীতে লিপ্ত হতো এবং হযরত নূহ (আঃ)-কে পাগল বলতো।[১]

অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলেন যে, আমার জাতিকে আমি দিন রাত তথা সর্বদা তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছি, সত্য গ্রহণের এবং মিথ্যা বর্জনের, অন্যায় অনাচার, দম্ভ-অহমিকা-অহংকার পরিহার করার জন্যে আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বানে সাড়া দেয়ার স্থলে তাদের নাফরমানী এবং ঔদ্ধত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার আহ্বানই যেন তাদের নাফরমানীর মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ اِلَّا فِرَارًا ۞

'কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে'।

যেহেতু হযরত নূহ (আঃ)-এর সত্য গ্রহণের আহ্বানের কারণেই তাদের কুফরী ও নাফরমানী বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই তাঁর আহ্বানকে তাদের পলায়ন প্রবণতা বৃদ্ধি কারক বলা হয়েছে। আর তাদেরকে আল্লাহ পাক যেন হেদায়েত করেন, তারা যেন আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে মাগফেরাত লাভ করতে পারে এজন্যে আমি তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান করেছি, কিন্তু তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىٓ اٰذَانِهِمْ

আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি তোমার ক্ষমা লাভের জন্যে তখন তারা তাদের কানে আঙ্গুল দিয়েছে, এভাবে তারা সত্য কথা শ্রবণ থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে, শুধু তাই নয়; তারা নিজেকে বস্ত্রাবৃত করে রেখেছে, যাতে করে তারা চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখতে না পারে এবং কুফরী, নাফরমানী এবং পাপাচারের

১. তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-৯৯

প্রতি অবিচল থাকে। আর অতিশয় দম্ভ প্রকাশ করতে থাকে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞

'তারা নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে রাখে এবং অন্যায়-অনাচারে অবিচল থাকার জেদ করতে থাকে আর অত্যন্ত বেশী দম্ভ ও ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করে'।

এ ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির অবনতি, যার শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ
لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

তরজমা

(৮) এরপর আমি তাদেরকে (তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে) প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি।

(৯) আবার আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে এবং গোপনে বুঝিয়েছি।

(১০) আর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি অতিশয় ক্ষমা-প্রিয়।

(১১) (যদি তোমরা ক্ষমাপ্রার্থী হও) তবে তিনি তোমাদের জন্যে বারি বর্ষণ করবেন।

(১২) আর তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা এবং তোমাদের জন্যে উদ্যান সমূহ তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করবেন ঝর্ণামালা।

(১৩) তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাওনা?

(১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে;

(১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না? আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাতটি আসমানকে স্তরে স্তরে।

(১৬) আর তিনি সেখানে চাঁদকে নূর এবং সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপ করে রেখেছেন।

(১৭) আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন।

(১৮) এরপর তিনি তোমাদেরকে যমীনেই ফিরিয়ে আনবেন এবং পুনরায় তিনি (যমীন থেকে) বের করে আনবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির অন্যায়-অনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফরিয়াদ করেছেন, হে আল্লাহ! আমি আমার জাতিকে দিনে রাতে, গোপনে প্রকাশ্যে সত্য গ্রহণের জন্যে আহ্বান করেছি, কিন্তু তারা আমার কথা শ্রবণ না করার জন্যে কানে আঙ্গুল দিয়েছে, এমনকি আমি যেন তাদেরকে দেখতে না পাই এবং তারাও যেন আমাকে দেখতে না পায়, এ উদ্দেশ্যে তারা কাপড় দিয়ে চেহারা আড়াল করে রাখে। তাদের কুফরী, নাফরমানী, ধৃষ্টতা, হঠকারিতার কোন সীমা নেই। তারা শুধু যে আমার আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই নয়; বরং তারা চরম অহংকার করে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞

'এরপর আমি তাদেরকে (তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে) প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি'।

মজলিসে উচ্চস্বরে তাদেরকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করেছি। শুধু তাই নয়; বরং ব্যক্তিগতভাবে চুপিসারে অনেক সময় তাদেরকে বুঝিয়েছি যে, মন্দ পথ পরিহার কর, সত্য পথ গ্রহণ কর। তাদেরকে হেদায়েত করার ব্যাপারে আমি কোন প্রকার ত্রুটি করিনি। গোপনে-প্রকাশ্যে-উচ্চস্বরে-চুপিসারে এক কথায় সর্বতোভাবে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞

'আর আমি বলেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর, যদি তোমরা সমস্ত গুণাহ থেকে তওবা কর, কৃত পাপাচারের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। তিনি তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে আসমান থেকে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত করবেন'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি যখন বহুদিন যাবত হযরত নূহ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করতে থাকে, আল্লাহ পাকের নাফরমানী থেকে বিরত হতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিলেন। চল্লিশ বছর যাবত তাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণও বন্ধ রইলো, তাদের অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল, এমনকি চতুঃস্পদ জন্তুগুলোও শেষ হয়ে গেল। তখন তাদেরকে হযরত নূহ (আঃ) উপদেশ দিলেন–

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, তওবা এস্তেগফার কর, তাহলে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, তোমাদের জন্যে বৃষ্টিপাত করবেন, তোমাদের অভাব দূর করে দেবেন। তোমরা যদি আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা বন্ধ কর, তাঁর প্রতি ঈমান আন, পূর্বকৃত অন্যায়-অনাচারের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন এবং তোমাদের দুর্গতি দূরীভূত করবেন।[১]

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ

'যদি নগরবাসী ঈমান আনতো এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতো, তবে আমি তাদের জন্যে বরকতের পথ উন্মুক্ত করে দিতাম'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১০৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৭২

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার বৃষ্টিপাতের জন্যে এস্তেস্কার নামাজের উদ্দেশ্যে বের হলেন। ময়দানে এসে তিনি শুধু তওবা এস্তেগফার করলেন, এস্তেস্কার নামাজ আদায় করলেন না। লোকেরা প্রশ্ন করলো, আপনি এস্তেস্কার নামাজ আদায় করলেন না, শুধু এস্তেগফার করলেন কেন? তখন তিনি আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ পাক এস্তেগফার করার আদেশ দিয়েছেন এবং এর বরকতে বারি বর্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি তাই করেছি, যা আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি বড় অভাবগ্রস্ত, তিনি তাকে বললেন, আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার কর। অন্য এক ব্যক্তি এসে বললো, আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। তিনি বললেন, তওবা এস্তেগফার কর। অপর এক ব্যক্তি বললো, আমার শষ্য ক্ষেত্র শুকিয়ে গেছে, কোন কিছুই উৎপন্ন হয়না। তিনি তাকে বললেন, তওবা এস্তেগফার কর। আরেক ব্যক্তি এসে বললো, আমার কূপের পানি শুকিয়ে গেছে, তাতে এতটুকু পানি নেই, পানির অভাবে আমি বড় কষ্টে আছি। তিনি বললেন, আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার কর। উপস্থিত লোকদের মধ্যে সকলেই তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলেন যে, যার যে কষ্টই হোক না কেন তিনি একই কথা বললেন, এর কারণ কি? তখন হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন, দেখ আমি নিজের থেকে কিছুই বলিনি, আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে যা এরশাদ করেছেন, তাই আমি বলেছি। তখন তিনি এ আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করলেন, তোমরা লক্ষ্য কর, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ করবেন অর্থ-সম্পদ দ্বারা, সন্তান-সন্ততি দ্বারা, তবে এর জন্যে পূর্বশর্ত হলো কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করা। তওবা এস্তেগফারের বরকতেই আল্লাহ পাক সকল অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করে দেবেন, এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে আলোচ্য আয়াতে।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যে সব গুনাহে সাধারণভাবে অনেক লোক লিপ্ত হ, সে সব গুনাহর জন্যে প্রকাশ্যে তওবা করা একান্ত জরুরী, যেমন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার মত বিপদ আসে তখন, যখন সমাজ ও জাতি সাধারণভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৩৭
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৭২

এজন্যে সবার একত্রিত হয়ে এস্তেগফার করা এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া করা একান্ত কর্তব্য, যেমন হযরত ওমর (রাঃ) করেছিলেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۞

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার কর, তবে তিনি তোমাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিও বাড়িয়ে দেবেন। এমনিভাবে হযরত নূহ (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করার পূর্বে যেমন তোমাদের বাগ-বাগিচা ছিল, তোমাদের নদী-নালা ঝর্ণামালা ছিল, সবই আল্লাহ পাক ফেরত দেবেন।

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۞

'তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাওনা'।

আলোচ্য আয়াতের ترجون শব্দটি رجاء শব্দ থেকে নিস্পন্ন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)-এর মতে, এক্ষেত্রে رجاء শব্দটির অর্থ হলো বিশ্বাস করা, অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা কেন বিশ্বাস কর না?

তফসীরকারগণ বলেছেন, বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করার জন্যেই رجاء শব্দটির এ অর্থ করা হয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা নেই।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, এক্ষেত্রে رجاء শব্দটি ভয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তোমরা কি আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে তাঁকে ভয় কর না? তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি মহা পরাক্রমশালী, অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য হলো তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা কি মহান আল্লাহ পাকের হক্ব সম্পর্কে অবগত নও? তোমরা তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর শোকর গুজার হওনা?

এবনে কিসান (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা তোমাদের এবাদতের ব্যাপারে এ আশা করোনা যে, আমরা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের প্রতি বিশ্বাস করি, আর এজন্যে তিনি আমাদেরকে সওয়াব দান করবেন।

অথবা এর অর্থ হলো তোমাদের এবাদত বন্দেগীতে কি তোমাদের এ আশা নেই যে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের এবাদত বন্দেগীর শুভ পরিণতি দান করবেন।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۞

'আর তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে'।

মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান অনন্ত-অসীম। মানুষের অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাকই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন, আল্লাহ পাক তাকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। শুক্র বিন্দু থেকে তাকে রক্তমাংসে পরিণতি করেছেন, তাকে অস্থি চর্ম দান করেছেন, তাকে মানবরূপে গড়ে তুলেছেন, তাকে দান করেছেন বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, আরও অগণিত নেয়ামত। অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বদা শোকর গুজার থাকা এবং তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যে ভুল-ত্রুটি হয়, তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۞ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞

'তোমরা কি লক্ষ্য করনা? আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাতটি আসমানকে স্তরে স্তরে। আর তিনি সেখানে চাঁদকে নূর এবং সূর্যকে জ্বলন্ত প্রদীপ করে রেখেছেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে তার সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, তোমরা কি এই সপ্ত আসমানের প্রতি লক্ষ্য কর না? কিভাবে আল্লাহ পাক স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে সপ্ত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন, আর সেই আসমানে সারা পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্যে চন্দ্র সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। চন্দ্র সূর্য দ্বারা আল্লাহ পাক সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে রেখেছেন। এসবই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের দান, এই দান সমূহের শোকর আদায় করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। এরপর পুনরায় মানুষের সৃষ্টি, পৃথিবীতে তার আগমন এবং পৃথিবী থেকে তার বিদায় গ্রহণ এবং কেয়ামতের দিন তার পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۞

'আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে যমীনেই ফিরিয়ে আনবেন এবং পুনরায় তিনি তোমাদেরকে (যমীন থেকে) বের করে আনবেন'।

আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছেন, মাটি থেকে উৎপাদিত আহার্য থেকে শুক্র হয়, আর শুক্র থেকে আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেন, পরোক্ষভাবে যেন তিনি মানুষকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেন।

ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ

অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মাটিতেই ফিরিয়ে আনবেন, কিন্তু তোমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাবেনা, হারিয়ে যাবেনা চিরতরে; বরং তোমাদের পুনরুত্থান হবে হাশরের ময়দানে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

অর্থাৎ এরপর তোমাদেরকে মাটি থেকে বের করে আনবেন, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করবেন, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۞ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

'নিশ্চয়ই তাদেরকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা আমার কাজ'।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

'এই মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আর এই মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে আনবো, আর এই মাটি থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনবো'।

কোরআনে করীমের বহু আয়াতে এমনি সতর্কবাণী ঘোষিত হয়েছে, যেন আত্মবিস্মৃত মানব জাতি সজাগ, সতর্ক ও সাবধান হয় এবং পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا
فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ
يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَ
قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّ
لَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا
تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿٢٤﴾ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا
نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿٢٥﴾ وَ
قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾
اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ
مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ
اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

তরজমা

(১৯) আর আল্লাহ পাক যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানা করে দিয়েছেন।

(২০) যেন তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা কর।

(২১) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকের অনুসরণ করেছে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

(২২) আর তারা বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছে।

(২৩) আর তারা একথাও বলেছে, তোমরা কখনও তোমাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করোনা এবং ওয়াদ, সুওয়া'আ, য়াগুছ, য়াউক ও নাস্‌রকে।

(২৪) আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব সীমা লংঘনকারীদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা।

(২৫) তাদের পাপাচারের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। আর এজন্যেই তারা পরে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা আর কোন সাহায্যকারীও পায়নি।

(২৬) আর নূহ আরো বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা।

(২৭) যদি তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দাও, তবে তারা তোমার বন্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে আর তাদের গৃহে শুধু দুস্কৃতকারী ও কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হবে।

(২৮) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতাকেও। আর যারা ঈমানদার অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকেও এবং মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে। আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মহাশূণ্যে মানব জাতির উপকারার্থে আল্লাহ পাক যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে চন্দ্র-সূর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর মানুষের সৃষ্টির কথা এবং পৃথিবী থেকে তাদের বিদায় গ্রহণের কথা, এরপর কেয়ামতের দিন পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর এ আয়াত থেকে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞

'আর আল্লাহ পাক যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানা রূপে তৈরী করেছেন, যেন তোমরা তার প্রশস্ত পথে চলাফেরা করতে পার'।

আল্লাহ পাক শুধু যে আসমানের চন্দ্র-সূর্য দ্বারা পৃথিবীকে আলোকিত করে তোমাদেরকে উপকৃত করেছেন তাই নয়; বরং এ বিশাল বিস্তৃত যমীনকে তোমাদের জন্যে বিছানা রূপে তৈরী করে রেখেছেন, যেন তোমরা এর পথ সমূহে চলাফেরা করতে পার। বস্তুতঃ মানুষ যেন পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, আল্লাহ পাকই তার ব্যবস্থা করেছেন।

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۞

'নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে অমান্য করেছে এবং এমন লোকের অনুসরণ করেছে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি'।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতি সম্পর্কে এ অভিযোগ করেছেন যে, তারা আমার আদেশ অমান্য করেছে, তওহীদে বিশ্বাস করেনি, আর তাদের এমন সর্দারদের অনুসরণ করেছে যারা তাদের অর্থ-সম্পদের কারণে এবং অধিক সংখ্যক সন্তান-সন্ততির জন্যে অহংকার করতো। এজন্যে আখেরাতে তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি পাবে। আর তারা হযরত নূহ (আঃ)-এর বিপক্ষে চক্রান্ত করে বেড়াত, তাঁর প্রতি নির্যাতন করার জন্যে তাদের অনুসারীদের প্ররোচনা দিত। এদিকে অনুসারীদের অবস্থা এই ছিল যে, তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে যার-পর-নাই কষ্ট দিত, সর্বদা হযরত নূহ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো।

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۞

'আর তারা একথাও বলেছে, তোমরা কখনও তোমাদের দেব-দেবীদেরকে পরিত্যাগ করোনা এবং ওয়াদ, সুওয়া'আ, য়াগুছ, য়াউক ও নাস্‌রকে'।

মূর্তি পূজার উৎপত্তি

আল্লামা বগভী (রঃ) মোহাম্মদ এবনে কা'বের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এ চারটি নাম সে সব লোকের ছিল, যারা হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে জীবিত ছিল। যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন তাদের অনুসারীরা সেভাবেই এবাদত করতো যেভাবে ইতোপূর্বে তাদের পূর্বসূরীরা এবাদত করতো। কিন্তু ইবলীস শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করলো এভাবে যে, তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিল, তাদের মূর্তি বানিয়ে নেয়া হোক। ঐ মূর্তিগুলো সামনে থাকলে এবাদতে মনোনিবেশ করা সহজ হবে এবং উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। শয়তানের কুপরামর্শে ঐ চার ব্যক্তির মূর্তি তৈরী করা হয়। যখন ঐ বংশ শেষ হয়ে গেল, নতুন প্রজন্ম উপস্থিত হলো, তখন শয়তান তাদেরকে বললো, তোমাদের পূর্বপুরুষরা এ মূর্তিরই পূজা করতো, তোমরাও তাই কর। এভাবে মূর্তি পূজা শুরু হলো এবং তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের নামেই মূর্তির নামকরণ করলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির নেককার লোকদের এই নাম ছিল, যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন ইবলীস শয়তান তাদেরকে বললো, যেখানে তারা বসতো সেখানে মূর্তি দাঁড় করিয়ে দাও, আর ঐ লোকগুলোর নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ কর। লোকেরা তাই করলো, কিন্তু তারা মূর্তি পূজা করেনি। যখন এ প্রজন্ম শেষ হয়ে নতুন প্রজন্ম আসলো তখন তারা ঐ মূর্তিগুলোকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একথাও বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে যে প্রলয়ংকরী বন্যা এসেছিল, ঐ মূর্তিগুলো তাতে নিমজ্জিত হয়েছিল এবং মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সেগুলো মাটির নিচেই ছিল। বহু দিন পর শয়তান মক্কার মৃশরেকদের জন্যে মাটির নিচ থেকে মূর্তিগুলো বের করে আনে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন, যে মূর্তিগুলো হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির উপাস্য ছিল, সেগুলো অবশেষে আরবে চলে এল। দাওমাতুল জন্দল নামক স্থানে বনী কেলাব গোত্রের লোকেরা ওয়াদ মূর্তির পূজা করতো। বনী হোজায়েল গোত্রের মূর্তি ছিল সুওয়া'আ। য়াগুছ নামক মূর্তিটি প্রথমে বনী মোররা গোত্রের মূর্তি ছিল, এরপর তা বনী আতীফ গোত্রেরও উপাস্য হয়, আর ইয়ামনের সাবা নামক স্থানে তা পৌঁছে গেল। বনী হামদান গোত্রের মূর্তি ছিল য়াউক নামক মূর্তি। নাসর নামক মূর্তিটি ছিল হোমায়ের গোত্রের জিল্‌কালা বংশের।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۞

'আর তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব সীমা লংঘনকারীদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনা'।

অর্থাৎ ঐ মূর্তিগুলো অথবা নূহ (আঃ)-এর জাতির সর্দাররা অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। যদিও পথভ্রষ্ট করার কাজ মূলতঃ মূর্তিগুলোর নয়; বরং শয়তানের। কিন্তু মূর্তিগুলোর মাধ্যমেই পথভ্রষ্ট করা হয়েছে। তাই এ বর্ণনা ভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। আর এ পথভ্রষ্ট লোকদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে।

مِمَّا خَطِيْٓـَٔاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا

'তাদের পাপাচারের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, আর এজন্যেই তারা পরে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে'।

হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি অনবরত মন্দ কাজে লিপ্ত থাকার কারণে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাদের পথভ্রষ্টতা, দৌরাত্ম, ঔদ্ধত্ব সকল সীমা লংঘন করে। হযরত নূহ (আঃ)-এর সাড়ে নয়শত বছরের ওয়াজ-নসিহত সত্ত্বেও তারা সঠিক পথে আসেনি এবং সঠিক পথে আসার কোন লক্ষণও তাদের মধ্যে ছিলনা। তাদের অন্যায়-অনাচারের ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ তাদেরকে প্রলয়ংকরী বন্যায় নিমজ্জিত করা হলো এবং মধ্যলোকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হল।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করা হয় এবং তাদেরকে মধ্যলোকে কবরের আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কবরের আযাব সত্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন বন্দাকে যখন কবরে রেখে তার সাথীরা বাড়ী ফিরে (তাকে সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জীবন দান করা হয়) এবং সেই মৃত ব্যক্তি তার সাথীদের চলার শব্দ শ্রবণ করে। তখন দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেয়। তন্মধ্যে একজন ফেরেশতা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলবে? ঐ মৃত ব্যক্তি যদি মোমেন হয় তবে সে জবাবে একথা বলবে, আমি সাক্ষ্য দিতাম, তিনি আল্লাহ পাকের বন্দা ও তাঁর রসূল। তখন ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয়, তুমি তোমার দোযখের ঠিকানা দেখে নাও, আল্লাহ পাক তোমাকে এর বদলে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। বন্দা উভয় স্থান দেখে।

পক্ষান্তরে যদি ঐ মৃত ব্যক্তি মুনাফেক বা কাফের হয়, তবে তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করা হয়। সে জবাবে বলে, আমি কিছু জানিনা, লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। এ জবাবের পর তাকে বলা হয়, তুমি কিছুই জানতে না? তুমি কিছুই পাঠ করনি? এরপর তাকে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করা হয়। জ্বিন ও মানব জাতি ব্যতীত অন্যান্য সকল জন্তু তার চিৎকার শ্রবণ করে থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি দেখিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও কোন নামাজ আদায় করেছেন এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাননি। (বোখারী মুসলিম)

হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দন্ডায়মান হতেন তখন এত ক্রন্দণ করতেন, যে তার দাঁড়ী পর্যন্ত সিক্ত হত, কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত আপনি জান্নাত ও দোযখের আলোচনা হলে এত ক্রন্দণ করেন না, অথচ কবর দেখলে এত বেশি ক্রন্দণ করে থাকেন। তখন তিনি বললেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবর হলো আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল, যদি এ মঞ্জিলে নাজাত পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো সহজ হবে। কিন্তু যদি কবরের আযাব থেকে নাজাত না পাওয়া যায় তবে পরবর্তী মঞ্জিলগুলো কঠিনতর হবে। (তিরমিজী ও এবনে মাজা)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবরের মধ্যে কাফেরকে দংশন করার জন্যে ৯৯টি সাপ নিযুক্ত করা হয়, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। যদি ঐ সাপগুলোর মধ্যে কোন একটি সাপ যমীনের উপর নিঃশ্বাস ফেলে, তবে যমীনের উপর আর কোন দিন উদ্ভিদ উৎপন্ন হবেনা। (দারেমী, তিরমিজী)

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে ৯৯টির স্থলে ৭০টির উল্লেখ রয়েছে।

فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۞

'আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা আর কোন সাহায্যকারী পায়নি'।

এতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত যে সব বানোয়াট উপাস্যের তারা পূজা করতো সে সব দেব-দেবীরা তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারেনি, আর তারা এ মহাবিপদের সময় পরস্পর পরস্পরকেও সাহায্য করতে পারেনি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞

'আর নূহ আরো বলেছিলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। যদি তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দাও, তবে তারা তোমার বন্দাগণকে বিভ্রান্ত করবে। আর তাদের গৃহে শুধু দুস্কৃতকারী ও কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হবে'।

অবশেষে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে এ বদদোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! এ দূরাত্মা কাফেরদেরকে আর জীবিত রেখনা, তারা নিজেরাতো ধ্বংস হয়েছেই, যদি তারা দুনিয়াতে থাকে, ধ্বংস না হয় তবে তোমার অন্য বন্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।

বদদোয়ার কারণ

এখানে বদদোয়া করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ দূরাত্মারা জীবিত থাকলে তোমার অন্য বন্দাদেরকে তারা বিপথগামী করে তুলবে। তাদের সঠিক পথে আসার আর কোনই সম্ভাবনা নেই। বিশ্ব মানবের কল্যাণের খাতিরেই তাদের ধ্বংস করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহ পাক হযরত নূহ্ (আঃ)-কে এ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই লোকেরা ঈমান আনবেনা এবং তাদের বংশধররাও ঈমান আনবেনা। এরপরই হযরত নূহ (আঃ) বদদোয়া করেন এবং এরপর তাদেরকে ধ্বংস করা হয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির প্রতি যে প্রলয়ংকরী বন্যা এসেছিল তা সারা পৃথিবীতে আসেনি; বরং হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি যেখানে বাস করতো সেখানেই এসেছিল।

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۞

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতাকেও। আর যারা ঈমানদার অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকেও এবং মোমেন পুরুষ ও নারীদেরকে। আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর"।

হযরত নূহ (আঃ) বিশিষ্ট নবী রসূল হওয়া সত্বেও এবং মা'সুম বা নিঃস্পাপ থাকা সত্বেও আল্লাহ্ পাকের দরবারে নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। এতে শিক্ষা রয়েছে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে যে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো বিনীত হয়ে দরবারে এলাহীতে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। হযরত নূহ (আঃ)-এর পিতা-মাতা মুসলমান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল লামাক এবনে মোতা ওয়াশ্‌শাল্‌ক। আর মায়ের নাম ছিল সামজার বিনতে আতুষ। এতেও শিক্ষা রয়েছে সবার জন্যে যে, প্রত্যেকের কর্তব্য হল তার পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করা।

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا

'আর যে আমার গৃহে মোমেন অবস্থায় প্রবেশ করে'।

এই بيت শব্দ দ্বারা তার বাসস্থান উদ্দেশ্য হতে পারে। আর বন্যার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার্থে তিনি যে তরীতে আরোহন করেছিলেন, তাও উদ্দেশ্য হতে পারে। তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, بيت শব্দ দ্বারা আল্লাহর ঘর বা মসজিদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর وللمؤمنين والمؤمنت বলে কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মোমেন পুরুষ ও নারী আসবে সকার উদ্দেশ্যেই তিনি একথা বলেছেন।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا

আলোচ্য আয়াতে "জালেম" শব্দ দ্বারা সকল কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! সমস্ত কাফেরকে ধ্বংস কর।

হযরত নূহ (আঃ)-এর এ দোয়া কবুল হয়েছে। সকল কাফেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। এমনকি তাঁর যে পুত্র তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল,

সে-ও সেদিন রক্ষা পায়নি। তাকে বলা হয়েছিল তরীতে আরোহন করতে কিন্তু সে বলেছিল আমি পাহাড়ে আরোহন করবো, তাহলে বন্যার পানি থেকে রক্ষা পাব। কিন্তু মূলতঃ তা বন্যার পানি ছিলনা, ছিল আল্লাহর গজব, ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর বদদোয়া, তাই ঐ গজব থেকে রক্ষা পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত নূহ (আঃ)-এর তুফানের সময় যদি আল্লাহ পাক কারো প্রতি রহম করতেন তবে তার যোগ্য ছিল সেই স্ত্রীলোকটি যে বন্যার পানি দেখে তার সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহন করে, যখন পানি সেখানেও পৌঁছে সে তখন তার সন্তানকে কাঁধের উপর বসিয়ে নেয়। যখন পানি সেখান পর্যন্ত পৌঁছে তখন সে তার সন্তানকে তার মাথার উপর বসিয়ে নেয়, যখন পানি সেখানেও পৌঁছে তখন সে তার সন্তানকে হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে ধরে। কিন্তু পানি সেখানেও পৌঁছে যায়। ফলে মা ও ছেলে উভয়েই নিমজ্জিত হয়। যদি সেদিন কোন কাফেরের প্রতি দয়া করা হতো তবে এ স্ত্রীলোকটির প্রতিই দয়া করা হতো। কিন্তু আল্লাহর গজব থেকে সেদিন কেউ রক্ষা পায়নি।

হযরত নূহ (আঃ) একদিকে কাফেরদের ব্যাপারে বদদোয়া করেছেন, কেননা তিনি সাড়ে নয়শত বছর ধরে তাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি। এর পাশাপাশি তিনি নিজের জন্যে, তাঁর পিতা-মাতার জন্যে এবং সকল মোমেনের জন্যে দোয়া করেছেন।

মসনদে আহমদে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা শুধু মোমেনদের সাথেই ওঠা-বসা কর, মোমেনদের সঙ্গেই চলাফেরা কর, আর শুধু পরহেযগার লোকেরাই যেন তোমার খাদ্য আহার করে। (তিরমিজী, আবুদাউদ)

যেভাবে হযরত নূহ (আঃ) দোয়া করেছিলেন, আসুন আমরাও দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করে দিও, আমাদের পিতা-মাতাকেও মাফ করো, তফসীরে নূরুল কোরআনের সকল খাদেম ও সাহায্যকারী এবং সকল পাঠক-পাঠিকাকেও মাফ করে দিও, হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআনকে পূর্ণ করার তৌফিক দাও, এ মহান গ্রন্থকে কবুলিয়ত দান কর, আমাদের মেহনতকে কবুল কর এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টি দান কর। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় আমাদের মোনাজাত কবুল কর। আমীন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা জ্বিন

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَمَانٍ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّاِحْدَى عَشْرَةَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ①

তরজমা

(১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, নিশ্চয় জ্বিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে, এরপর তারা বলেছে, নিশ্চয় আমরা শ্রবণ করেছি এক বিস্ময়কর কোরআন।

সূরা জ্বিন প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে দু' রুকু ও ২৮খানি আয়াত রয়েছে। এর বাক্য সংখ্যা ২৮৫ এবং অক্ষর সংখ্যা ৮৭০।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

সূরা নূহে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল। আর এ সূরায় জ্বিনদের ঈমান আনয়নের কথা রয়েছে যে, তারা কোরআনে করীম শ্রবণ করে তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর মানুষ বিশেষতঃ মক্কার কাফেররা কোরআনে করীমের প্রতি ঈমান আনেনি।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, আমি অনেক দিন যাবত দু' সূরার সম্পর্কের বিষয়টি চিন্তা করেছি, অবশেষে আমার কাছে যা প্রকাশ পেয়েছে তা হলো সূরা নূহে রয়েছেঃ

اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমা প্রিয়। যদি তোমরা তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, তবে তিনি আসমান থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন'। (সূরা নূহঃ আয়াতঃ ১১)

আর এ সূরাতে রয়েছেঃ

وَّاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا

'যদি এ কাফেররা সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম'।[১] (সূরায়ে জ্বিনঃ আয়াতঃ ১৬)

এ সূরার আমল

যদি কারো উপর জ্বিনের আছর হয় তবে এ সূরা পাঠ করে ফুঁক দেয়া হলে, অথবা লিপিবদ্ধ করে ঐ ব্যক্তির বাহুতে বেঁধে দিলে, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা জ্বিনের আছর দূরীভূত হয়।

যদি কোন বন্দী ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে, তবে অতি সত্ত্বর মুক্তি পাবে।

যদি কোন বাড়ীতে জ্বিনের উপস্থিতি রয়েছে বলে ধারণা হয়, তবে সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা জ্বিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দেবে, এরপর ঐ পানি বাড়ীর চারদিকে ছিঁটিয়ে দেবে, তাহলে জ্বিন চলে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা জ্বিন পাঠ করছে, তবে সে কঠোর-অন্তর বিশিষ্ট কোন লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় তওহীদের বিবরণ এবং শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে, কিছু সংখ্যক জ্বিন কোরআনে করীম শ্রবণ করে তার সত্যতায় বিশ্বাস করে এবং অন্য

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৮১

জ্বিনদেরকে কোরআনে করীমের উপর ঈমান আনয়নের আহ্বান করে, আলোচ্য সূরায় এর বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ পর্যায়ে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক কিভাবে আসমান সমূহকে সংরক্ষণ করছেন, কোন জ্বিনের পক্ষে সম্ভবই নয় যে, আসমানের কোন কথা শ্রবণ করতে পারে। জ্বিনদের মধ্যেও মানুষের ন্যায় মোমেন ও কাফের রয়েছে। এতদ্ব্যতীত এ সূরায় একথাও এরশাদ হয়েছে, তওহীদের প্রতি ঈমান চির শান্তি, চির সাফল্যের কারণ হয়, পক্ষান্তরে, কুফর ও নাফরমানী দোযখের শাস্তির মাধ্যম হয়।

এ সূরার পরিসমাপ্তিতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, নিশ্চয় জ্বিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে, এরপর তারা বলেছে, নিশ্চয় আমরা শ্রবণ করেছি এক বিস্ময়কর কোরআন'।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ পাক জীব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, (হে রসূল!) আপনি মক্কার কাফেরদেরকে বলুন যে, জীব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে খবর দিয়েছে, ইয়ামনের নাসীবাঈন নামক স্থানের নয়জন জ্বিন কোরআনে করীম মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং মুগ্ধ হয়ে ঈমান এনেছে ও তাদের স্বজাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি।

نفر শব্দটি তিন থেকে দশ জনের দল সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। নাসীবাঈনের জ্বিনদের যে দলটি কোরআনে করীম শ্রবণ করে ঈমান এনেছিল, অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তাদের সংখ্যা ছিল ৭ জন।

জ্বিন প্রসঙ্গে

জ্বিনদেরকে আল্লাহ্ পাক অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণা, তাদের দেহ এবং প্রাণ উভয়ই আছে। মানুষের ন্যায় তাদের বুদ্ধিও রয়েছে তবে মানুষের দৃষ্টিতে তারা গোপন থাকে, আর এজন্যেই জ্বিনকে "জ্বিন" বলা হয়।

جن শব্দটির অর্থ কোন কিছু গোপন করা, আর جن অর্থ যা গোপন থাকে। জ্বিনদের সন্তান-সন্ততি হয়। মানুষের মত তারাও দু' ভাগে বিভক্ত নর ও নারী। এখানে উল্লেখ্য, ফেরেশতাদের মধ্যে নর-নারী এ বিভাজন নেই, জ্বিনদের এক প্রকার হলো শয়তান। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ ঘটনায় জ্বিনদেরকে দেখেননি, তিনি নামাজে রত ছিলেন। ঘটনাক্রমে জ্বিনেরা সেখানে আসে এবং পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে। আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাঁকে এ খবর দিয়েছিলেন।

বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিজী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে "ওকাজ" নামক বাজারের দিকে গমন করছিলেন। তিনি "নাখলা" নামক স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন। নামাজে কোরআনে করীম তেলাওয়াত করার সময় জ্বিনেরা তা শ্রবণ করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্বিন ও শয়তানরা আসমানের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে ফেরেশতাদের নিকট থেকে কোন কোন খবর সংগ্রহ করতে পারত। সে খবরের সঙ্গে আরো কিছু মিথ্যা যোগ করে শয়তানরা তাদের অনুগামীদেরকে জানিয়ে দিত। গণকরা ঐসব গায়বী খবর দিয়ে মানুষ থেকে বাহ্‌বা বা বখশিষ নিত। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবী ও রসূল হিসেবে আবির্ভূত হবার পর এ পথ বন্ধ হয়ে যায়। যদি কোন জ্বিন শয়তানকে আকাশে কোথাও দেখা যায় তবে তার প্রতি বর্ষিত হয় উল্কা-বৃষ্টি। এ অবস্থা কেন হলো তা জানার জন্যে জ্বিনদের বিভিন্ন অনুসন্ধানী দল বের হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে নাসীবাঈনের এ দলটি নাখলায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করে এবং এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের মহান বাণী কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার কারণেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

কোরআনে করীমের বিস্ময়কর বর্ণনা-শৈলী, প্রাঞ্জল ভাষা, যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য, অতুলনীয় জ্ঞান-ভান্ডার-এসব কিছু তাদেরকে মুগ্ধ করেছে, তাই তারা বলেছে, আমরা ঈমান এনেছি এক আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোরআনের প্রতি।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য আবু তালেবের এন্তেকালের পর তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গমন

করেছিলেন। সকীফ নামক গোত্রকে তিনি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন, কিন্তু তারা সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং তাঁকে কষ্টদায়ক জবাব দেয় এবং তাদের গোলামদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তারা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকল, তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে গেল। তিনি ওতবা এবং শায়বা নামক ব্যক্তিদ্বয়ের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তারা উভয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ জালেমদের বিরুদ্ধে বদদোয়া না করে তাদের পক্ষে হেদায়েতের দোয়া করলেন। সেই দুঃখের দিনে তিনি এভাবে দোয়া করেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আমার দুর্বলতা, চেষ্টা-তদবীরের স্বল্পতা এবং মানুষের সম্মুখে লাঞ্ছিত হওয়ার কথা তোমার দরবারে পেশ করছি, তুমি আরহামুর রাহেমীন।

এদিকে রবীয়ার দু' পুত্র ওতবা এবং শায়বার অন্তরে এ অবস্থা দেখার পর উদারতা ও মহানুভবতা জাগ্রত হলো। ওদাস নামক তাদের একটি গোলাম ছিল, তাকে একটি পাত্রে আঙ্গুর নিয়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পেশ করার জন্যে তারা নির্দেশ দিল, সে এ নির্দেশ পালন করলো, আঙ্গুর নিয়ে সে তাঁর সম্মুখে রাখল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করে আঙ্গুর খেতে শুরু করলেন। তখন ওদাস তাঁর চেহারা মোবারকের দিকে তাকাতে থাকে এবং বলে, এ শহরের অধিবাসীরা কখনো এমন কথা বলেনা (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ করেনা), হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং তোমার ধর্ম কি? সে বললো, আমি খৃষ্টান, আমি নায়নুয়া নামক স্থানের অধিবাসী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তবে কি তুমি ইউনুস এবনে মাতা'র শহরের অধিবাসী? সে বললো, আপনি ইউনুস এবনে মাতা'কে কিভাবে জানেন?

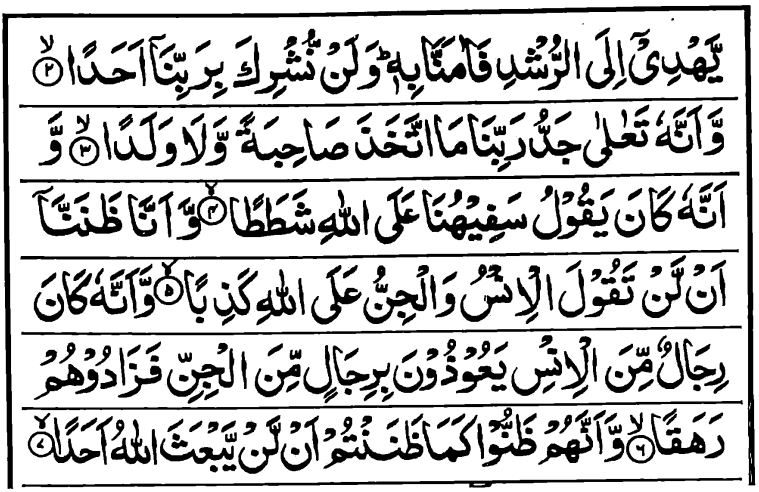
তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন, নবী ছিলেন, আমিও নবী। একথা শ্রবণ করে ওদাস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হলো এবং তাঁর মাথা, হাত এবং পা মোবারকে চুম্বন করলো। এদিকে ওতবা ও শায়বা এ দৃশ্য দেখে পরস্পর বললো, এ ব্যক্তি তোমাদের গোলামের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ওদাস যখন তাদের নিকট ফিরে আসল তখন তারা বললো, তোমার কী হয়েছে যে, তুমি তাঁর মাথায় এবং হাতে পায়ে চুম্বন করছিলে? তখন সে বললো, সারা পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে উত্তম কোন

মানুষ নেই। তিনি আমাকে এমন কথার খবর দিয়েছেন, যা নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা।

যাহোক, বনী সাকীফ গোত্রের ঘটনায় তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে তিনি নামাজ আদায় করছিলেন, তখন ইয়ামনের নাসীবাঈনের জ্বিনেরা নাখলা অতিক্রম করার সময় কোরআনে করীম শ্রবণ করে।

আল্লামা এবনে জওযী (রঃ) "কিতাবুস্ ছাফওয়াতে" হযরত সাহল (রাঃ) এবনে আবদুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি ওজাআ' নামক স্থানে ছিলাম, সেখানে পাথর খোদাই করে বাড়ী নির্মাণ করা হয়েছে, শহরের মাঝে প্রস্তর নির্মিত একটি মহল ছিল, ঐ মহলে জ্বিনেরা বাস করতো। ঐ মহলে আমি লক্ষ্য করলাম, একজন বৃদ্ধ লোক কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করছে। লোকটি স্থূলাকৃতি ছিল। কিন্তু তার দেহের এ অবস্থা দেখে আমি এত বিস্মিত হইনি, যতটা তার পশমী জুব্বার পরিচ্ছন্নতা দেখে হয়েছি। আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সাহল! কাপড় শরীরে ব্যবহারের কারণে পুরনো হয়না, কাপড়কে পুরাতন করে পাপাচারের দুর্গন্ধ এবং হারাম রিযক। এ জুব্বাটি আমি বিগত সাতশ' বছর যাবত পরিধান করছি, আমি হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযিরী দিয়েছি, তাঁদের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি আরজ করলাম, আপনি কে? তখন তিনি বললেন, আমি সে জ্বিনদের একজন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا নাযিল হয়েছে।[১]

১। জ্বিনদের এ ঘটনা সম্পর্কে আরো জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৮


يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢
وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝٣ وَّ
اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝٤ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ
اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝٥ وَّاَنَّهٗ كَانَ
رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ
رَهَقًا ۝٦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝٧

তরজমা

(২) এমন বিস্ময়কর গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, যা সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়, তাই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবো না।

(৩) আর নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শান মর্যাদা অনেক উচ্চে। তিনি গ্রহণ করেননি পত্নী এবং সন্তান।

(৪) আর নিশ্চয় আমাদের নির্বোধ লোকেরাই আল্লাহ পাকের সম্পর্কে অতি অবাস্তব উক্তি করতো।

(৫) আর নিশ্চয় আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন কখনো আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবেনা।

(৬) আর নিশ্চয় কিছু সংখ্যক পুরুষ মানুষ কিছু সংখ্যক জ্বিনদের আশ্রয় গ্রহণ করতো, পরিণামে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করতো।

(৭) আর নিশ্চয় তোমরা যেমন মনে কর তেমনি জ্বিনরাও মনে করেছিল যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

তফসীরুল কোরআন

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۞

'পবিত্র কোরআন এমন বিস্ময়কর গ্রন্থ যা সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়, তাই আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবো না'।

পূর্ববর্তী আয়াতে জ্বিনদের পবিত্র কোরআন শ্রবণের কথা এরশাদ হয়েছে। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বিনেরা তাদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলেছে যে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। এ আয়াতেও জ্বিনদের কথা বলা হয়েছে। তারা কোরআনে করীমের প্রশংসা করছিল এভাবে যে, কোরআনে করীম বিশ্ববাসীকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয়, আল্লাহ্ পাকের পথে তাঁর বন্দাদেরকে হেদায়েত করে। কোন পথিককে যদি তার মঞ্জিলে মকসুদ দেখিয়ে দেয়া হয় অথবা যদি পথিকের হাত ধরে তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে এর নামই হেদায়েত। আলোচ্য আয়াতে কোরআনে করীমের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা যেন সৃষ্টিকে হাত ধরে স্রষ্টার নিকটে পৌঁছে দেয়, কেননা কোরআন হলো নূর বা আলো, যে কোরআনে করীম পাঠ করে সে ঐ আলোতে কল্যাণকর পথের সন্ধান পায়। কোরআন তাকে সৎ পথ প্রদর্শন করে। মূলতঃ এ কারণেই আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি। পবিত্র কোরআনই মানুষকে নাজাত বা মুক্তির পথ-নির্দেশ করে। তাই পবিত্র কোরআনের উপর ঈমান আনয়নের পর আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়, আমরা কখনও শেরক করবো না।

এ সূরা শুরু করা হয়েছে قل শব্দ দ্বারা, অর্থাৎ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনি মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন যে জ্বিনদের একটি দল পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা মাত্র এক আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এনেছে। অথচ তোমরা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতা করছো। এ পর্যায়ে হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-এর বর্ণনা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। তিনি বলেছেন, হযরত রাফে এবনে ওমায়ের তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আমি এক রাতে মরুভূমিতে ভ্রমণরত ছিলাম। আমার নিদ্রা আসছিল খুব বেশী, তাই আমি উষ্ট্রী থেকে অবতরণ করলাম এবং আমার সম্প্রদায়ের আদত মোতাবেক শয়নকালে বললাম, "হে আল্লাহ! আমি এই মরুভূমির জ্বিনদের সর্দারের আশ্রয় গ্রহণ করি"।

একথা বলে আমি শয়ন করলাম। স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি হাতে অস্ত্র নিয়ে আমার উষ্ট্রীর উপর হামলায় উদ্যত রয়েছে। আমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম, ডানে বামে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখা গেলনা। উষ্টীটিকে দেখলাম সে কাঁপছে। আমি আবার ঘুমিয়ে পড়লাম এবং অনুরূপ স্বপ্ন দেখলাম। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখলাম কিছুই নেই। আমি পুনরায় নিদ্রিত হলাম, অনুরূপ স্বপ্ন দেখলাম। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি দেখলাম এক যুবক বর্ষা নিয়ে আমার উষ্ট্রীর উপর হামলা করে এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখলাম সে হাত ধরে তাকে বিরত রাখছে। সে বলছে, তুমি এর মধ্যে একটি বাছুর নিয়ে যাও, আর এ ব্যক্তির উষ্ট্রীটি ছেড়ে দাও। এরপর ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো। তখন ঐ যুবক একটি গাধা নিয়ে চলে গেল। আমাকে সে বললো, তুমি যদি কোন মরুভূমি বা অরণ্যে রাত্রি যাপন কর তবে একথা বলোনা যে, আমি এই জ্বিনদের সর্দারের আশ্রয় গ্রহণ করছি; বরং তুমি বল–

اعوذ بالله رب محمد (صلى الله عليه وسلم) من حول هذا الوادى

অর্থাৎ আমি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করি, যিনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতিপালক, এই মরুভূমির বিপদ থেকে।

তখন আমি ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? সে বললো, ইনি নবীয়ে আরবী, সোমবার দিন তাঁর আবির্ভাব হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন? তিনি বললেন, ইয়াসরাবে যা খেজুরের বস্তি। সকাল হওয়া মাত্র আমি মদীনা শরীফে পৌঁছে গেলাম। হযরত রসূলুল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, কিন্তু আমি কিছু বর্ণনা করার পূর্বেই তিনি আমাকে ঐ ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।[১]

وَّأَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۞

'আর নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের শান মর্যাদা অনেক উচ্চে, তিনি গ্রহণ করেননি পত্নী এবং সন্তান'।

অর্থাৎ আমাদের প্রভুর শান ও মর্যাদা সর্বোচ্চে, এ কারণেই তিনি পত্নী গ্রহণ করেননি, সন্তান-সন্ততির তাঁর কোন প্রয়োজন নেই; বরং এসব তার উচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৮৫

আলোচ্য আয়াতের جد শব্দটির অর্থ হলো, শান মর্যাদা।

হযরত মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন–

كان الرجل اذا قرء بقرة وال عمران جد فينا

যখন কেউ সূরা বাকারা ও সূরা আলে এমরান পাঠ করতো, তখন আমাদের মধ্যে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হতো।

এতেএকথা প্রমাণিত হয় جد অর্থ উচ্চ মর্যাদা,

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, جد অর্থ আদেশ,

আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন جد অর্থ কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া,

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, جد অর্থ হল ক্ষমতা,

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, কর্ম।

কুরতবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ নেয়ামত সমূহ।

আর আখফাস (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ শাসন ক্ষমতা এবং হুকুমত।

جَدُّ رَبِّنَا

অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকের শান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম, মর্তবা সর্বোচ্চে। তাঁর আদেশ অবশ্য পালনীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর নেয়ামত সমূহ অগণিত, মূলতঃ তিনি মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর দয়ার ভিখারী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী, তাঁর নেয়ামত অনন্ত অসীম। স্ত্রী পুত্র পরিবার গ্রহণ তাঁর শান ও মর্যাদার বরখেলাফ।

وَّأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۞

আর নিশ্চয় আমাদের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ পাকের শানে এমন অবান্তর অবাস্তব, অসুন্দর এবং অসত্য কথা বলতো যা শুধু কোন নির্বোধ লোকের পক্ষেই সম্ভব। কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে এমন শয়তানী কথা উচ্চারণ করা অসম্ভব, অচিন্তনীয়, যার মধ্যে সামান্যতম বুদ্ধি-বিবেচনা আছে তার পক্ষে এমন মিথ্যা কথা বলা কখনো সম্ভব হতে পারে না, যেমন এমন কথা বলা যে আল্লাহ পাকের পরিবারবর্গ আছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

নিশ্চয় আমরা মনে করতাম যে, মানুষ এবং জ্বিন কখনো আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবেনা, অর্থাৎ আমরা মনে করতাম যে আল্লাহ পাকের স্ত্রী আছে, সন্তান-সন্ততি আছে, আল্লাহ পাকের নামে এমন নির্জ্জলা মিথ্যা বলার দুঃসাহস কেউ করতে পারে না, এখন আমরা কোরআনে করীমের প্রতি ঈমান এনেছি, কোরআনে করীমের মাধ্যমে আমাদের এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়েছে যে, আমাদের সমাজের নির্বোধ লোকদের এসব কথা সম্পূর্ণ অসত্য, সত্যের লেশমাত্রও তার মধ্যে নেই।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্বিনেরা আসমানের দিকে যেতে পারতো এবং ফেরেশতাদের তসবীহ-তাহলীল এবং কথা-বার্তা শুনতে পারতো, পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় নির্বোধ লোকদের কথা মেনে চলার কি প্রয়োজন ছিল? ফেরেশতাদের কথা শ্রবণ করে তারা কেন হেদায়েত লাভ করতে পারলো না?

এ প্রশ্নের জবাব এই, ঈমান হলো আল্লাহ পাকের মহান দান, আল্লাহ পাকের মর্জি ব্যতীত এ দান কেউ লাভ করতে পরে না। আল্লাহ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হলে ঈমান নসীব হয়। ঈমানের ভাব মনের গহনে সৃষ্টি হয়। এরপরেই আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করার জন্যে মানব মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ আগ্রহে এক সময় ব্যাকুলতা আসে এবং এ ব্যাকুলতা আল্লাহ পাকের মর্জি ও সন্তুষ্টিকে আকৃষ্ট করে, যা মানুষকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে এ অবস্থা সবার জন্যে সম্ভব নয়, এর জন্যে চাই একটি মাধ্যম, সে মাধ্যমের দু'টি দিক থাকে, একটি বাহ্যিক আরেকটি আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক দিকটি আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির উপকরণে পরিণত হয়, আর বাহ্যিক দিকটি সৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হয়। যাদের মধ্যে এ দু'টি দিক থাকে তারা আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত হন, আর বাহ্যিক দিক থেকে তাঁরা সৃষ্টির সাথেও সম্পর্ক করতে পারেন। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে নূর বা জ্যোতি লাভ করে তা আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাঁরাই হলেন নবী রসূলগণ। মহান আল্লাহ পাক ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র বা মাধ্যম হলেন নবী রসূলগণ।

ফেরেশতাগণকে আল্লাহ পাক নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তাই দরবারে এলাহীতে তাদের হাযিরী সম্ভব। নবী রসূলগণের ন্যায়ই আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু যে বাহ্যিক দিকটি নবী রসূলগণের রয়েছে, তা তাদের নেই, তাই তারা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে পারেন না, তারা শুধু নবী রসূলগণের নিকটই আসতে পারেন, তাঁদের সাথে কথা বলতে পারেন, অন্যদের সঙ্গে নয়। আর অন্য মানুষের মধ্যেও তাদের সাথে যোগাযোগ করার যোগ্যতা নেই। একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হযরত হামজা (রাঃ) এ আবদার করলেন যে, আপনার নিকট অহরহ জীব্রাঈল (আঃ) আসেন, আমাকে একটু তাঁকে দেখার সুযোগ দিন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, আপনি তাঁকে দেখতে সক্ষম হবেন না, তবু হযরত হামজা (রাঃ) বারংবার আবদার করতে লাগলেন। তখন জীব্রাঈল (আঃ) আসলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে কথাটি বললেন এবং ক্ষণিকের জন্যে কা'বা শরীফের উপর দাঁড়াবার অনুরোধ করলেন, আর চাচা হযরত হামজা (রাঃ)-কে বললেন, কা'বা শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। হযরত হামজা (রাঃ) কা'বা শরীফের উপর দৃষ্টিপাত করা মাত্রই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

মূলতঃ এজন্যেই আল্লাহ পাক নবী রসূল মনোনীত করেছেন মানুষ থেকে, ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নয়, নিঃসন্দেহে এটি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্বিনেরা ফেরেশতাদের কথা শ্রবণ করতে পারত, কিন্তু তারা তা দ্বারা হেদায়েত লাভ করতে পারতোনা, কেননা জাগতিক বা দৈহিক অন্ধকার তাদের মধ্যে নেই, তাই ফেরেশতাগণ থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, এজন্যেই প্রয়োজন নবী রসূলগণের, তাঁরা একদিকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত থাকেন, অন্যদিকে আল্লাহ পাকের বন্দাদের সঙ্গে মিলেমিশেও থাকেন। নবী রসূলগণের মধ্যেও মর্তবার পার্থক্য রয়েছে, যেমন আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করেছেনঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ

'এই রসূলগণ, আমি তাঁদের একের উপর অন্যকে অধিক মর্যাদা দান করেছি'।

এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। এজন্যেই তিনি এরশাদ করেছেনঃ

لى مع الله وقت لا يسعه ملك مقرب ولا نبى مرسل

'আল্লাহ পাকের সাথে আমার এমন সময় রয়েছে, যখন কোন নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং কোন নবী রসূলও দরবারে হাযির হতে পারে না'।

এ সুযোগ শুধু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। একথা তিনি তখন বলেছেন, যখন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যথারীতি সালাম পেশ করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আমি আয়েশা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আয়েশা কে?

তিনি আরজ করলেন, আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর (রাঃ) কে?

তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর দাদার নাম উল্লেখ করলেনঃ এবনে আবু কাহাফা (রাঃ)।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আবু কাহাফা কে?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তখন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায় আছেন যে, আমাকে চিনলেন না, এমনকি আমার পিতাকেও চিনলেন না, আমি আমার পিতামহের নামোল্লেখ করলাম, কিন্তু তাতেও তিনি চিনতে পারলেন না, এ অবস্থায় আমি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম। পরবর্তীতে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি এরশাদ করেছিলেন যে, 'আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমার এমন কিছু সময় রয়েছে যখন কোন নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতা এবং কোন নবী রসূলও হাযির হতে পারেন না'। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করেছিলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

দ্বিতীয়তঃ একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবী রসূলগণ সরাসরি আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে নূর হাসিল করেন এবং সেই নূরের আলোকে আল্লাহর বন্দাদের হেদায়েত করেন। আল্লাহ পাক কখনো ফেরেশতাগণকে নবী রসূলগণের নিকট

প্রেরণ করেন, যেমন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান বাণী নিয়ে সকল নবী রসূলগণের নিকট হাযির হয়েছিলেন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সমস্ত নবী রসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী এসেছিলেন, হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট। আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট হযরত জীব্রাঈল (আঃ) ৪০০শ' বার আগমন করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের বয়স ছিল ১১০ বছর। আর আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ২৩ বছরের নবুওয়্যতের আমলে আল্লাহ পাকের মহান বাণী নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি এসেছিলেন ২৪,০০০ বার।

এতেও একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

আর এ-ও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হেদায়েত আল্লাহ পাকের দান, যা নবী রসূলগণের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

আর এজন্যেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণ ব্যতীত হেদায়েত লাভ করা যায়না, জীবন-সাধনা সার্থক এবং সফলকাম হয়না।

কেননা, আল্লাহ পাকের সাথে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক ছিল পরিপূর্ণ আর সৃষ্টির সঙ্গেও ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তাই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে হেদায়েত তাঁর নিকট আসতো, তা তিনি আল্লাহ পাকের বন্দাদের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারতেন। এজন্যেই একজন বুজুর্গ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন–

ادہر اللہ سے واصل ادہر بندوں میں شامل

অর্থাৎ একদিকে আল্লাহ পাকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, আর অন্যদিকে বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

وَّأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

'আর কিছু সংখক পুরুষ মানুষ জ্বিনদের আশ্রয় গ্রহণ করতো, পরিণামে তারা জ্বিনদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি করতো'।

শানে নুযুল

এবনে মুনজের, এবনে আবি হাতেম এবং এবনে আবি শায়েখ করুম এবনে সায়েব আনসারী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে মদীনায় রওয়ানা হই। মরুভূমিতে রাত্রি যাপনের জন্যে একজন মেষ পালকের নিকট আমাদের অবস্থান করতে হয়। অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর একটি বাঘ বকরীর একটি বাচ্চা উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখন মেষ পালক চিৎকার দিয়ে বলে, হে মরুভূমির মালিক, এ বকরীর ছানাটি তোমার আশ্রয়ে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘোষক যাকে আমরা দেখিনি বাঘকে ডাক দিয়ে বললো, "তাকে ছেড়ে দাও"। অনতিবিলম্বে বকরীর ছানাটি দ্রুতবেগে অন্য বকরীদের মধ্যে ফিরে এল। এ ঘটনা তখন ঘটে যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক নাম প্রথম প্রথম শ্রবণ করা হয় ' তখন এ আয়াত নাযিল হয়। লোকেরা জ্বিনের সর্দারদের আশ্রয়ের কথা বলতো, এজন্যে জ্বিনদের দম্ভ অহংকার বেড়ে যেত।

এবনে সাদ আবু রেজার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের যুগে আমি আমার বাড়ীর বকরীগুলো চারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতাম, আর এ পর্যায়ে জরুরী কাজগুলো করতাম। যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, আমি তখন আমার গোত্র থেকে পলায়ন করে বের হই এবং মরুভূমিতেই আমার সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমাদের গোত্রের নেতার এ পন্থা ছিল যে, ভ্রমণ কালে যদি কোথাও সন্ধ্যা হয়ে যেত, তখন আমাদের গোত্রের সর্দার বলতো, "আমরা এ অরণ্যের সর্দার জ্বিনের আশ্রয় নিচ্ছি"। তাই যথারীতি আমি এ কথাগুলো উচ্চারণ করলাম। তখন গায়বী আওয়াজ আসলো, এ আশ্রয় লাভের পন্থা لَآ اله الا الله محمد رسول الله এক আল্লাহ পাককে স্বীকার করা, এছাড়া আর কোন পন্থা নেই। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আবু রেজা বলেন, আমার ধারণা হল, আলোচ্য আয়াত وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ আমার সাথীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

যেহেতু লোকেরা জ্বিনদের আশ্রয় গ্রহণ করতো, তাই তাদের আত্মম্ভরিতা বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য আয়াতের رهقا শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, গুনাহ।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল- ঔদ্ধ্যত্ব।

আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল- পথভ্রষ্টতা।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, অকল্যাণ। যাহোক, আয়াতের মর্মকথা হল, লোকেরা যখন জ্বিনদের আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাদের দম্ভ, আত্মম্ভরিতা ঔদ্ধ্যত্য, অহংকার বৃদ্ধি পায়। এভাবে জ্বিনদের তরফ থেকে একথা স্বীকার করা হয় যে, ইতোপূর্বে আমাদের আকীদা ভুল ছিল। আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা। আশ্রয়ের মালিক একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, আর কেউ নয়।

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۞

'আর নিশ্চয় তোমরা যেমন মনে কর, তেমনি জ্বিনেরাও মনে করেছিল যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না'।

অর্থাৎ প্রাক-ইসলামী যুগে যেমন মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, কেয়ামত হবে না, মানুষের পুনরুত্থানও হবেনা, তথা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবেনা। এ ভ্রান্ত ধারণা শুধু মানুষেরই নয়; বরং জ্বিনেরাও এমন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো। কিন্তু কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়েছে, অতএব, হে জ্বিন জাতি! তোমরাও একথায় বিশ্বাস কর।

অথবা এর অর্থ হল, হে মক্কার কোরায়শ! তোমাদের মত জ্বিনেরাও এ ধারণা করতো, হাশর-নশর হিসাব-নিকাশ কিছুই হবেনা, কিন্তু পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পর যখন জ্বিনেরা কোরআন শ্রবণ করে এবং কেয়ামত যে অবশ্যম্ভাবী, তা অনুধাবন করে তখন তারা কেয়ামতের বাস্তবতা স্বীকার করে, অতএব হে মক্কাবাসী! তোমরাও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ কর।

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا
وَّشُهُبًا ۝٨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ
يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۝٩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ
اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۝١٠ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا
طَرَآئِقَ قِدَدًا ۝١١ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ
وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۝١٢ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ
فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۝١٣ وَّاَنَّا مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤

তরজমা

(৮) আর নিশ্চয় আমরা আসমানের (সংবাদ সমূহ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম (সেখানে) কঠোর প্রহরা এবং উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ রয়েছে।

(৯) আর নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণের জন্যে বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শ্রবণে ইচ্ছুক হলে সে তার উপর নিক্ষেপ করার জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।

(১০) আর নিশ্চয় আমরা জানি না, বিশ্ববাসীর জন্যে কোন প্রকার অমঙ্গল বা অকল্যাণের ইচ্ছা রয়েছে কি-না? অথবা তাদের প্রতিপালক তাদের হেদায়েত করতে মর্জি করেছেন।

(১১) আর নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কিছু নেককার রয়েছেন আর কিছু লোক এর ব্যতিক্রম, মূলতঃ আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।

(১২) আমরা এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাককে (কখনও) পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারবো না।

(১৩) আর আমরা যখন হেদায়েতের কথা শ্রবণ করি তখনই তাঁর প্রতি ঈমান আনি, অতএব যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার কোন ক্ষতি ও কোন প্রকার অন্যায়ের আশঙ্কা থাকেনা।

(১৪) আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের অনুগত কিছু মুসলমান রয়েছে এবং কিছু সংখ্যক সীমা লংঘনকারীও রয়েছে, অতএব যে কেউ মুসলমান হয়েছে সে-ই প্রকৃত সুপথ অবলম্বন করেছে।

তফসীরুল কোরআন

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۞

'আর নিশ্চয় আমরা আসমানের (সংবাদ সমূহ) সংগ্রহ করতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম (সেখানে) কঠোর প্রহরা এবং উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ রয়েছে'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে জ্বিনেরা আসমানের কাছাকাছি যেতে পারত, কোথাও বসতেও পারত, ফেরেশতাদের কথাবার্তা শ্রবণ করে আসতো এবং গণকদেরকে বলতো। গণকরা ঐ কথার সাথে আরও একশ'টি মিথ্যা কথা মিলিয়ে মানুষকে জানিয়ে দিত। কিন্তু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের পর আসমানে অভূতপূর্ব প্রহরা বসে যায়, কোন জ্বিন শয়তানের পক্ষে আসমানের কাছে যাওয়ার সাধ্য ছিলনা। ইতোপূর্বে এত দুর্ভেদ্য প্রহরা কখনও ছিলনা। এখন যদি কেউ আসমানের নিকট যেতে চায় তবে উল্কাবৃষ্টি তার জন্যে মহা বিপদের কারণ হয়।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে একথা শ্রবণ করেছি, ফেরেশতাগণ আসমানের বিভিন্ন স্তরে অবতরণ করে এবং এমন বিষয়ের আলোচনা করে, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়ে গেছে। জ্বিন শয়তানরা আসমানের নিকটবর্তী হয়ে তার দু' একটি কথা শ্রবণ করতো এবং পৃথিবীতে এসে গণকদেরকে বলতো, আর তারা একটি কথার সাথে একশ'টি মিথ্যে কথা মিলিয়ে দিত। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন কোন ফরমান জারি করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ বলেন, সোবহানাল্লাহ, এরপর আরশের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও বলেন, সোবহানাল্লাহ। এভাবে একের পর এক প্রতিটি আসমানে সোবহানাল্লাহ'র গুঞ্জন ওঠে, আল্লাহ পাকের পবিত্রতার বর্ণনা হতে থাকে, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিপালক কি বলেছেন? অন্য ফেরেশতা তার জবাব দিয়ে থাকে। এভাবে প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে এবং জবাব দেয়। এভাবে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে কথাটি আসে। আর তখন জ্বিন শয়তানরা তা শ্রবণ করে দুনিয়ার গণক ও যাদুকরদেরকে তা শুনিয়ে দেয় এবং তার সাথে আরও কিছু কথা বাড়িয়ে বলে। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আসমানে কড়া প্রহরা মোতায়েন করা হয়। জ্বিনদের প্রতি উল্কা-বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে তারা আর উপর থেকে কোন কথা শুনতে পারেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا

'আমরা দেখতে পেলাম সেখানে কঠোর প্রহরা এবং উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ রয়েছে'।

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ط فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۞

'আর নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে আসমানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণের জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শ্রবণে ইচ্ছুক হলে সে তার উপর নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়'।

অর্থাৎ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে আসমানের কাছাকাছি বসা সম্ভব ছিল, কথাবার্তা শ্রবণ করাও সম্ভব ছিল। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা স্বরূপ কোন জ্বিন শয়তানকে আসমানের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি, যাতে করে কোরআনে করীমের হেফাজত করা যায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মোযেজা দেখেই জ্বিনেরা সেদিন ঈমান এনেছিল। জ্বিনেরা আরো বলে–

وَّاَنَّا لَا نَدْرِىْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞

'আর নিশ্চয় আমরা জানিনা, বিশ্ববাসীর জন্যে কোন প্রকার অমঙ্গল বা অকল্যাণের ইচ্ছা রয়েছে কি-না? অথবা তাদের প্রতিপালক তাদের হেদায়েত করতে মর্জি করেছেন'।

অর্থাৎ এ কঠিন কঠোর প্রহরার কারণ কি? এর পেছনে কি উদ্দেশ্য রয়েছে? দুনিয়ার মানুষের জন্যে তা ভাল কি মন্দ, তা আমরা জানিনা।

প্রাক-ইসলামী যুগে লোকেরা এ ধারণা করতো যে, জ্বিনেরা গায়ব জানে, এ আয়াত দ্বারা সে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা হয়। জ্বিনেরাই বলে, এ কঠোর প্রহরার উদ্দেশ্য কি তা আমরা জানি না, অর্থাৎ মানুষ যেমন অনেক কিছু জানেনা তেমনি জ্বিনেরাও অনেক কিছুই জানেনা। কিন্তু আমরা কোরআন শ্রবণ করেছি, আর এ কোরআনে করীম নাযিল হওয়ার কারণেই আসমানী সংবাদ সংগ্রহ আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন আসমানী সংবাদ যা কিছু বর্ণিত হবে তা শুধু হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই হবে, এটি হবে তাঁর মোযেজা, যা আর কেউ তাঁর পূর্বে জানতে পারবেনা, এখন এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে, আসমানকে এরূপ দুর্ভেদ্য প্রহরায় রাখার উদ্দেশ্য হলো বিশ্ববাসীকে হেদায়েত করা।

এ আয়াত কোরআনে করীমের সত্যতার এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জ্বিনেরা আরো বলে–

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ

'আর নিশ্চয় আমাদের মধ্যে কিছু নেককার রয়েছে, আর কিছু লোক এর ব্যতিক্রম'।

অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যেমন নেককার বদকার থাকে, ঠিক তেমনি জ্বিনদের মধ্যেও নেককার বদকার থাকে।

كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

'মূলতঃ আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী'।

পবিত্র কোরআনের অবদান

জ্বিনেরা একথাও বলে, আমাদের প্রতি পবিত্র কোরআনের বিরাট অবদান রয়েছে। আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন মত ও পথে ছিলাম, আমাদের নির্দিষ্ট কোন পথ

ছিলনা। আমাদের মধ্যে কোন ঐক্য ও সংহতি ছিলনা, পবিত্র কোরআন আমাদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, জ্বিনেরাও মানুষের মত বিভিন্ন ফেরকায় বিভক্ত রয়েছে। যেমন, কাদেরীয়া, মুরজিয়া, রাফেজী প্রভৃতি। কাদেরীয়া ফেরকা এ মত পোষণ করে, মানুষই তার কর্মের স্রষ্টা, মন্দ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ পাক নন। এদিকে মুরজিয়া ফেরকার আকিদা হল, যদি তৌহীদের উপর খাঁটি ঈমান থাকে তবে গুনাহর কারণে কোন প্রকার শাস্তি হবেনা। এমনকি, নেক আমলেরও দরকার হবেনা। এসব বাতিল ফেরকার লোকেরা এমন সব উদ্ভট ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস বিরোধী। মানুষের মত জ্বিনদের মধ্যেও সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী যেমন রয়েছে তেমনি পথভ্রষ্টও রয়েছে। এজন্যেই জ্বিনেরা বলেছে–

وَأَنَّا مِنَّا الصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ

অবশ্য তফসীরকারগণ "সালেহীনদের" সম্পর্কে বলেছেন, যারা ইতোপূর্বে আগমণকারী নবী রসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখতো এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহের উপর ঈমান রাখতো, এমন জ্বিনদেরকেই আলোচ্য আয়াতে সালেহ বা নেককার বলা হয়েছে। আর যারা ঈমানদার ছিলনা, তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ

'আর কিছু এর ব্যতিক্রম'।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম, হঠাৎ একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হলো, সমগ্র এলাকা আলোকময় হয়ে গেল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, ইতোপূর্বে যখন তোমরা এমন ঘটনা দেখতে তখন কি বলতে? আমরা আরজ করলাম, বড় কারো জন্ম হলে বা বিখ্যাত কারো মৃত্যু হলে তারকা নিক্ষিপ্ত হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, না, তা নয়; বরং আসমানে প্রহরা বসে গেছে, জ্বিনদেরকে আসমানী সংবাদ সংগ্রহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১২৬-১২৭

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আরও লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর এক রাত্রে শয়তানদের উপর উল্কা বৃষ্টি হয়, ঐ অবস্থা দেখে তায়েফবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, তারা মনে করে আসমানে কোন ধ্বংসাত্মক কাজ হচ্ছে, কেননা তারা দেখতে পাচ্ছে একের পর এক নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, দূরে দূরে অত্যন্ত দ্রুতবেগে জ্বলন্ত অংগারগুলো দেখা যাচ্ছে। এ অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে তারা গোলাম আযাদ করতে লাগলো এবং নিজেদের জন্তুগুলোকে আল্লাহর রাহে ছেড়ে দেয়া শুরু করলো। অবশেষে আবদে ইয়ালাইল এবনে আমর এবনে ওমায়ের বলতে লাগলো, হে তায়েফবাসী! তোমরা কেন নিজেদের অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করছো? বরং এসব ব্যবস্থা হচ্ছে এবনে আবি কাবশার জন্যে, তোমরা নক্ষত্র-পুঞ্জের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি নক্ষত্রগুলো স্ব-স্ব স্থানে থাকে, তবে তোমাদের ধ্বংসের কোন কারণ নেই। আর যদি দেখ নক্ষত্রগুলো নিজের স্থান থেকে সরে গেছে তবে মনে কর আসমান ধ্বংসপ্রাপ্ত। তারা নক্ষত্রপুঞ্জ দেখলো এবং সেগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানেই দেখতে পেল, তখন তারা নিশ্চিন্ত হলো। এদিকে শয়তানদের মধ্যেও ভাগ দৌড় শুরু হলো, তারা ইবলীসের নিকট হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো। ইবলীস বললো, আমার নিকট সকল এলাকার মাটি নিয়ে আস। তার নিকট মাটি আনা হল। সে প্রত্যেক এলাকার মাটি গন্ধ শুঁকে দেখলো। এরপর সে বললো, যে কারণে এ ঘটনা ঘটছে, তা রয়েছে মক্কায়। তখন ইয়ামনের নাসিবাঈন নামক স্থান থেকে সাতজন জ্বিন মক্কায় পৌঁছল। এখানে তারা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেল। তিনি নামাজে কোরআনে করীম তেলাওয়াত করছিলেন, তা তারা শ্রবণ করলো। তারা অনেক নিকট থেকে কোরআনে করীম শ্রবণ করেছিল এবং এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ তারা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্য জ্বিনদেরকেও ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালো।[১]

وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۞

'আমরা এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ পাককে (কখনও) পরাভূত করতে পারব না, আর পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না'।

অর্থাৎ আমরা কোরআনে করীমের হেদায়েত মোতাবেক এ সত্য উপলব্ধি করেছি যে, যদি আমরা কোরআনকে অমান্য করি, আল্লাহ পাকের অবাধ্য হই,

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৫২

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করি, তবে আমাদের রক্ষা নেই। আমরা কখনও তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারবনা, আমরা যদি পলায়নপর হয়ে এই ত্রিভূবনে কোথাও আত্মগোপন করতে চাই, তবে তা-ও কখনও সম্ভব হবে না। এ সত্য আমরা বুঝতে পেরেছি, এর উপর আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস বা একীন রয়েছে। আর এ কারণেই আমরা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা মাত্রই অনতিবিলম্বে ঈমান এনেছি। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ

'আর আমরা যখন হেদায়েতের কথা শ্রবণ করি, তখনই ঈমান আনি'।

অর্থাৎ যখন পবিত্র কোরআন শ্রবণ করি তখনই তার সত্যতায় ঈমান আনি, যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরও আমরা ঈমান আনি।

অতএব, হে জ্বিন জাতি! তোমরাও এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, ঈমান আন তাঁর নবীর প্রতি, ঈমান আন তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনের প্রতি।

فَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۞

'অতএব যে তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তার কোন ক্ষতি ও কোন প্রকার অন্যায়ের আশঙ্কা থাকেনা'।

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তার সওয়াব কম হওয়ার আশঙ্কা নেই। যে প্রকৃত মোমেন হবে, সে আল্লাহ পাকের ব্যাপারে কোন ভয় করেনা, অন্যের পাপের বোঝা বলপূর্বক কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবেনা। কাউকে অপমানিত করা হবেনা।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, যে মোমেন হবে সে তার এবাদত-বন্দেগীর মধ্যে যে ত্রুটি থাকে তার শাস্তি সম্পর্কে সে নিশ্চিন্ত হয়না; বরং আল্লাহ পাকের প্রতি, কোরআনে করীমের প্রতি ঈমানের কারণে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ

'আমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের অনুগত কিছু মুসলমান রয়েছে এবং কিছু সংখ্যক সীমা লংঘনকারীও রয়েছে'।

অর্থাৎ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, সত্য গ্রহণের ভাগ্য সকলের হয়নি। আমাদের মধ্যে একদল রয়েছে মুসলমান, আল্লাহ পাকের একান্ত অনুগত। আর

একদল রয়েছে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ পাকের নাফরমানী করতে তারা এতটুকু কুণ্ঠিত হয়না, তারা সীমা লংঘন করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। আল্লাহ পাকের নাফরমানী করতে ভয় করেনা, আর যারা মুসলমান হয়েছে, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ঈমান এনেছে তারা তাদের জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করে বলেছে–

فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۞

'অতএব, যে কেউ মুসলমান হয়েছে সে-ই প্রকৃত সুপথ অবলম্বন করেছে'।

আর এমন লোকেরাই জীবন-সাধনায় সাফল্যমন্ডিত হবে, কেননা তারা সৎ ও সঠিক পথে থেকে জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছে।

হযরত আ'মাশ (রঃ) বর্ণনা করেন, একবার এক জ্বিন আমার নিকট হাযির হল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি খেতে পছন্দ কর? সে বললো চাউল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তা এনে দিলাম। আমি দেখলাম যে পাত্র থেকে লোকমা উঠছে কিন্তু আহারকারীকে দেখছিনা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের মনে যে সব আকাঙ্ক্ষা হয় তোমাদেরও কি তা হয়? সে বললো, হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাফেজীদেরকে তোমাদের সমাজে কেমন মনে করা হয়? সে বললো, মন্দ।

হাফেজ আবুল হাজ্জাজ মদনী (রঃ) বর্ণনা করেন, এ ঘটনার সনদ সত্য।

এবনে আসাকেরে রয়েছে, হযরত আব্বাস এবনে দামেস্কী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাত্রিকালে একজন জ্বিনকে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি যার অর্থ হলো, এই "অন্তর আল্লাহ পাকের মহব্বতে পরিপূর্ণ" হয়ে গেছে।

এমনকি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে, সে অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে আল্লাহ পাকের মহব্বতে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছে।

যে তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছে।

সে সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্রষ্টার সাথে সম্পর্ককে ঘণিষ্টতর করেছে"।

এরপর সে বলে, আমরাতো হেদায়েতনামা শ্রবণ করা মাত্রই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। বস্তুতঃ এটি হল গৌরবের বিষয়, এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর ফজিলত কি হতে পারে যে, আল্লাহ পাকের মহান বাণী অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এরপর সে বলে, মোমেনের নেক আমল বিনষ্ট করা হবেনা, অন্যের মন্দ আমল অন্যায়ভাবে তার উপর চড়িয়ে দেয়া হবেনা। এরপর সে বলে, নেককার মোমেন কোন প্রকার জুলুম অত্যাচার বা ক্ষতিকে ভয় করেনা, আমাদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান রয়েছে আর কিছু লোক সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৫৪

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ
وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ
لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا
أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৫) (পক্ষান্তরে), যারা সীমা লংঘনকারী, তারা দোযখের ইন্ধন।

(১৬) আর যদি তারা সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম।

(১৭) যা দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, যে কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন।

(১৮) আর মসজিদ সমূহ শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই, অতএব তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকোনা (আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা)।

(১৯) আর একথাও জানা গেছে যে, আল্লাহ পাকের বন্দা যখন তাঁকে ডাকতে দন্ডায়মান হয়, তখন তাঁর নিকট লোকদের ভীড় জমে যায়।

(২০) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করি না।

(২১) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার এবং তোমাদেরকে সৎ পথে আনয়ন করার ক্ষমতা রাখিনা।

তফসীরুল কোরআন

وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

(যারা সীমা লংঘনকারী তারা দোযখের ইন্ধন)

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তথা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে তারাই সুপথ অবলম্বন করেছে, তাদের জীবন সাধনা হবে সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে, সুবিচারের স্থলে জুলুম-অত্যাচার করবে, তারা নিঃসন্দেহে দোজখের ইন্ধন হবে অর্থাৎ তাদের দ্বারাই দোযখের অগ্নি প্রজ্জলিত হবে, যেমন ক্ষুদ্র কাষ্ঠখন্ড দ্বারা উনুনে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়।

জ্বিনদের পরিণাম প্রসঙ্গে

এ আয়াতে কাফের জ্বিনদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে তারা দোযখের ইন্ধন হবে। এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হলো, যারা নেককার জ্বিন, তাদের পরিণতি কি হবে? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, ঈমানদার নেককার জ্বিনদের নেক আমলের সওয়াব হবে, আর সে সওয়াব হলো শুধু এই যে, তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ হে আমার জাতি! আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বানকারীর আহবানে সাড়া দাও, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তিনি তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ মতই পোষণ করতেন যে, জ্বিনদের ঈমান ও নেক আমলের ফলে তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে।

সুফিয়ান (রঃ) লাইসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জ্বিনদের জন্যে সওয়াব শুধু এতটুকু হবে যে, তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, এরপর তাদেরকে চতুঃস্পদ জন্তুর মত মাটিতে পরিণত করা হবে।

আবুজ জিয়াদ একথাই বলেছেন যে, যখন আল্লাহ পাক মানুষ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন মোমেন জ্বিনদেরকে বলা হবে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। এ দৃশ্য দেখে কাফেররা বলবে, যদি আমরাও মাটি হয়ে যেতাম। কোরআনে করীমের ভাষায়ঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

'কাফেররা বলবে, 'হায় আক্ষেপ! যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম, তাহলে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা পেতাম'।

এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় কোন মত প্রকাশ করেননি, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে বিষয়কে স্বয়ং আল্লাহ পাক অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট রাখ। আল্লাহ পাক কাফের জ্বিনদের আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নেককার জ্বিনদের সওয়াবের ব্যাপারে কোন ঘোষণা দেননি, শুধু এতটুকু ঘোষণা করেছেন যে, তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষের মত জ্বিনদেরকেও সৎ কাজের সওয়াব এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। ইমাম মালেক (রঃ) এবং এবনে আবি লায়লা এ মতই পোষণ করতেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে পানাহার করবে।

আবুশ্ শায়েখ একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন এ মর্মে যে, জ্বিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তারা কি জান্নাতের নেয়ামত সমূহ ভোগ করবে? তিনি জবাবে বলেছেন, আল্লাহ পাক জ্বিনদের অন্তরে তসবীহ এবং আল্লাহ পাকের জিকর সৃষ্টি করে দেবেন। এ তসবীহ ও জিকর পাঠে তারা এমন স্বাদ লাভ করবে যেমন মানব জাতি জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করে লাভ করবে। আবুশ্ শায়েখ মোমেন জ্বিনদেরকে ফেরেশতাদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

এবনুল মুনজের (রঃ) বলেছেন, আমি হামজা এবনে হাবিব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, জ্বিনেরা কি সওয়াব পাবে?

হযরত হামজা (রাঃ) জবাবে বলেছেন, হ্যাঁ সওয়াব পাবে।

আবুশ্ শায়েখ যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সেদিন বিশ্ববাসীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। একভাগ সম্পূর্ণ জান্নাতে যাবে, আর একভাগ সম্পূর্ণ দোযখে। প্রথমভাগ ফেরেশতাদের, দ্বিতীয়ভাগ শয়তানদের, আর এক ভাগের কিছু অংশ জান্নাতে যাবে, আর কিছু অংশ দোযখে যাবে। এরা হলো জ্বিন ও মানুষের দল, তাদের জন্যে আযাবও রয়েছে, সওয়াবও রয়েছে।

এবনে ওহাবকে জিজ্ঞাসা করা হয়, জ্বিনদের জন্যে কি আযাব ও সওয়াব উভয়টিই রয়েছে? তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন–

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ 'এরা সেসব লোক, যাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এদের পূর্বে জ্বীন এবং মানুষের যে সব সম্প্রদায় গত হয়ে গেছে, এরাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় তারা ছিল জালেমদের অন্তর্ভুক্ত'।

হযরত ওমর এবনে আবদুল আযীয (রঃ) বলেছেন, যে সব জ্বিন ঈমানদার হবে তাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী ময়দানে রাখা হবে, জান্নাতের ভেতরে প্রবেশ করবে না।

যারা এ মত পোষণ করেন, জ্বিনেরা সওয়াব লাভ করবে, তারা কোরআনে করীমের এ আয়াত দলিল হিসাবে পেশ করেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস', যেমন সূরা আর-রাহমানেও রয়েছেঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

'যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে তাদের জন্যে রয়েছে দু'টি জান্নাত, হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ কোন্ নেয়ামতকে অস্বীকার করবে'?

এমনি আরো বহু আয়াত রয়েছে, যাতে জ্বিন ও মানব জাতিকে একই সঙ্গে সম্বোধন করা হয়েছে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর অনুসারীদের পক্ষ থেকে এর জবাব দেয়া হয়, যে সব আয়াতে সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে তা সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সূরা আর রাহমানে জ্বিন ও মানব জাতি উভয়কেই সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ অস্বীকার করার কারণে সাধারণভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতই সঠিক মনে হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীগণ জ্বিনদের সওয়াবের কথা বলেন, তাদের নিকট এর দলিল রয়েছে, তাই তাদের কথা গ্রহণ করা যেতে পারে। আর যেহেতু ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নিকট কোন দলিল নেই, তাই তিনি নীরবতা পালন করা পছন্দ করেছেন। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত ওমর এবনে আবুল আযীয (রঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের মতও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানদার জ্বিনদের জন্যে সওয়াব রয়েছে আর কাফের জ্বিনদের আযাব হবে। আমরা সওয়াবের প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তারা আরাফে থাকবে, জান্নাতে নয়। আমরা আরজ করেছি, আ'রাফ কি? তিনি এরশাদ করেছেন, জান্নাতের বাইরে যেখানে নহর প্রবাহিত থাকবে, বৃক্ষ এবং ফল থাকবে।[১] (والله اعلم)

আলোচ্য আয়াতের وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (পক্ষান্তরে) যারা সীমা লংঘনকারী, তারা দোযখের ইন্ধন।) قاسطون শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, যারা হক্ব থেকে দূরে সরে যায়।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জালেম।

আর কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যারা অন্যায়কারী।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১২৯-১৩১

ইমাম তবরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) قاسطون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ كافرون অর্থাৎ যারা কাফের, যারা সত্য পথ থেকে দূরে, যারা জালেম।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হাজ্জাজ এবনে ইউসুফ হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে হত্যার দুরভিসন্ধি করলো, তাই সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, আমার সম্পর্কে আপনার কি মত? তিনি বললেন, قاسط عادل হাজ্জাজের দরবারের লোকেরা ভাবল, তিনি হাজ্জাজের প্রশংসাই করেছেন, তখন হাজ্জাজ বললো, হে মূর্খের দল! সে তো আমাকে জালেম এবং মুশরেক বলে গেল, এরপর সে আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলো।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, জ্বিনদের মধ্যে যারা জালেম তাদের শাস্তি এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু যারা তাদের মধ্যে মুসলমান, তাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এরপর তিনি নিজেই জবাবে বলেছেন, মুসলমান জ্বিনদের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে। তাহলোঃ

فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا

'যারা আল্লাহ পাকের দরবারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তারা সত্য পথ বেছে লয়'।

একথার তাৎপর্য কী, তা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, জ্বিনদেরকে অগ্নি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে আর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদেরকে দোযখের ইন্ধন করা হবে, এমন অবস্থায় তাদের শাস্তি কিভাবে হবে?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যদিও তাদেরকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে এবং তাদের দেহ হয়েছে রক্তমাংসের, তাই তাদের শাস্তি হবে সঠিকভাবে।[৩]

১। তফসীরে তবরী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-৭১
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৬০
৩। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৬০

وَّاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۞

'আর যদি তারা সরল-সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে সমৃদ্ধ করতাম'।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সূরার اِنَّا سَمِعْنَا থেকে জ্বিনদের যে কথা শুরু হয়েছে তা পূর্ববর্তী আয়াতে সমাপ্ত হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত থেকে সাধারণতঃ সকল মুশরেকদের সম্পর্কে এবং বিশেষতঃ মক্কার কাফের মুশরেকদেরকে বলা হয়েছে, কেননা মক্কার কাফেরদের উপর তখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছে। তাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, এ কাফেররা যদি শান্তির পথ তথা ইসলাম গ্রহণ করতো, তবে আমি তাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করতাম, তাদের দুর্ভিক্ষ দূর করতাম।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মক্কার কাফেররা যখন সাত বছর ব্যাপী দুর্ভিক্ষের কবলে থাকে তখন এ আয়াত নাযিল হয় এ মর্মে যে, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় পথ তথা ইসলামকে জীবন বিধান রূপে গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাদের প্রতি প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণ করে তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করবো।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষণের যে কথা এ আয়াতে রয়েছে তার তাৎপর্য হলো প্রচুর পরিমাণে তোমাদেরকে রিযক দান করবো, কেননা বারি বর্ষণের মাধ্যমেই খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কোন খাদ্য দ্রব্য আসমান থেকে নেমে আসেনা, বরং পানিই আসে, যা যমীনকে শষ্য-শ্যামল করে তোলে।

অর্থাৎ যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর এবং আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চল, তবে তোমরা লাভ করবে অর্থ-সম্পদ, প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি-অগ্রগতি, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

'আর তারা যদি তওরাত ও ইঞ্জিল এবং যা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে (পবিত্র কোরআন) তা প্রতিষ্ঠিত করতো তবে তারা তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে আহার্য লাভ করতো'। (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ঃ ৬৬)

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط

'যাতে আমি এর দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি'।

অর্থাৎ যদি মানুষ ও জ্বিন জাতি সরল সঠিক পথে থাকে তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে রিয্ক দান করবো, অবশ্য এর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে পরীক্ষা করা, কে আমার নেয়ামতের শোকর গুজার হয় আর কে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয় তা আমি যাচাই করে দেখবো।

সায়ীদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ), আতা এবনে আবি রোবাহ্ (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), কাতাদাহ্ (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আর রবী এবনে আনাস (রঃ), যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ), কালবী (রঃ) এবং এবনে কিসান (রঃ) এ আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি তারা কুফরী ও নাফরমানীর উপর কায়েম থাকে তবে আমি তাদেরকে অধিক পরিমাণে ধন-সম্পদ দান করবো। আর এটিই হবে তাদের জন্যে এক বিরাট ফেতনা। আমি তাদেরকে এমন অবকাশ দেব যে, তারা অর্থ-সম্পদের লোভে মত্ত হয়ে আখেরাত সম্পর্কে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

'অতঃপর যখন তারা ভুলে গেল তাদেরকে প্রদত্ত উপদেশ, তখন আমি তাদের জন্যে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম, অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হলো তা নিয়ে তখন তারা উল্লসিত হলো, তখন তাদেরকে হঠাৎ আমি পাকড়াও করলাম, আর তারা নিরাশ হলো'। (সূরা আনআম, আয়াত ঃ ৪৪)

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞

'যে কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, তিনি তাকে কঠিন আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন'।

যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এ মর্মে যে, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে যারা বিমুখ হবে তাদেরকে

আযাবে এলাহীতে নিক্ষেপ করা হবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

'যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন হবে দুর্বিষহ, আর তাকে অন্ধ অবস্থায় কেয়ামতের দিন পুনরুত্থান করা হবে'। (সূরা তোয়াহা, আয়াত ঃ ১২৪)

পাপাচার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহ পাকের বিধান ভুলে যায়, তাঁর বিধান অমান্য করে, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, দুনিয়াতে তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ আর আখেরাতের শাস্তি হবে আরো কঠোরতর। অন্ধ অবস্থায় তাদের পুনরুত্থান হবে, কেননা দুনিয়াতে তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ দেখেনি, তার উপর আমল করেনি। যদিও সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত থাকে, তাদের নিকট অনেক অর্থ-সম্পদ থাকে এমন অবস্থায় তাদের জীবন দুর্বিষহ কিভাবে বলা যাবে? হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, অর্থ-সম্পদ বেশি হোক বা কম, যেহেতু তাদের জীবনে তাকওয়া পরহেযগারী থাকেনা, সেহেতু তাদের অর্থ-সম্পদেও কল্যাণ থাকেনা। যারা আল্লাহ পাকের পথে থাকেনা, আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল থাকে, তাদের মনে শান্তি থাকেনা, এ অশান্তি ও অকল্যাণের কারণেই তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয় তাদের জীবন থেকে অল্পে তুষ্টি বিদায় নেয়। এজন্যে তারা কখনও তৃপ্তি লাভ করেনা, যত সম্পদই হোক তারা আরো চায়।

দ্বিতীয়তঃ সঞ্চিত সম্পদ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা তদের জীবনকে দূর্বিষহ করে তোলে। এতদ্ব্যতীত পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষের কারণেও জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ওয়ালা, যারা দ্বীনদার, পরহেযগার তারা অল্পে তুষ্ট থাকে, "আরো চাই"-এর হাহাকার তাদের মধ্যে থাকেনা, আল্লাহ পাকের জিকরের মাধ্যমে তাদের অন্তরে প্রশান্তি বিরাজমান থাকে। তারা কারো মুখাপেক্ষী হয়না, অর্থ-লিপ্সা না থাকা, তাদেরকে দ্বারে দ্বারে হাযির হওয়া থেকে রক্ষা করে, সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী করতে থাকে, এমনকি মসিবতের সময়ও তারা সন্তুষ্ট

থাকে, কেননা তারা মুসিবতে সবর করে আল্লাহ পাকের দরবারে সওয়াবের আশা করে। আল্লাহ পাক তাদের দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানকে সার্থক সুন্দর করে দেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۞

'আর মসজিদ সমূহ শুধু আল্লাহ পাকের জন্যে, অতএব তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত কাউকে ডেকোনা'।

আলোচ্য আয়াতের مسٰجد শব্দটি مسجد শব্দের বহুবচন।

তফসীরকারগণ مسجد শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেনঃ

১. অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো সে স্থান সমূহ, যা নামাজ এবং আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়, অর্থাৎ মসজিদ সমূহ। তাই আল্লাহ পাক আদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর যেন কারো বন্দেগী না করা হয়, মসজিদ সমূহের যেন হেফাজত করা হয়। তওহীদের প্রতি ঈমান যেন পরিপূর্ণ থাকে, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কাউকে যেন সেজদা না করা হয়।

২. হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সারা পৃথিবীকে মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

যমীনের যে কোন অংশের উপর নামাজ আদায় করা হয়, তা কবুল করা হয়। সারা পৃথিবী আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, আর সারা পৃথিবীই মসজিদ বা সেজদার স্থান। অতএব, পৃথিবীর কোথাও আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সেজদা করোনা।

৩. সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مسٰجد শব্দটির অর্থ হলো, মানব দেহের সে অঙ্গ সমূহ যা সেজদার সময় ব্যবহৃত হয়। আর তা হলো সাতটিঃ দু' পা, দু' হাটু, দু' হাত এবং চেহারা। এসব অঙ্গের উপরেই সেজদা করা হয়। এসবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। অতএব, মানব দেহের অঙ্গ সমূহকে আর কারো সম্মুখে সেজদা করার জন্যে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ।[১]

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, ইহুদী ও নাসারারা তাদের উপাসনালয়ে হাযির হয়ে আল্লাহর এবাদতের সঙ্গে অন্যদেরকে শরীক করতো। এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন, তোমরা যখন মসজিদে গমন করবে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৬২-৬৩

তখন শুধু আল্লাহ পাকের এবাদত করবে, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই এবাদত করবে, শেরক থেকে মসজিদ সমূহকে পবিত্র রাখবে। ঠিক এমনিভাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শিশুদেরকে ও পাগলদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখ, ব্যবসা-বাণিজ্য মসজিদে অবৈধ, পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদ, চিৎকার পরিহার কর, কোন অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থাও মসজিদে করা হবেনা। জুমআর দিন মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার কর।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, মসজিদে উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ করা, ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ, মসজিদে থুথু ফেলা নিষিদ্ধ।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে তার হারানো উটের খোঁজে এলান করে, যে একথা শুনবে সে যেন বলে, আল্লাহ পাক তোমার উট যেন ফেরত না দেন, কেননা মসজিদ এমন কাজের জন্যে নয়।

এবনে আবি হাতেম আবু সালেহের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জ্বিনেরা আরজ করেছিল, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের জন্যে কি অনুমতি রয়েছে, আমরা আপনার সঙ্গে মসজিদে নামাজের জামাতে হাযির হই? তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা যেন জ্বিনদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা নামাজ পড় কিন্তু মানুষের সাথে মেলামেশা করোনা।

হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন, জ্বিনেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করেছিল, আমরা বাস করি অনেক দূরে, এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আপনার সাথে নামাজ আদায় করি? তখন তাদেরকে বলা হয়, উদ্দেশ্য হলো নামাজ আদায় করা এবং আল্লাহর এবাদত করা, তা যেখানেই হোক।

হযরত একরামা (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতে "মাসাজিদ" কথাটিতে দুনিয়ার সমস্ত মসজিদই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তখন তার কর্তব্য হলো لا اله الا الله বলা, কেননা আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এ আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে না ডাকতে, তাই মসজিদে প্রবেশের সময় কলেমায়ে তায়্যেবা পাঠ করা কর্তব্য। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক আল্লাহর জিকরেরও আদেশ দিয়েছেন।

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞

'আর একথাও জানা গেছে যে, আল্লাহ পাকের বন্দা যখন তাঁকে ডাকতে দন্ডায়মান হয় তখন তাঁর নিকট লোকদের ভীড় জমে যায়'।

আলোচ্য আয়াতে عبد الله (আল্লাহর বন্দা) বলে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর কারণ হলো বিনয় প্রকাশ করা। অর্থাৎ যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজে দন্ডায়মান হতেন, আল্লাহ পাকের এবাদত করতেন, তখন মানুষ তাঁর চারপার্শ্বে একত্রিত হতো। মুসলমানগণ আগ্রহ ভরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একত্রিত হতেন, আর কাফেররা বিদ্রুপ করার জন্যে, তাদের বিদ্বেষের কারণে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আসতো।

তফসীরকার কাতাদা এবং এবনে যায়েদ বলেছেন, তওহীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাতে যখন আল্লাহর বন্দা তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হতেন, তখন জ্বিন ও মানুষ সবই একত্রিত হত, তওহীদের এ আহ্বানকে ব্যর্থ করার জন্যে। তারা আল্লাহ পাকের নূরকে ফুঁক দিয়ে নিস্প্রভ করতে চাইতো। কিন্তু আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল, এ নূরকে ছড়িয়ে দেবেন সর্বত্র, আর দুশমনদের মোকাবেলায় আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সফলকাম করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নাখলা নামক স্থানে যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবাদত করার জন্যে এবং কোরআনে করীম তেলাওয়াত করার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন কোরআনে করীম শ্রবণের আগ্রহ নিয়ে জ্বিনেরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চারপাশে জড় হয়েছিল।

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে শরীক করিনা'।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের বলুন, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, কোন অযৌক্তিক কথাও বলিনি, তোমরা কেন আমার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছ,

আমিতো শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি, আর কাউকে তাঁর শরীক মানিনা, এতে তোমাদের শত্রুতার কি যুক্তি রয়েছে? আমি তো শুধু আমাদের প্রতিপালকের দিকেই তোমাদেরকে ডাকি।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হলো, জ্বিনেরা যখন কোরআনে করীমের আয়াত শ্রবণের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে একত্রিত হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমিতো শুধু আমার প্রতিপালককেই ডাকি, তোমরাও আমার ন্যায় আল্লাহ পাককে ডাক এবং তাঁর দরবারে দোয়া কর এবং তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুকে ডেকোনা, আর আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা।

قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার এবং তোমাদেরকে সৎ পথে আনার ক্ষমতা রাখিনা'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আমি শুধু তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের পথের দিকে আহ্বান করতে পারি, যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দাও তবে তোমাদের ভাল মন্দ কোন কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের লাভ-ক্ষতি, তোমাদের উপকার-অপকার, তোমাদের হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা কোন কিছুই আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, সব কিছুই আল্লাহ পাকের হাতে। যেভাবে হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা মানুষের হাতে নেই, তেমনি লাভ-ক্ষতিও মানুষের হাতে নেই; বরং তা শুধু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করি, আমি তাঁর আশ্রয়ে রয়েছি, আমার কাছে তোমরা এ আশা করোনা যে আমি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো সম্মুখে মাথা নত করবো, তোমাদের লাভ-ক্ষতির মালিক আমি নই। তোমরা যদি আমার সাথে শত্রুতা করতে চাও, আমার ক্ষতি করতে চাও তবে তাতে তোমরা সক্ষম হবেনা, কেননা আমি একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নিকটই আশা করি এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখি।

قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ
اللَّهِ أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ
لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾

তরজমা

(২২) (হে রসূল! আপনি) বলুন, আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, আর তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাবো না।

(২৩) শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পয়গাম আনা এবং তা মানুষের নিকট পৌছানোই আমার কর্তব্য। আর যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের অগ্নি, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(২৪) যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে তখনই তারা উপলব্ধি করবে যে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং সংখ্যায় খুবই অল্প।

(২৫) (হে রসূল! আপনি) বলুন, আমি জানিনা যে তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্যে কোন দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট করবেন।

(২৬) গায়ব বা গোপন রহস্য তিনিই জানেন। তাঁর গোপন রহস্য সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেন না।

(২৭) তাঁর মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহর রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

قُلْ اِنِّىْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا

অর্থাৎ আমি তোমাদের ক্ষতি করার বা হেদায়েত করার শক্তি রাখিনা, আমার কাজ হলো আল্লাহ পাকের মহান বাণী বহন করে আনা এবং তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়া। এ দায়িত্ব পালন করাই আমার কাজ। এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে পারি।

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۞

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যদি আমি ঘটনাচক্রে আল্লাহ পাকের অবাধ্য হই, তবে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না, এমন অবস্থায় আমি কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, কাফেররা আমার কাজ বিনষ্ট করতে একত্রিত হয়, যখন তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে আমাদের জন্যে আযাব নিয়ে আসুন।

অথবা কাফেররা বলে, আপনি দ্বীন ইসলামের তবলীগের যে কাজ করছেন তা থেকে বিরত থাকুন, আমরা আপনাকে আমাদের নিজেদের আশ্রয়ে নিয়ে নেব। এমন অবস্থায় তাদেরকে আমি কি জবাব দেব? সে জবাবের জন্যে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।

অথবা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর দীদার ও মোলাকাতের জন্যে জ্বিনদের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহ লক্ষ্য করলেন তখন তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, জ্বিনদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লাভ-ক্ষতির মালিক, তাই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, আমি লাভ ক্ষতির মালিক নই।

এবনে জরীর হাজরামীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একজন সর্দার তার গোত্রের লোকদের বলেছিল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চান যে, আমরা তাঁকে

আশ্রয় প্রদান করি, এজন্যে আমি তাঁকে আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করলাম, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۞

আর যে কেউ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে, নিশ্চয় তার জন্যে রয়েছে দোযখের অগ্নি। সে চিরকাল তাতে থাকবে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধান মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া আমার দায়িত্ব। আর সে বিধান হলো যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুগত থাকবে, সে হেদায়েত লাভ করবে, তার জীবন-সাধনা সার্থক হবে।

পক্ষান্তরে, যে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে, তার জন্যে রয়েছে দোযখের কঠিন শাস্তি। আর সে শাস্তি সাময়িক হবেনা; বরং হবে চিরস্থায়ী।

حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ

শেষ পর্যন্ত যখন প্রতিশ্রুত বিষয় সমূহ কাফেররা দেখতে পাবে তখনই তারা জানতে পারবে, কাদের সাহায্যকারী অত্যন্ত দুর্বল, আর কারা সংখ্যায় অতি সামান্য।

مَا يُوْعَدُوْنَ

অর্থাৎ 'যে সব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে', এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে।

এক. যারা আল্লাহ পাক ও তার রসূলের নাফরমানী করবে দুনিয়াতেই তাদের শাস্তি হবে, যেমন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের শাস্তি হয়েছে।

দুই. প্রতিশ্রুত বিষয়টি হলো কেয়ামতের দিন।

তিন. এর দ্বারা মৃত্যুর মুহূর্তও উদ্দেশ্য হতে পারে, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যু সে পর্যন্ত হয়না, যে পর্যন্ত না তাকে তার আখেরাতের আবাস-স্থল দেখানো হয়।

অর্থাৎ মুসলমান অথবা কাফের নেককার অথবা বদকার প্রত্যেককে তার মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তার আখেরাতের আবাস-স্থল দেখিয়ে দেয়া হয়। তখন সে অনুধাবন করতে পারে, সাহায্যকারীদের দিক থেকে সে কত দুর্বল!

বস্তুতঃ আল্লাহর নাফরমানদের প্রতি যখন আযাব আপতিত হয় তখন সে তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এ মর্মে যে, কাফেররা আজ যত দৌরাত্মই প্রদর্শন করুক না কেন সেদিন দূরে নয়; যখন তাদের প্রতি আযাব আপতিত হবে, তখন তারা দেখতে পাবে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

قُلْ اِنْ اَدْرِىْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ۞

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি জানিনা যে, তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্যে দীর্ঘ সময় নির্দিষ্ট করবেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, মানুষকে আপনি জানিয়ে দিন, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু কখন আসবে? অতি সত্বরই কি ঘটবে নাকি সুদীর্ঘকাল পরে আসবে, তা এলমে গায়েবের বিষয়। এলমে নবুওয়্যতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, তাই কেয়ামত কবে আসবে তা আমি জানিনা তবে আসবে যে, একথা নিশ্চিতভাবে জানি।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۞

'গায়ব বা গোপন রহস্য তিনিই জানেন, তাঁর গোপন রহস্য সম্পর্কে তিনি কাউকে অবহিত করেন না'।

এলমে গায়ব সম্পর্কে

আল্লাহ পাকই গায়বী খবর রাখেন, অদৃশ্য জগতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আর কারো নেই। আর গোপন রহস্য সম্পর্কে কাউকে তিনি অবহিত করেন না।

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۞

'তাঁর মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত, সেক্ষেত্রে আল্লাহর রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন'।

অর্থাৎ এলমে গায়ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই বৈশিষ্ট। কিন্তু যদি আল্লাহ পাক কোন রসূলকে মনোনীত করেন, তবে যতখানি তিনি রসূলকে জানাতে চান তা সেই রসূলকে জানিয়ে দেন।

আলোচ্য আয়াতের غيب শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে বিষয়কে যা এখনও প্রকাশ পায়নি। যেমন আখেরাতের যাবতীয় বিষয়, কেননা তা এখনও প্রকাশ পায়নি। অথবা এমন সব বিষয় যা ঘটে গেছে কিন্তু তার কোন স্বাক্ষর রেখে যায়নি। যেমন সৃষ্টির আদি যুগের কথা, যা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি।

অথবা غيب শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে আল্লাহ পাকের সেই পবিত্র নাম সমূহ এবং গুণাবলী যা বন্দাদের জানা নেই, আর কোন দলিল প্রমাণ দ্বারাও তার সন্ধান পাওয়া যায়না। কিন্তু যে বিষয়ের উপর দলিল কায়েম করা যায়, যেমন আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, আল্লাহ পাকের চিরস্থায়ী হওয়া, সকল দোষ-ত্রুটি থেকে তাঁর মুক্ত হওয়া, এসব গায়ব নয়, কেননা এসব বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান রয়েছে। এমনিভাবে এ জগত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিষয়, গায়েব নয়। এ সব বিষয়ের দলিল-প্রমাণ রয়েছে। বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তা-ই বিশ্বের ক্ষণস্থায়ী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর কোন কোন বস্তু বিভিন্ন কারণে গায়ব বলে প্রমাণিত হয়, আর কোন ক্ষেত্রে তা গায়ব হয়না, যেমন জ্বিনদের অবস্থা। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে মানুষের চক্ষুর আড়াল হওয়ার কারণে তা গায়ব, কিন্তু জ্বিনদের জন্যে তা গায়ব নয়। এজন্যেই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যুগে কিছু লোক মনে করতো জ্বিনেরা গায়ব জানে। অথচ এমন বহু কিছু আছে যা মানুষের নিকট গায়ব, কিন্তু জ্বিনদের সম্মুখেই তা থাকে। এজন্যে জ্বিনদের যে এলম তা প্রকাশ্য এলম এবং প্রকাশ্য বিষয়ের এলম। এ ধরণের এলম যা কখনও ওহী বা এলহাম দ্বারা অর্জিত হয়। আর কখনও গায়বী এলমের মধ্যে এবং বিশেষ কোন ব্যক্তির মধ্যে যে আড়াল থাকে তা সরিয়ে দেয়া হয়।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি হাজর নামক স্থানে ছিলাম, আর কোরায়শরা আমাকে শবে মে'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল, এমনকি তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের ব্যাপারে আমাকে এমন কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেছে যা আমার সঠিকভবে স্মরণ ছিলনা, তখন আমার এমন দুশ্চিন্তা হয়েছিল, যা আর কখনও হয়নি। এরপর আল্লাহ পাক আমার মাঝে এবং বায়তুল মোকদ্দাসের মাঝে যে আড়াল ছিল তা সরিয়ে দিয়েছেন, তখন তারা যা জিজ্ঞাসা করতো, আমি দেখে দেখে তা বলতাম।

বায়হাকী হযরত আবু ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, খলিফাতুল মোসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) ইরাকে অভিযানের জন্যে একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ

করেন। তাঁদের সেনাপতি ছিলেন হযরত সারিয়া (রাঃ)। একদিন মদীনা মোনাওয়্যারার মসজিদে নববীতে মিম্বরে দন্ডায়মান অবস্থায় জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। আর সেখান থেকে তিনি বলছিলেন, হে সারিয়াহ! পাহাড়ের দিকে থাক। প্রকৃত অবস্থা এই ছিল, হযরত সারিয়াহ (রাঃ) তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুশমনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, দুশমন সম্মুখে ছিল কিন্তু তারা তাদের একভাগকে মুসলমানদের পেছনে প্রেরণ করলো। ফলে সামনে এবং পেছনে দুশমনদের থাকার কারণে মুসলমানদের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। ঐ মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায়ে মোনওয়্যারার মসজিদে নববী থেকে নির্দেশ দিলেন, হে সারিয়াহ! পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর, দুশমনকে পেছন থেকে আক্রমণ করার সুযোগ দিওনা। এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১. হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা শরীফে, যুদ্ধ হচ্ছিল ইরাকে, দূরত্ব ছিল ১২০০শ' মাইলের। আল্লাহ পাক হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে ইরাকের রণাঙ্গনে মুসলমানদের অবস্থা দেখার তৌফিক দিয়েছিলেন।

২. খলিফাতুল মুসলেমীন যে নির্দেশ হযরত সারিয়াহকে (রাঃ) দিয়েছিলেন, তিনি তা শ্রবণ করেছিলেন এবং সে নির্দেশ মোতাবেক যুদ্ধ করে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। একমাস পরে যখন তিনি বিজয়ী হয়ে মদীনা মোনাওয়্যারায় প্রত্যার্তন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি খলিফাতুল মুসলেমীনের নির্দেশ শ্রবণ করেছিলাম।

আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে এটি খুবই সহজ ব্যাপার। কিন্তু চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তা ছিল অকল্পনীয়, এটি ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর আধ্যাত্মিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, যা প্রকাশ্যে দেখা যায়না, আল্লাহ পাক খলিফাতুল মুসলেমীনকে তাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ঠিক এমনিভাবে মক্কা শরীফ থেকে প্রায় ৭০০শ' মাইল দূরে বায়তুল মোকাদ্দাস অবস্থিত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আল্লাহ পাকের নির্দেশে বয়তুল মোকাদ্দাস তুলে ধরা হয়েছিল, যা ছিল অদৃশ্য, তাকে দৃশ্যমান করা হয়েছিল। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল মোকাদ্দাস দেখে দেখে কাফেরদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর ইন্তেকালের পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর ইন্তেকালের খবর দিলেন এবং তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করলেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখেছিলেন।

ইমাম আবু দাউদ (রঃ) উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, নাজ্জাশীর ইন্তেকালের পর আমরা আলোচনা করতাম যে, নাজ্জাশীর কবরে একটি নূর দেখা যায়। আল্লাহ পাক তাদেরকে সেই আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেছিলেন যা অদৃশ্য বা গায়ব ছিল, তা তাদের সম্মুখে ছিল দৃশ্যমান।

হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে একটি ঘটনা ইমাম মালেক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে পাঁচ মন খেজুর দান করেছিলেন, যা খেজুর বৃক্ষে ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেগুলো গাছ থেকে ছিড়ে বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেননি। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে আমার নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় আর কেউ নেই, আমি তোমাকে যে পাঁচ মন খেজুর দিয়েছিলাম যদি ঐ খেজুরগুলো তুমি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে, তবে অবশ্যই খেজুরের মালিকানা তোমারই হত, কিন্তু এখন (আমার মৃত্যুর পর) ঐ খেজুরগুলো আমার সকল উত্তরাধিকারীর সম্পদ, তোমার দু' ভাই এবং দু' বোনের মধ্যে কোরআনে করীমের নির্দেশ মোতাবেক ভাগ করে দিও। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, আব্বাজান! যদি খেজুর আরো বেশিও হত, তবু আমি ঐ দান গ্রহণ না করে সবার মধ্যে এ খেজুর বিতরণ করে দিতাম, কিন্তু আমার বোন শুধু আসমা, একজনই, আপনি দু' বোন কেন বললেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, বিনতে খারেজা তথা তোমার মায়ের গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, তাকে আমি কন্যা দেখছি। কিছু দিনের মধ্যেই উম্মে কুলসুম জন্ম গ্রহণ করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে অদৃশ্য বিষয় দেখিয়ে দেন, কোন কোন ঘটনা জানিয়ে দেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ওফাত কি বারে হয়েছিল? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সোমবার দিন। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমিও এই জিনিসটির আশা করছি এক রাত পর। হযরত আবু বকর (রাঃ) মঙ্গলবার দিবাগত রাতেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে ওসিয়ত করলেন, আমার জানাজা আদায়ের পর আমার লাশকে নিয়ে তোমরা রওজায়ে পাকের সম্মুখে হাযির করবে, যদি রওজায়ে পাকের বন্ধ দরজা আপনা আপনিই খুলে যায়, তবে আমাকে সেখানেই দাফন করবে। যদি সেভাবে না খোলে তবে জান্নাতুল বাকীতে দাফন

করবে। অবশেষে ঘটনা তাই হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম জানাযার পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর লাশ কাঁধে করে রওজা শরীফের সম্মুখে আনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ দরজা আপনা আপনিই খুলে যায়। তখন তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়। আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ গায়বী জ্ঞান বা গোপন রহস্য সম্পর্কে আল্লাহ পাক সাধারণতঃ কাউকে অবহিত করেন না, কিন্তু আল্লাহ পাক যাকে পছন্দ করেন এবং এজন্যে মনোনীত করেন, তাকে তিনি অবহিত করেন।

فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا

'সেক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর ওহীর হেফাজতের জন্যে চতুর্দিকে প্রহরী হিসেবে ফেরেশতা নিযুক্ত করেন, যেন শয়তান কোন কিছু চুরি করে শ্রবণ করতে না পারে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন কোন নবী প্রেরণ করতেন তখন ইবলীস শয়তান ফেরেশতাদের আকৃতি ধারণ করে সেই নবীর নিকট হাযির হতো এবং নিজের তরফ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছে দিত। শয়তানের এ কারসাজি বন্ধ করার জন্যে আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে প্রহরী নিযুক্ত করলেন, ফলে ওহীর বাহক ফেরেশতার নিকটও শয়তান আসতে পারতো না।

ওলামায়ে কেরামের ফজিলত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। – (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, এবনে মাজা)

হযরত আনাস (রাঃ), এবনে আদী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলেমগণ পৃথিবীতে প্রদীপ এবং নবী রসূলগণের উত্তরাধিকারী। অথবা তিনি এরশাদ করেছেন, আলেমগণ আমার উত্তরাধিকারী এবং আম্বিয়ায়ে কেরামেরও উত্তরাধিকারী।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হল, নবী রসূলগণের মধ্যে যাকে আল্লাহ পাক মনোনীত করেন, তাকে কোন কোন গায়বী বিষয় জানিয়ে দেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো, আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সমূহ প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোযেজা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেহেতু খাতেমুন নাবিয়্যীন বা সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসার সম্ভাবনা নেই, অথচ তাঁর দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে, তাই তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উত্তরাধিকারী আলেমগণের উপর, আউলিয়ায়ে কেরামের উপর। এজন্যে আউলিয়ায়ে কেরামের দ্বারা যে সব কারামত প্রকাশিত হয়, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতেই হয়। তবে আউলিয়ায়ে কেরামের যে এলহাম বা কাশফ হয় তা সম্পূর্ণ একিনী হয়না। এজন্যে নিয়ম হল, কোরআন ও হাদীস শরীফ দ্বারা তা যাচাই করে নেয়া। যদি কোরআন ও হাদীস মোতাবেক হয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত। যদি কোরআন ও হাদীসের খেলাফ হয় তবে তা গ্রহণ করা উচিত নয়।[১]

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ
وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৮) যাতে করে আল্লাহ পাক জেনে নেন যে, রসূলগণ তাঁদের পরওয়ারদেগারের মহান বাণী পৌঁছিয়েছেন। আর আল্লাহ পাক তাদের সকল অবস্থা পরিবেষ্টন করে আছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যার হিসাব রাখেন।

তফসীরুল কোরআন

لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের মহান বাণীর হেফাজতের জন্যে তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রহরী নিযুক্ত করেছেন, আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এ ব্যবস্থার কারণ এই, যাতে করে আল্লাহ পাক প্রকাশ্যে জেনে নেন যে, রসূলগণ তাঁদের পরওয়ারদেগারের মহান বাণী সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন, তাতে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়নি, কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি, আল্লাহ পাকের ওহীর হেফাজতের লক্ষ্যেই মূলতঃ ফেরেশতাগণকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৯-৪০

তফসীরকারগ رسلت শব্দটির দু'টি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১. নবী রসূলগণ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের যে মহান বাণী পেয়েছেন, তা সঠিকভাবে বন্দাদের নিকট তাঁরা পৌঁছিয়েছেন কি-না তা তিনি যেন জানতে পারেন, এ লক্ষ্যেই ফেরেশতাগণকে ওহীর প্রহরায় নিযুক্ত করেছেন।

২. কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ফেরেশতাগণ নবী রসূলগণের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী সঠিকভাবে পৌঁছিয়েছেন কি-না, তা যেন তিনি জেনে নেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাক সব কিছু সম্পর্কে এলম রাখেন, কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। এক্ষেত্রে জানার তাৎপর্য হলো বাস্তবে যা কিছু ঘটে, তার এলম প্রকাশ পাওয়া।

যেমন অন্য আয়াতে কথাটি এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ

'যেন আল্লাহ পাক জেনে নেন কে তাঁকে না দেখে ভয় করে'।

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

মূলতঃ সঠিকভাবে যেন আল্লাহ পাকের মহান বাণী ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁর নবী রসূলগণের নিকট পৌঁছে এবং নবী রসূলগণের মাধ্যমে তাঁর বন্দাদের নিকট পৌঁছে, এজন্যে ওহীর হেফাজত করা হয় ফেরেশতাগণের মাধ্যমে। ফেরেশতাদের প্রহরী দল সর্বদা ওহীর হেফাজতে নিয়োজিত থাকেন। আর ফেরেশতাগণের নিকট যে এলম প্রদান করা হয় তাকে আল্লাহ পাক পরিবেষ্টন করে রাখেন। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকেনা, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে থাকে। আর সব কিছুই থাকে তাঁর আয়ত্তে।

وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ۞

'আর আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি বস্তুর সংখ্যার হিসাব রাখেন'।

পাহাড়ের সংখ্যা এবং ওজন, সমুদ্রের পরিমাপ, বৃষ্টির ফোটার সংখ্যা, বৃক্ষগুলোর পাতার সংখ্যা এক কথায় পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন। রাতের অন্ধকারে অথবা দিনের আলাতে যা কিছু হয়, সবই তিনি জানেন।

পয়গম্বরগণের আমানতদারী, সততা, এবং দায়িত্ববোধ সব কিছু সম্পর্কেই আল্লাহ পাক অবগত, এমনিভাবে ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণের শক্তি-সামর্থ্যও সন্দেহাতীত। সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট সুস্পষ্ট, প্রতিভাত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুয্যাম্মেল

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ عِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ﴿۱﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ﴿۲﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ
مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ﴿۳﴾ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ﴿۴﴾ اِنَّا
سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ؕ﴿۵﴾ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ
اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ؕ﴿۶﴾ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا
طَوِيْلًا ؕ﴿۷﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ؕ﴿۸﴾
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ﴿۹﴾
وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴿۱۰﴾ وَ
ذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ﴿۱۱﴾ اِنَّ
لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۙ﴿۱۳﴾ يَوْمَ
تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ﴿۱۴﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ
اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ؕ﴿۱۵﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী!

(২) রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকুন, তবে অল্পকাল (সমস্ত রাত নয়),

(৩) অর্ধরাত অথবা তা থেকে সামান্য কম সময়।

(৪) অথবা তা থেকে সামান্য বেশী সময়। আর কোরআনকে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে পাঠ করুন,

(৫) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি এক অত্যন্ত দুর্বহ বাণী নাযিল করছি।

(৬) নিশ্চয় রাতের উত্থান খুবই কঠিন, আত্মসংযম এবং বাক্য সংশোধন হবার পক্ষে অতি উত্তম।

(৭) (হে রসূল!) নিশ্চয় দিনের বেলায়ও রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।

(৮) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন এবং সব কিছু ত্যাগ করে তাঁর দিকে ছুটে আসুন।

(৯) তিনিই মাশরেক এবং মাগরেবের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, অতএব শুধু তাঁকেই সব কিছুর কর্মকর্তা বলে গ্রহণ করুন।

(১০) আর কাফেরদের বাক্য-বাণে সবর অবলম্বন করুন এবং তাদের থেকে উত্তম ভাবে দূরে থাকুন।

(১১) আর আমাকে এবং ঐ সুখী-সমৃদ্ধশালী মিথ্যাজ্ঞানকারীদের ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে চলুন।

(১২) নিশ্চয় আমার নিকট (তাদের জন্যে) শেকল এবং অগ্নিকুন্ড রয়েছে,

(১৩) আর এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় ও কঠিন আযাব রয়েছে।

(১৪) (সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন পৃথিবী এবং পাহাড়-পর্বত কেঁপে উঠবে এবং পর্বত সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালু স্তূপের ন্যায় হয়ে যাবে।

(১৫) আমি ঠিক সেভাবেই তোমাদের নিকট এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের অবস্থা বর্ণনা করবেন, যেমন রসূল প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের নিকট।

সূরা মুয্যাম্মেল প্রসঙ্গে

এ সূরা সম্পূর্ণই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, এ মত হলো হাসান বসরী (রঃ), একরামা (রঃ) এবং আতা (রঃ)-এর।

অবশ্য হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর মতে, দু' আয়াত ব্যতীত সূরার অবশিষ্ট আয়াত সমূহ মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এ সূরায় দু' রুকু ও ২০ খানি আয়াত রয়েছে। এর বাক্য সংখ্যা ২৮৫ এবং অক্ষর সংখ্যা ৮৩৮।

সূরা কলমের পর এ সূরা নাযিল হয়।

মূল বক্তব্য

এ মোবারক সূরায় বিশেষভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান পূতঃ পবিত্র জীবনের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে তিনি সৃষ্টি থেকে দূরে সরে স্রষ্টার ঘনিষ্ঠতর মকামে পৌঁছতেন। মানুষ যখন আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নিজ জীবনের আরাম-আয়েশকে সম্পূর্ণ ভুলে যায় এবং নিজের জাগতিক সকল প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন হয়, সে অবস্থা হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার উচ্চতর মকাম। এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা মুয্যাম্মেল। আর এ সূরার শেষার্ধে রাত্রি জাগরণ করা এবং আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান থাকার গুরুত্ব এবং বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, মক্কার কাফেররা যদি ঈমান না আনে তবে আপনি অস্থির ও ব্যাকুল হবেন না, সবর অবলম্বন করুন। আপনাকে যদি তারা মন্দ বলে তবু আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। পাপীষ্ঠরা কোন দিনই আল্লাহ পাকের আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

এ সূরার ফজিলত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে সুখে শান্তিতে রাখবেন এবং দোযখের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করবেন।

সর্বদা এ সূরা পাঠ করলে স্বপ্নে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জেয়ারত লাভ করবে। এ সূরা পাঠ করে হাকীমের নিকট উপস্থিত হলে, হাকীম সহৃদয় ব্যবহার করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ সূরা বিপদের সময় পাঠ করলে, বিপদ দূর হবে। প্রত্যহ সাত বার পাঠ করলে রিয্ক বৃদ্ধি পায়।

এ সূরার আমল

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সূরা মুয্যাম্মেল পাঠ করলে রিযক বৃদ্ধি পায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর পন্থা নির্দিষ্ট করেছেন। চল্লিশ দিন যাবত প্রতি দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ১১ বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, এরপর ১১শ' বার "ইয়া মুগনিউ্য" পাঠ করবে, এরপর এগার বার সূরা মুয্যাম্মেল পাঠ করবে, পুনরায় এগার বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

যে ব্যক্তি এ আমল করবে, আল্লাহ্ পাক গায়ব থেকে তাকে সাহায্য করবেন।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে সূরা মুয্যাম্মেল পাঠ করতে দেখবে, তার অভাব-অনটনের পর রিয্ক বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় জ্বিনদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে করীম শ্রবণ করে কিভাবে তারা মুগ্ধ হয়েছিল এবং তার উপর ঈমান এনেছিল, তার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

আর এ সূরায় মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে যে অন্যায়-আচরণ করে, তার বিবরণ দিয়ে তাঁকে সবর অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

শানে নুযুল

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একবার মক্কার মুশরেকরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোন অপ্রিয় নামে ডাকার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করে, যেন সেই নামে তিনি প্রসিদ্ধ হন, এ পর্যায়ে কেউ কেউ প্রস্তাব দেয় তাঁকে "কাহেন" বা গণক বলা হোক, কিন্তু অন্যরা তার বিরোধিতা করে বললো, তিনি গণক নন, অন্য এক দল বললো, তাঁকে উন্মাদ বা পাগল বলা হোক। তখন অন্য একটি দল এর বিরোধিতা করে বললো, তিনি তো পাগল নন, তখন তারা বললো, তাঁকে "সাহের" বা যাদুকর বলা হোক। কিছু লোক বললো, তিনি যাদুকরও নন। এসব উক্তি শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন আহত হলে তিনি একটি কম্বল গায়ে দিয়ে শয়ন করলেন। সে মুহূর্তে আল্লাহ পাক তাঁকে সম্বোধন করে يَا يُّهَا الْمُزَّمِّلُ (হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী) বলে ডাকলেন।

এর দৃষ্টান্ত হলো একবার হযরত আলী (রাঃ) কোন কারণে মনক্ষুন্ন হয়ে মসজিদে নববীর আঙিনার মাটিতে শুয়ে পড়েছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলীর সন্ধান করে বললেন, আলী কোথায়? এরপর তিনি এসে দেখলেন হযরত আলী (রাঃ) মাটিতে শুয়ে আছেন। তিনি স্বীয় দস্তে মোবারক দ্বারা হযরত আলীর দেহে মিশ্রিত মাটি পরিস্কার করলেন এবং বললেন, قم يا اباتراب হে আবু তোরাব! দাঁড়াও।

হযরত আলী (রাঃ)-কে সস্নেহে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে ডাক দিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাঁর আন্তরিক স্নেহ উপলব্ধি করে ঘটনাটি আজীবন স্মরণ রেখেছেন।

ঠিক এমনিভাবে যখন কাফেরদের মন্দ কথায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তর আহত ছিল, তখন নিতান্ত স্নেহের ভাব প্রকাশ করে আল্লাহ পাক তাঁকে يٰايها المزمل বলে তিনি ডাক দিলেন। এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ স্নেহ-মমতার বহিঃপ্রকাশ হলো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনের কষ্ট দূরীভূত হলো।[১]

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ আরও ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। সূরা মুয্যাম্মেল নবুওয়্যতের প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। বর্ণিত আছে, সে যুগে ওহীর দুর্বহ ভারে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক কাঁপতে থাকত, এমনকি প্রচন্ড শীতেও তাঁর দেহ মোবারক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তখন তিনি তাঁর দেহ মুবারককে মোটা কাপড় বা কম্বল দ্বারা জড়িয়ে দেয়ার জন্যে বলতেন। এমন এক সময়েই আলোচ্য সূরা নাযিল হয়। আল্লাহ পাক তাঁকে يٰا يها المزمل বলে সম্বোধন করেন।

এ পর্যায়ে বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হারেস এবনে হিশাম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তুহীন শীতেও তাঁর পেশানী মোবারক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এমনকি যখন কোন সওয়ারীর উপর তিনি আরোহন করতেন তখন ঐ সওয়ারী ওহীর ভার সইতে পারতো না। একবার তাঁর

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৫০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১০১
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৫০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৯৮

উরু মোবারক হযরত যায়েদ এবনে সাবেতের (রাঃ) হাঁটুর উপর ছিল, এমন সময় ওহী নাযিল হলো, তখন হযরত যায়েদ এবনে সাবেতের (রাঃ) অবস্থা এই ছিল, তাঁর মনে হয়েছে তাঁর উরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ওহী নাযিল হওয়ার এমনি অবস্থায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিতেন। তখন এ সূরা নাযিল হয়।

তফসীরুল কোরআন

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۞

হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী! রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকুন, তবে অল্পকাল তথা সমস্ত রাত নয়, অর্ধ রাত অথবা তা থেকে সামান্য কম সময় অথবা তা থেকে সামান্য বেশী সময়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে قم শব্দটির অর্থ শুধু দাঁড়িয়ে থাকা নয়; বরং এর অর্থ হলো নামায আদায় করা।

اِلَّا قَلِيْلًا

তবে অল্পকাল, সমস্ত রাত নয়।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, সারা রাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার হুকুম নেই; বরং রাতের কিছু অংশ, আর সে অংশ কতখানি তা অস্পষ্ট রয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

نِصْفَهٗٓ

'অর্ধ রাত'।

اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا

'অর্ধ রাত থেকে সামান্য কম'।

অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযে অর্ধ রাতই অতিবাহিত করতে হবে তা-ও নয়, বরং তার চেয়ে কিছু কম হলেও চলবে। আর অর্ধ রাতের কম হতেই হবে এমনও নয় বরং

اَوْزِدْ عَلَيْهِ

'অথবা তা থেকে সামান্য বেশী সময়'।

অর্থাৎ অর্ধ রাতের চেয়ে বেশী যদি অতিবাহিত কর তবে তা-ও উত্তম।

আলোচ্য আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের যে আদেশ রয়েছে তা রাতের চারভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশী হতে হবে। এখানে উল্লেখ্য, ইসলামের শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের উপর তাহাজ্জুদের নামায ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে ওয়াজিব হওয়ার এ আদেশ রহিত হয়েছে। যেহেতু তখন সময় নির্ণয় করা সম্ভব ছিল না, রাতের কতখানি সময় অতিবাহিত হয়েছে তা জানা যেত না, তাই অনেককেই সারা রাত নামাযে দন্ডায়মান থাকতে হতো। এজন্যে তাঁদের পা ফুলে যেতো। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য সূরার শেষার্ধে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (অতএব তোমাদের পক্ষে যা সহজ হয় তা পাঠ কর।) বলে তাঁর বন্দাগণের প্রতি দয়া করেছেন এবং ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়েছে। এখন এটি সুন্নতের পর্যায়ভুক্ত রয়েছে।

সায়ীদ এবনে হিশাম বর্ণনা করেনঃ আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং আরজ করলাম, হে উম্মুল মুমেনীন! আমাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো কোরআন, আমি আরজ করলাম, আমাকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রাতের এবাদত সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন, তুমি সূরা يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ পাঠ কর না? আমি আরজ করলাম পাঠ করি। তখন তিনি বললেন, এ সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক তাহাজ্জুদের নামায ফরজ করেছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এক বছর যাবত এ আদেশ পালন করতে থাকেন। এমনকি তাঁদের পা ফুলে যায়, অবশেষে এ সূরার শেষের দিকে এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় এবং তাহাজ্জুদের নামায নফল হয়ে যায়। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

বগভী, হাকেম এবং এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

মোকাতেল এবং এবনে কিসান (রঃ) বর্ণনা করেনঃ এ ঘটনা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হবার পূর্বের, যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হয়ে যায় তখন তাহাজ্জুদের নামায ফরজ হওয়া রহিত হলো।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আমার মতে তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়ার বিষয়টি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই কোন কোন সাহাবী তা যথানিয়মে আদায় করতেন, আর কেউ করতেন না। যদি সবার জন্যে ফরজ হতো তবে সকলেই তা আদায় করতেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাহাজ্জুদ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরই ফরজ ছিল। কিন্তু উম্মতের দুর্বলতার কারণে তাকে সহজ করা হয়েছে, কেননা যদি কোন আমল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা করেন (ফরজ হোক বা নফল) তার অনুসরণ করা সুন্নত, আর তা বর্জন করা আযাবের কারণ হতে পারে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

'আল্লাহ পাকের রসূলের পূতঃপবিত্র জীবনে অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছে মহান আদর্শ, সে ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে'।

যাহোক, আয়াতের ব্যাখ্যা হলোঃ (হে রসূল!) আপনি রাতে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে থাকুন। যদি সমস্ত রাত তা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়, রাতের কিছু অংশে আপনাকে বিশ্রাম করতে হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۞

'আর কোরআনকে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে পাঠ করুন'।

অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযে বা অন্য যে কোন সময় কোরআনে করীম তরতীলের সঙ্গে তথা খুব ধীরে ধীরে সুন্দর করে পাঠ করবেন এবং প্রত্যেকটি শব্দ ও অক্ষর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

يقال لصاحب القران اقرء وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا-الحديث

কেয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পর কোরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি কোরআন পাঠ করতে থাক এবং উপরের দিকে আরোহন করতে থাক। এবং ধীরে ধীরে কোরআনে করীম পাঠ করতে থাক, কেননা জান্নাতে তোমার বাসস্থান সেখানেই হবে যেখানে তোমার কোরআনে করীমের আয়াত পাঠ করা শেষ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমের তরতীলের অর্থ হলো প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট করে পাঠ করা।

হাসান বসরী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন যে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে কোরআনে করীমের তেলাওয়াত করতেন? তখন তিনি বলেছেন, টেনে টেনে পাঠ করতেন। এরপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে দেখিয়ে দিলেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিভাবে পাঠ করতেন। তিনি আল্লাহ আর রহমান, আর রাহীম শব্দ সমূহকে বেশ টেনে পাঠ করেছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোরআনে করীম পাঠের রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেছেন, তিনি প্রত্যেকটি অক্ষরকে সুস্পষ্ট ভাবে পাঠ করতেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) একথাও বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতেহার আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করে থেমে যেতেন। আর রাহমানীর রাহীম পাঠ করেও থেমে যেতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক কোন জিনিসকে এতটা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করেন না, যতটা কোন নবী যখন মধুর কণ্ঠে কোরআনে করীম পাঠ করেন, তা শ্রবণ করেন।[১] (বোখারী, মুসলিম)

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা কোরআনে করীমকে আরবদের পাঠ-রীতি মোতাবেক পড়, ইহুদী নাসারাদের সুর পরিহার কর।

কোরআনে করীম পাঠের কয়েকটি আদব

কোরআনে করীমের নসিহত সমূহের উপর চিন্তা করা, যে সব আয়াতে আযাবের কথা রয়েছে সেগুলো পাঠ করার সময় ভীত হওয়া এবং সওয়াবের আয়াত সমূহ পাঠের সময় আশাবাদী হওয়া।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোরআনে করীমকে কবিতার মত পাঠ করোনা, যেখানে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৫

বিস্ময়কর কথা আছে সেখানে থেমে যাও এবং মনের উপর কোরআনের মহান শিক্ষার প্রভাব বিস্তার কর। কোন সূরাকে শেষ করাই মকসুদ মনে করোনা।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছি, তিনি যখনই জান্নাত সম্পর্কীয় আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি থেমে যেতেন এবং জান্নাতের জন্যে আরজী পেশ করতেন, এমনিভাবে যখন দোযখ সম্পর্কীয় আয়াত তেলাওয়াত করতেন তখনও থেকে যেতেন এবং দোযখ থেকে পানাহ চাইতেন।

হযরত ওবায়েদ মালেকী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা দিবা-রাত্রি কোরআনে করীমের তেলাওয়াত করতে থাক এবং তেলাওয়াতের হক্ব আদায় কর, কোরআনকে ছড়িয়ে দাও, কোরআনে করীমকে মধুর কণ্ঠে পাঠ কর, কোরআনে করীমের আলোচ্য বিষয়ের উপর চিন্তা ও গবেষণা কর, যাতে করে তোমরা সাফল্য অর্জন কর, আর কোরআনে করীমের তেলাওয়াতে তাড়াহুড়া করোনা। কোরআনে করীমের তেলাওয়াতে সওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী)

হযরত সাহল এবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা পবিত্র কোরআন পাঠ করছিলাম, এমন সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হয়। তিনি এরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের কিতাব একটিই, তোমাদের মধ্যে আলেমগণও রয়েছে তোমাদের মধ্যে সাদা-কালোও রয়েছে, তোমরা কোরআন পাঠ কর সে-যুগের পূর্বে, যখন এমন লোকেরা আসবে যারা কোরআন পাঠ করবে আর এভাবে অক্ষরগুলো আদায় করবে, যেমন তীরকে সোজা করা হয় কিন্তু কোরআন তাদের কণ্ঠনালীর আগে যাবেনা। তারা কোরআনে করীম পাঠের নগদ বিনিময়ের প্রার্থী হবে (অর্থাৎ আখেরাতের সওয়াবের প্রার্থী হবেনা)।

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۞

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত দুর্বহ বাণী নাযিল করেছি'।

আলোচ্য আয়াতের قولا ثقيلا অর্থ দুর্বহ বোঝা, এ দুর্বহ বোঝা কি? এর জবাবে তফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, তা হলো কোরআনে করীম, কেননা এতে রয়েছে অনেক বিধি-নিষেধ, রয়েছে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি এবং দোযখের ব্যাপারে

সতর্কবাণী, আর এতে কেয়ামতের আলোচনা স্থান পেয়েছে। পবিত্র কোরআনের এসব বিধানের উপর আমল করা সহজ নয়; সুকঠিন, বিশেষতঃ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে কোরআনে করীম অধিকতর কঠিন, কেননা কোরআনে করীমের বিধান মেনে চলার আদেশ সকলের ন্যায় তাঁর প্রতিও রয়েছে। আর উম্মতের দ্বারা কোরআনে করীমের প্রতি আমলের দায়িত্বও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অর্পিত হয়েছে। আল্লাহ পাক কোরআনে করীম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়েছেন, আর সমগ্র উম্মতের নিকট কোরআনে করীম পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর, অতএব নিঃসন্দেহে এ দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। এ মত পোষণ করেছেন তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)। তফসীরকার কাতাদা (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

তফসীরকার আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমে ঈমান ও তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনকারীদের জন্যে প্রতিশ্রুতি, আর আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞদের জন্যে রয়েছে সতর্কবাণী, এ কারণে কোরআনে করীম অত্যন্ত কঠিন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের قولا ثقيلا দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাহাজ্জুদের নামাযকে, কেননা রাতের শেষ প্রহরে ওঠা এবং নামাজ আদায় করা অত্যন্ত কঠিন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা কোরআনে করীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেছেন, কোরআনে করীম মুনাফেকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। যেমন অন্য আয়াতে মুশরেকদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ

'(হে রসূল!) আপনি মুশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান করছেন, তা তাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন'।

আর হাসান এবনে ফজল (রঃ) বলেছেন, কাল কেয়ামতের দিন এ কোরআন নেক আমলের পাল্লাকে ভারি করে দেবে। যেমন বোখারী শরীফে সংকলিত সর্বশেষ হাদীসে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দু'টি বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করতে খুব সহজ, কিন্তু নেক আমলের পরিমাপকারী

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১০৪
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৬

পাল্লাকে ভারি করে দেবে, আর বাক্য দু'টি দয়াময় আল্লাহ্ পাকের অত্যন্ত প্রিয়, তা হল সোবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহী, সোবহানাল্লাহিল আযীম।[১]

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে সূরা হুদ এবং তার সাথের সূরাগুলো বৃদ্ধ করে ফেলেছে। (তেবরানী)

তিনি এর কারণও বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার প্রতি আদেশ হয়েছে,

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ

(হে রসূল!) আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে সেভাবে আপনি সুদৃঢ় থাকুন। এ আদেশের কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক সাদা হয়ে গেছে।

আর এর আরও একটি অর্থ হল, এ সূরায় কেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে এবং এ সূরায় রয়েছে, পূর্বকালের সেই জাতিগুলোর কথা যাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হয়েছে। আর এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, কোরআনে করীম দুর্বহ বোঝা বা কঠিনতর হওয়ার আরও একটি কারণ হল, ওহী যখন নাযিল হত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি উষ্ট্রীর উপর থাকতেন, তখন উষ্ট্রীটি বসে পড়তে বাধ্য হত।

এমনিভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যখন তুহিন শীতেও ওহী নাযিল হতো, তখন তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন।

আর ফররা (রঃ) বলেছেন, যেহেতু এটি আল্লাহ্ পাকের কালাম আর তিনি মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি মহা পরাক্রমশালী, তাই পবিত্র কোরআন তথা তাঁর মহান বাণী, তাঁর বন্দাদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন।

আর আবু আলী ফারেসী বলেছেন, কোরআনে করীম কঠিন হলো মুনাফেকদের ব্যাপারে, কেননা তারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবী করতো অথচ প্রকৃত অবস্থায় তারা ঈমানদার ছিলনা, তাই তাদের জন্যে কোরআনে করীমের উপর আমল করা কঠিন ছিল।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৫৬
তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৭৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৭৪-৭৫

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে যেতেন, তাঁর চেহারা মোবারকের বর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যেত।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ওহী যখন নাযিল হত তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাথা ঝুঁকিয়ে নিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামও। যখন ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা শেষ হত তখন তিনি মাথা তুলতেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হারেস এবনে হেশাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনার প্রতি ওহী কিভাবে নাযিল হত? তিনি এরশাদ করেছেনঃ কখনও ঘন্টা ধ্বনির ন্যায় আওয়াজ হত, আর এ পন্থাটি ছিল অত্যন্ত কষ্টদায়ক, আর যখন ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা শেষ হত তখন আমি তা কণ্ঠস্থ করে নিতাম। আর কখনও ফেরেশতা মানবাকৃতি ধারণ করে কথা বলতো আর সে যা বলতো, আমি তা কণ্ঠস্থ রাখতাম।

আর এ বিষয়েরও সম্ভাবনা ছিল যে, যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী নাযিল হত, তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করতেন। হেরা নামক গুহায় তিনি দিনের পর দিন রাতের পর রাত এবাদত করতেন। আর ঠিক এমন সময় হুকুম হয়ঃ

قُمْ فَأَنْذِرْ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি দাঁড়ান এবং মানুষকে ভয় প্রদর্শন করুন।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

তখন মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান করার জন্যে মনকে বন্দাদের দিকে মনোনিবেশ করতে হত, এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ।

ইমাম আবু দাউদ খাজায়ী গোত্রের একজন সাহাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে বলেছেন, হে বেলাল! নামাজের একামত বল এবং আমাকে শান্তি দাও। সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করার মধ্যে যে কষ্ট আছে, তা দূর হত নামাজের মাধ্যমে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, قولا ثقيلا অর্থ যদি তাহাজ্জুদের নামাজের আদেশ গ্রহণ করা হয় তবে এর ব্যাখ্যা হবে এই, রাত্রিকালে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়া, আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে প্রবৃত্তির বিরোধিতা করা হয়, আর এ অত্যন্ত কঠিন। এক কথায় কোরআনে করীমের প্রচার-প্রসার এবং কোরআনে করীমের বাস্তবায়ন বিশেষতঃ প্রতিকূল পরিবেশে যখন প্রত্যেক পদক্ষেপে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়, তখন তা অত্যন্ত দুর্বহ কাজ ছিল। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক কোরআনে করীমকে তেলাওয়াত করার এবং ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন এ কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۞

'নিশ্চয় রাতের উত্থান খুবই কঠিন, আত্মসংযম এবং বাক্য সংশোধন হবার পক্ষে তা অতি উত্তম'।

রাতের আরাম পরিত্যাগ করে নামাজের জন্যে ওঠা এবং তৈরী হয়ে দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান হওয়া সহজ কাজ নয়। যে নফস বা প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়, নিঃসন্দেহে এটি তার জন্যে অতি কঠিন, এ কঠিন কাজটিকেই আলোচ্য আয়াতে ناشئة اليل বলা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রাত্রের কিছু অংশে বিশ্রাম করে নামাজের জন্যে উঠাই হল ناشئة اليل

এবনে কিসান বলেছেন, তাহাজ্জুদের নামাজের জন্যে শেষ রাতে উঠাকেই ناشئة اليل বলা হয়।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় نشأ অর্থ قام অর্থাৎ দাঁড়িয়েছে। অতএব রাতের যে কোন অংশে যদি কেউ নামাজের জন্য দাড়ায় তাকেই ناشئة বলা হয়।

এবনে যায়েদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

একরামা (রঃ) বলেছেন, রাতের প্রথম অংশে তাহাজ্জদের নামাজে দাঁড়ানোকে ناشئة اليل বলা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ)-এর সূত্রে হযরত ইমাম হোসায়েন (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম হোসায়েন (আঃ) মাগরিব ও এশার মধ্যে নফল নামাজ আদায় করতেন। এটিই হল ناشئة اليل

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ পর্যায়ে একথা স্মরণযোগ্য যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের শেষ প্রহরে দন্ডায়মান হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এশার নামাযের পর প্রত্যেক নামাযকেই ناشئة বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ)-কে শব্দটির ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে, তারা উভয়ে বলেছেন, সারারাত এবাদত করাই হলো – ناشئة اليل

আয়াতের মর্মকথা

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ

নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিবেলা উত্থান, নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার একটি কার্যকর মাধ্যম এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে সহায়ক। রাতের আরাম পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল হওয়া নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। যে নফস আরাম প্রিয়, তাকে এর জন্যে প্রস্তুত করা খুব একটা সহজ কাজ নয়; তবে রাত্রি জাগরণের এ পন্থা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের একটি কার্যকর মাধ্যম। বিশেষতঃ রাতের শেষ প্রহরে যখন পৃথিবীর মানুষ থাকে নিদ্রিত, সমগ্র বিশ্ব থাকে নীরব, নিস্তব্ধ, আকাশ থাকে আলোকময়, চন্দ্র ও তারকারাজির আলোকে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে, এমন সময় মহান আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের দিকে দেখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার এক অপূর্ব সুযোগ আসে। এতদ্ব্যতীত, ঐ সময়ই আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হতে থকে, আর এ সময়টিই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। এজন্যেই মরমী কবি বলেছেনঃ

غزالی ہوکہ رومی سعدی ہوکہ شیرازی
کچھ ہاتہ نہیں آتا بغیر آہ سحرگاہی

'গাজ্জালী হোক, বা রুমী, সাদী হোক বা সিরাজী, শেষ রাতের কান্নাকাটি ব্যতীত কারো হাতেই কিছু আসেনা'।

অতএব, রাতের শেষ প্রহরে যেহেতু মনের একাগ্রতা থাকে অপেক্ষাকৃত বেশী, মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠ থেকে আসে দোয়া, এজন্যে ঐ বিশেষ সময়ে দোয়া কবুল হয়। যেহেতু সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করে, মানুষ থাকে নিদ্রায় বিভোর, তাই লোক দেখানোর সম্ভাবনাও তখন থাকেনা, আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকার অনুকুল পরিবেশ তখনই সৃষ্টি হয়।

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞

(হে রসূল!) নিশ্চয় দিনের বেলায়ও রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা, মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা, ঈমান আনয়নে অনুপ্রাণিত করা, সত্যের দাওয়াত পৌছানো, এ উদ্দেশ্যে এদিক-সেদিক আসা-যাওয়াতেই দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু রাতে এ ব্যস্ততা থাকেনা, তাই রাতের এই অখন্ড নীরবতার সময়টি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অতিবাহিত করাই শ্রেয়। এ পর্যায়ে রাতের এই বিশেষ নামাযের ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের হাদীস সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাহাজ্জুদের নামাজের ফজিলত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থেকে যায় তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক সর্বনিম্ন আসমানে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এরশাদ করেনঃ কেউ আছে কি যে আমার নিকট দোয়া করে, তবে আমি তার দোয়া কবুল করবো।

কেউ আছে কি যে আমার নিকট কিছু চায়, তবে আমি তাকে দান করবো।

কেউ আছে কি, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তার গুনাহ মাফ করবো। –(বোখারী মুসলিম)

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রাত্রিকালে একটি সময় এমন আছে, যদি ঠিক সেই সময় কোন মুসলমান দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন কিছুর আরজী পেশ করে তবে আল্লাহ পাক তাকে তা দান করেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামাজ হল হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামাজ, আর সবচেয়ে প্রিয় রোজা হল হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোজা। দাউদ (আঃ) অর্ধ রাত পর্যন্ত নিদ্রিত থাকতেন, এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ সময়ে নামাজে অতিবাহিত করতেন, এরপর রাতের ষষ্ঠ অংশে ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি একদিন রোজা রাখতেন, আর একদিন রোজা রাখতেন না। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা রাতের নামাজ যথা নিয়মে অবশ্যই আদায় করতে থাক। এটি তোমাদের পূর্বকালের নেককারদের পন্থা, আর এটিই তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, আর এটি গুনাহগুলোকে দূরীভূতকারী এবং এটিই মানুষকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আবু সীয়দ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির অবস্থা দেখে আল্লাহ পাক হাসেন (অর্থাৎ পছন্দ করেন)।

১. সে ব্যক্তি যে রাতে উঠে নামাজ আদায় করে (তাহাজ্জুদ)।

২. সে দল যারা নামাযে সর্বদা মশগুল থাকে।

৩. সে দল যারা জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হযরত আমর এবনে উয়াইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বন্দা আল্লাহ পাকের সর্বাধিক নৈকট্য-ধন্য হয় রাতের শেষ ভাগে, যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় তবে তোমরা আল্লাহ পাকের স্মরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। ইমাম তিরমিজী এই হাদীসখানিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরআন বহনকারীগণ (কোরআনে হাফেজ ও আলেমগণ) এবং রাত্রে নামাজ আদায়কারীগণ (তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ) আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। (বায়হাকী)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

'আর (হে রসূল) আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন এবং সবকিছু ত্যাগ করে তাঁর দিকে ছুটে আসুন'।

আল্লাহ পাকের জিকর

অর্থাৎ দিন-রাত আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকা, কখনও গাফলত না থাকা, কখনও আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল না হওয়া, আর এমন জিকর শুধু যে রসনা দ্বারা হবে তা নয়; বরং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা, তসবীহ এর মাধ্যমে, আল্লাহ পাকের শোকর গুজারীর মাধ্যমে, নামায ও তেলাওয়াতের দ্বারা এ জিকর হয়। বিশেষতঃ অন্তর দ্বারা এ জিকর হতে পারে।

মনে যখন গাফলত আসে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের স্মরণ যখন মনে না থাকে তখন নামাজও গ্রহণযোগ্য হয়না, তসবীহ ও তেলাওয়াতও নয়, যে নামাজী নামাজের ব্যাপারে গাফেল থাকে, তার ধ্বংস অনিবার্য। জিকরে মশগুল থাকা, শুধু জিকরতো রাত্রের নামাজে হয়েই থাকে, আর কোরআনে করীমের তরতীলেও আল্লাহ পাকের জিকর হয়ে থাকে। কিন্তু এসব হুকুমের পর জিকরের উল্লেখ করার কারণে এর অর্থে কিছুটা পার্থক্য হবে, আর তা হল কোরআনে করীমের তেলাওয়াত। অতএব, বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম দ্বারা তেলাওয়াত শুরু করা।

বিসমিল্লাহ্ পাঠের বিধান

নামাজ ব্যতীত যদি সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় অথবা কোন সূরা পাঠ করা শুরু করা হয়, তবে তেলাওয়াত শুরু করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করা সুন্নত। যদি দু' সূরা একসঙ্গে পাঠ করা হয় তবে দ্বিতীয় সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের একাধিক মত রয়েছে।

এবনে কাসীর এবং আসেম সূরা আনফাল এবং সূরা বারাআত বাদ দিয়ে প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। তবে আনফাল ও সূরা বারাআতের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ না করার ব্যাপারে সকলেই একমত। কিন্তু কোন সূরা মাঝখান থেকে শুরু করা হলে বিসমিল্লাহ পাঠ করা না করা ইচ্ছাধীন। এ মতবিরোধ নামাজ ব্যতীত অন্য সময় তেলাওয়াত করার ব্যাপারে। আর নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত সম্পর্কে ইমাম শাফী (রঃ)-এর মতে শুধু সূরা ফাতেহা নয়, বরং প্রত্যেক সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ পাঠ করা। এর কারণ হল, সূরা ফাতেহার সাথে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব এবং অন্য সূরার সাথে সুন্নত।

অবশিষ্ট তিন ইমামের নিকট বিসমিল্লাহ কোন সূরারই প্রাথমিক অংশ নয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, বিসমিল্লাহ কোরআনে করীমের আয়াত, কিন্তু দুটি সূরাকে পৃথক করার জন্যই তা নাযিল করা হয়েছে, অতএব বিসমিল্লাহ না পড়াই উচিত।

ইমাম মালেক (রঃ) বলেছেন, নামাযে বিসমিল্লাহ না পড়া ভাল, সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরাতেও নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে শুধু সূরা ফাতেহার সাথে নিঃশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত, অন্য সূরার সাথে নয়। ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করতেন।

নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের থেকে কোন বিবরণ পাওয়া যায়না।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত বিসমিল্লাহ নিম্নস্বরে পাঠ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আম্মার এবনে ইয়াসীর (রাঃ), হযরত আম্মার এবনে মোগাফার (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং বিখ্যাত তাবেয়ীন যথা হযরত হাসান বসরী (রঃ), শা'বী (রঃ), সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ), ইবরাহীম নখয়ী (রঃ), কাতাদা (রঃ), ওমর এবনে আবদুল আযীয (রঃ), আ'মাশ (রঃ), সুফিয়ান সওরী (রঃ) প্রমুখ বুজুর্গানে দ্বীনের মধ্যে কেউই নামাযে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন না। তবে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ), আতা (রঃ), তাউস (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) প্রমুখ নামাজে বিসমিল্লাহকে উচ্চস্বরে পাঠ করতেন। এ বিবরণ পেশ করেছেন এবনে জওযী (রঃ)।

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

'আর সব কিছু ত্যাগ করে তার দিকে ছুটে আসুন'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) একথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য পরিপূর্ণ সাধনা করা।

আর তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভে রত হওয়া। অর্থাৎ মনের সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ পাকের সাথে রাখা, আর অন্য সব কিছু থেকে মনকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেয়া।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, تبتيل কথাটির অর্থ এই নয় যে, মানুষের সাথে সকল সম্পদ ছিন্ন করবে, পরিত্যাগ করবে, এমন নয়। ইসলাম এমন নির্লিপ্ত জীবনের শিক্ষা দেয় না, কেননা প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি তার নফসের অধিকার রয়েছে, তার পরিবারের হক রয়েছে, তার সন্তান-সন্ততির হক রয়েছে এবং তার মেহমানেরও হক রয়েছে; বরং উদ্দেশ্য হল মনকে আল্লাহ পাকের নিকট রাখ, আর প্রকাশ্যে যা কিছু করণীয় তা কর।

সৃষ্টির সাথে মনের সম্পর্ক থাকবেনা। মনের সম্পর্ক থাকবে শুধু এক আল্লাহ পাকের সাথে। এজন্যই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল, আল্লাহ পাকের জন্য পরিপূর্ণ "এখলাস" অবলম্বন কর। আর এখলাস হল, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এভাবেঃ

ان تعبد الله كانك تراه-الحديث

অর্থাৎ তুমি এভাবে আল্লাহ পাকের বন্দেগী করবে, যেন তুমি তাকে দেখছো, যদি তোমার এমন অবস্থা না হয় তবে তুমি একথা মনে রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।

যখন মানব মনের এ অবস্থা হয় তখন সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করা, ধীরে ধীরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা, সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের ধ্যানে তন্ময় থাকা সহজ ও সম্ভব হবে।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۞

'তিনিই মাশরেক ও মাগরিবের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, অতএব, শুধু তাঁকেই সব কিছুর কর্মকর্তা বলে গ্রহণ করুন'।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

'এবং সব কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ পাকের দিকে ছুটে আসুন'।

এ আদেশের কারণে কারো কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, মানুষ সামাজিক জীবন যাপন করে, জীবন-সংগ্রামে একের নিকট অন্যের প্রয়োজন থাকে, আর এজন্যে চাই পরস্পরের সহযোগিতা, যদি সব কিছু ত্যাগ করতে হয় তবে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা শুধু কঠিনই নয়; অসম্ভব হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

অর্থাৎ যাঁর প্রতি তোমার ঈমান বা বিশ্বাস তিনি যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির মালিক, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা, মানুষের জীবন ও জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি যেমন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা তা-ই করেন, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি ব্যতীত কেউ কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারেনা। অতএব, এক আল্লাহ পাককেই সব কিছুর কর্মকর্তা হিসেবে গ্রহণ করুন, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর প্রতি ভরসা করার পর মানুষের আর কারো কোন প্রয়োজন থাকেনা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, তাঁর রবুবিয়াতে তথা তিনি যে সবার পালনকর্তা এবং মালিক, একথার ঘোষণা রয়েছে। আর একথাও ঘোষণা রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত মানুষের কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই। ক্ষমতা শুধু তাঁরই, যখন কোন সত্য-সাধক আল্লাহ্ পাকের এ গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বাকে স্মরণ করে তাঁর জিকরে মশগুল হয়, তাঁর ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত সে আর কিছুই দেখতে পায়না, সম্মুখে এবং পশ্চাতে, ডানে-বামে, এককথায় সর্বত্র এক আল্লাহ্ পাককেই দেখতে পায়, সব কিছুর সাথে তার সম্পর্ক কেটে যায়, সে নিজেকে দরবারে এলাহীতে উপস্থিত পায়, তার দেহ মন যথাসর্বস্ব আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে বিলীন হয়ে যায়, আর এ হলো সব কিছু ত্যাগ করে ছুটে আসা এবং মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা করার তাৎপর্য।

মওলানা রুমী (রঃ) বিষয়টিকে দেখেছেন এভাবেঃ

تو در اوگم شو وصال اینست وبس
گم شدن گم کن کمال اینست وبس

"তুমি আল্লাহ্ পাকের ধ্যানে তন্ময় হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেল। এটিই তো মিলন, আর হারিয়ে যাওয়াও বিস্মৃত হও, আর এ হবে তোমার পরিপূর্ণতা, আল্লাহ্ পাকের প্রেমসুধা পানের জন্যে এটিই যথেষ্ট"।

اتصال بے تکیف بے قیاس = ہست رب الناس رابا جان ناس

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির, প্রভুর সঙ্গে বন্দার একটি মিলন ক্ষেত্র রয়েছে, তবে সে মিলন ক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবোনা, এমনকি, কোন ধারণাও দিতে পারবোনা। অর্থাৎ যা আমি বুঝি তা বোঝাতে পারবোনা।

যিনি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের প্রাণের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির এ নিবিড় সম্পর্কের উল্লেখ করে মওলানা রুমী (রঃ) আরো বলেছেনঃ

جان نہاں در جسم داد ودر جان نہان
اے نہاں اندر نہاں اے جان جان

'তিনি দেহ মাত্রেরই মাঝে প্রাণকে গোপন করে রেখেছেন। আর সেই গোপন প্রাণে নিজে আত্মগোপন করে আছেন। হে পবিত্র সত্বা, যিনি গোপনের মধ্যেও গোপন হে প্রাণের প্রাণ'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত হেকমত, তাঁর অন্তহীন গুণাবলীর বিবরণ দেয়া যেমন কারো পক্ষে সম্ভব নয় ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে তাঁর বন্দাদের যে সম্পর্ক তার বিশ্লেষণও সম্ভব নয়। তবে এতটুকু বলা যায় যে, এ সম্পর্ক শুরু হয় তাঁর প্রতি ঈমানের মাধ্যমে। আর এ সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয় তাঁর এবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে। এ সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হয় এখলাছের মাধ্যমে; আর তা পরিপূর্ণ হয় তাঁর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসার মাধ্যমে। যেমন হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে একথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তুমি আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করতে পার, যেমনটি ভরসা করার হক্ব তা আদায় করতে পার, তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এভাবে রিয্ক দান করবেন যেভাবে তিনি পাখীদেরকে দান করেন। পাখীরা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, আর সন্ধ্যায় পেটভরে ফিরে আসে। (তিরমিজী, এবনে মাজা)

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল (আঃ) আমার রূহে একথা ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি নিজের রিয্ক পূর্ণ করা ব্যতীত মৃত্যু বরণ করে না। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক এবং সঠিক পথে রিয্কের অন্বেষণ করতে থাক (বায়হাকী)।

হযরত আবুযর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়াত্যাগী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হালালকে হারাম করে দেয়া হয় এবং অর্থ সম্পদকে বিনষ্ট করা, বরং দুনিয়াত্যাগী হওয়ার অর্থ হল নিজের হাতে যা সম্পদ আছে তার উপর আল্লাহ পাকের হাতে যে সম্পদ আছে, তারচেয়ে অধিকতর আস্থা না হওয়া। অর্থাৎ নিজের সঞ্চিত সম্পদের উপর যেমন মনোবল থাকে, ভরসা থাকে, অর্থ-সম্পদ না থাকা অবস্থায় আল্লাহ পাকের রিয্ক প্রদানের উপর তেমনি ভরসা রাখা। যদি তোমার প্রতি কোন বিপদ আপতিত হয়, তবে তোমার অন্তরে ঐ বিপদের জন্য সওয়াবের আগ্রহ এত বেশী থাকবে যে, ঐ বিপদ দূর না হওয়ার প্রতিই তুমি আগ্রহী থাকবে। (তিরমিজী)

আধ্যাত্মিক সাধনার কয়েকটি কর্মসূচী

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূরার শুরু থেকে এ আয়াত পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন রাত্রিকালে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়া, কোরআনে করীমের তেলাওয়াত করা এবং আল্লাহ পাকের জিকরে

মশগুল হওয়া, আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রাখা।

বস্তুতঃ এ সূরায় আত্মসংশোধনের এবং আত্মিক উন্নতি লাভের, তথা আধ্যাত্মিক সাধনার আটটি কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে। যেমন

১. قُمِ الَّيْلَ রাত্রি জাগরণ করে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়া, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করা।

২. وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ ধীরে ধীরে সুন্দর করে স্পষ্টভাবে কোরআনে করীম তেলাওয়াত করা।

৩. اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ সারাদিন কর্মময় জীবন যাপন করা।

৪. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আল্লাহ পাকের নাম মোবারক স্মরণ করতে থাকা।

৫. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ আল্লাহ পাক ব্যতীত সব কিছু থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা।

৬. فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا শুধু এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখা।

৭. وَاصْبِرْ ধৈর্য ও সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করা, সংকল্পের দৃঢ়তা অর্জন করা।

৮. وَاهْجُرْهُمْ দুশমন থেকে সুন্দরভাবে নিরাপদ দূরত্বে থাকা।

এই আটটি কর্মসূচির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন হয়, দুশমনের জুলুম-অত্যাচারে সবর অবলম্বন করা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ

(হে রসূল!) কাফেররা যে সব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলে আপনি তার উপর সবর অবলম্বন করুন। কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গণক, কবি ও উন্মাদ বলতো। আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা আপনাকে যত মন্দই বলুক না কেন আপনি সবর অবলম্বন করুন।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۞

'এবং তাদের থেকে সুন্দরভাবে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন'।

কাফেরদের অন্যায় আচরণের প্রতিশোধ গ্রহন করবেন না। আল্লাহ পাকই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। তাই আপনি তাদের সাথে রুক্ষ আচরণ করবেন না, তাদেরকে নসিহত করতে থাকবেন, ভদ্রভাবে তাদের থেকে দূরে থাকবেন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, পরবর্তীতে জেহাদ সম্পর্কে আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, ঐ আয়াত দ্বারা এ আয়াত রহিত হয়ে গেছে।

আলোচ্য আয়াতখানি ইসলামের প্রথম যুগে নাযিল হয়।

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۞

'আর (হে রসূল!) আমাকে এবং ঐ সুখী সমৃদ্ধশালী মিথ্যাজ্ঞানকারীদের ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে চলুন'।

অর্থাৎ যে সব সমৃদ্ধশালী আয়েশ-প্রিয় লোকেরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করুন, তাদের শাস্তি বিধানের জন্য আমিই যথেষ্ট। (হে রসূল!) আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আজ যারা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়না, দ্বীন ইসলামের সত্যতাকে মেনে নেয়না, ভোগ বিলাসে তারা মত্ত থাকে তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দিন, তাদেরকে একটু অবকাশ দিন, আমি তাদেরকে দেখে নেব, তাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতের কঠিন কঠোর শাস্তি। বিষাক্ত সাপ বিচ্ছুর দংশন তাদেরকে ভোগ করতে হবে, অবাধ্য, অখাদ্য খাবার তাদেরকে ভক্ষণ করতে হবে।

وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا

আর তাদেরকে সামান্য সময় অবকাশ দিন, আর সে সময় পর্যন্ত হয়তো তাদের মৃত্যু হয়ে যাবে। অথবা আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের আদেশ দিয়ে দেবেন এবং মোমেনদের হাতে তাদের শাস্তি হবে।

তফসীরকার মোকাতেল এবনে হাব্বান বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে বদরের যুদ্ধে নিহত কাফেরদের সম্পর্কে, কেননা কিছুদিন পরই বদরের রণাঙ্গনে মক্কার সেই কাফের জালেমদের নিহত হতে হয়।

اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۞ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۞

'নিশ্চয় আমার নিকট (তাদের জন্যে) শেকল এবং অগ্নিকুন্ড রয়েছে। আর এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায় ও কঠিন আযাব রয়েছে'।

আলোচ্য আয়াতের انكال শব্দটি نكل এর বহুবচন। এর অর্থ হল, শেকল, বেড়ী। বায়হাকী (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, انكال হল, অগ্নি দ্বারা তৈরী শেকল সমূহ।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

'এমন খাদ্য যা গলায় আটকে যায়, না ভেতরের দিকে যায় না বাইরে আসে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি হল যাক্কুম বৃক্ষ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথাও বর্ণিত আছে, দোযখের মধ্যে কাঁটা বিশিষ্ট এমন একটি জিনিষ থাকবে যা হবে অত্যন্ত বেশী তিক্ত এবং মুর্দার চেয়েও বেশী দুর্গন্ধময়, আর আগুনের চেয়েও অধিকতর গরম। যখন দোযখীদের তা খাওয়ানো হবে, তবে ঐ খাদ্য পেটেও যাবেনা মুখ পর্যন্তও ফিরে আসবে না, বরং মাঝখানে আটকে থাকবে। আর ঐ খাবার দ্বারা শরীরের কোন লাভ হবেনা এবং ক্ষুধাও মিটবে না।

وَّعَذَابًا اَلِيْمًا

অর্থাৎ তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, দোযখীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে অগ্নি, সাপ ও বিচ্ছু তৈরী থাকবে, আর সেগুলো এত বিষাক্ত থাকবে যে, যদি একটি সাপ পৃথিবীর প্রাচ্যে ফুঁ দেয় তবে পাশ্চাত্য পর্যন্ত জ্বলে ছাই হয়ে যাবে। আর একটি বিচ্ছু যদি সারা পৃথিবীর মানুষকে দংশন করে তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দোযখীদের উপর সবচেয়ে সহজ আযাব হবে আবু তালেবের উপর, তাকে শুধু অগ্নির তৈরী দুটি পাদুকা পরিয়ে দেয়া হবে যার কারণে তার মাথার মগজ বের হয়ে আসবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, দোযখীদের উপর সবচেয়ে সহজ আযাব সে ব্যক্তির হবে, যার দু'টি পাদুকা ও ফিতা অগ্নির হবে, যে কারণে ফুটন্ত পাত্রের মত তার মগজ বের হয়ে আসবে, সে

ধারণা করবে তার উপরই সবচেয়ে কঠিনতর শাস্তি হচ্ছে, অথচ তার প্রতি হবে সবচেয়ে কম আযাব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত আছে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۞

'(সেদিনকে স্মরণ কর) যেদিন পৃথিবী এবং পাহাড় পর্বত কেঁপে উঠবে এবং পর্বত সমূহ বিচূর্ণ হয়ে বালুস্তূপের ন্যায় হয়ে যাবে'।

অর্থাৎ যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে সেদিন থেকেই আরম্ভ হবে কাফের মুশরেক বেদ্বীনদের কঠোর শাস্তি। আর এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে কেয়ামতের দিনের শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া থেকে জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছা পর্যন্ত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, كثيبا مهيلا অর্থ হল, এমন বালুর স্তূপ যে তার কোন অংশ যদি তুমি উঠিয়ে নাও তবে সঙ্গে সঙ্গে সে স্থলে অন্য একটি অংশ এসে যাবে। তফসীরকার কালবী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।

اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۞

'নিশ্চয় আমি ঠিক সেভাবেই তোমাদের নিকট এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের অবস্থা বর্ণনা করবেন, যেমন রসূল প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের নিকট'।

অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন ঠিক তেমনি সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে প্রেরণ করেছি। এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ বলে আর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতিকে।

رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ এমন রসূল তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি, তোমরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দাও বা অস্বীকৃতি জানাও, এর সাক্ষী হবেন তিনি। যেভাবে ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া না দেয়ার কারণে ধ্বংস হয়েছে। যদি তোমরাও আমার প্রেরিত রসূলকে অমান্য কর, তবে তোমাদের শাস্তিও অনিবার্য এবং তোমাদের ধ্বংস অবধারিত।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন এ সাক্ষ্য দেবেন যে, দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং তাঁর মহান আদর্শের অনুসরণ করেছে এবং কে তাঁকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ﴿١٦﴾
فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ
شِيْبًا ﴿١٧﴾ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ﴿١٨﴾ اِنَّ
هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿١٩﴾
اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَىِ الَّيْلِ وَ
نِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ
يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ

তরজমা

(১৬) ফেরাউন রসূলের কথা অমান্য করলো, পরিণামে আমি তাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে পাকড়াও করি।

(১৭) অতএব, যদি তোমরা কুফরী কর, তবে সেদিন কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যেদিনটি বালকদেরকেও বৃদ্ধ করে দেবে।

(১৮) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তাঁর ওয়াদা পূর্ণ হবে।

(১৯) এটিতো নসিহত মাত্র, অতএব যে কেউ চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

(২০) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন আপনি এবং আপনার সঙ্গী কিছু লোক রাতের দু' তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত অথবা এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে

থাকেন, আল্লাহ পাকই রাত-দিনের পরিমাপ করেন, আল্লাহ পাক জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবে না, তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন, অতএব কোরআনে করীমের যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয় ততটুকুই তেলাওয়াত কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে রাত্রিকালে আল্লাহ পাকের এবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এরপর কাফের মুশরেকদের দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার করা হয়, তার প্রতি সবর অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পাপীষ্ঠদের প্রতি কঠিন আযাব আসবে, দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানে। এ পর্যায়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ জালেম ফেরাউনের হেদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের মত ফেরাউনও হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করেছে, এর শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ ফেরাউন এবং তার দল-বলকে ধ্বংস করা হয়েছে।

ফেরাউনের ধ্বংসের এ দৃষ্টান্ত থেকে মক্কার কাফেরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ফেরাউনের মত শক্তিধর ব্যক্তিই যখন আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি তখন হে মক্কাবাসী! তোমরা আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করে কিভাবে আযাবে এলাহী থেকে রক্ষা পাবে? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝

'ফেরাউন রসূলের কথা অমান্য করলো, পরিণামে আমি তাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে পাকড়াও করি'।

ঠিক এমনিভাবে হে মক্কাবাসী! তোমরা যদি আল্লাহ পাকের অবাধ্য হও, তাঁর রসূলের কথা অমান্য কর, তবে তোমাদেরও ফেরাউনের মত কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে, কেননা এই রসূল সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি, কাজেই যারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করবে তাদের শাস্তিও হবে অন্যদের চেয়ে অধিকতর। আল্লাহ পাক ফেরাউনকে তার দলবলসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছেন, পরে আলমে বরজখে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছেন।

ঠিক এমনিভাবে তোমরা যদি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের শাস্তিও অনিবার্য।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۞

'অতএব, যদি তোমরা কুফরী ও নাফরমানী কর তবে সেদিন কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যেদিনটি বালকদেরকেও বৃদ্ধ করে দেবে'।

অর্থাৎ হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা কুফরী-নাফরমানীতে অবিচল থাক, তবে বল সেদিনের আযাব থেকে তোমরা কিভাবে নাজাত পাবে? যেদিনের ভয়াবহ অবস্থার কারণে বালকও বৃদ্ধে পরিণত হবে।

অথবা এর অর্থ হলো যদি তোমরা সেই কঠিন ভয়াবহ দিনকে তথা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার কর, তবে তোমরা কিভাবে আল্লাহর ভয় এবং পরহেযগারী অবলম্বন করবে, অথচ সেদিন এত ভয়াবহ হবে যে, তা বালকদেরকেও বৃদ্ধ করবে।

এ পর্যায়ে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করেছেন এবং বলেছেন, যে ভয়াবহ দিনের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো কেয়ামতের দিন। সেদিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন, ওঠ! এবং তোমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে দোযখীদেরকে পৃথক কর।

হযরত আদম (আঃ) আরজ করবেন, দোযখের অংশ কত?

আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন।

তখন এত ভয়-ভীতি সৃষ্টি হবে যে, বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী মায়েদেরও গর্ভপাত ঘটবে। তোমরা মনে করবে মানুষ নেশাগ্রস্ত কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই, মানুষ নেশাগ্রস্ত হবেনা; বরং আল্লাহ পাকের আযাব এত কঠিন হবে যে, মনে হবে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম এ অবস্থা শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের চেহারা দেখে তা উপলব্ধি করলেন।

উম্মতে মোহাম্মদীর জন্যে বিশেষ সুসংবাদ

একজন সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমাদের মধ্যে সেই নাজাত প্রাপ্ত ব্যক্তিটি কে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে একজন দোযখী হবে এবং আর ইয়াজুজ মাজুযের দ্বারা এক হাজার পূর্ণ হবে।

এরপর এরশাদ করেছেনঃ শপথ সেই আল্লাহ্ পাকের, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, আমি আশা করি, (সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী) তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে।

বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমরা একথা শুনে আল্লাহ্ আকবর বললাম।

তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে।

আমরা একথা শ্রবণ করে আল্লাহ্ আকবর বললাম।

এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আমি আশা করি, তোমরা জান্নাতবাসীদের অর্ধেক হবে। তখন আমরা আল্লাহ্ আকবর বললাম। তখন তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা দোযখী লোকদের মধ্যে এমন হবে যেমন সাদা রঙের গরুর চামড়ায় একটি কালো পশম, অথবা কালো রঙের গরুর চামড়ায় একটি সাদা পশম।[১] (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

اِلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ ؕ

'আকাশ সেদিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে'।

অর্থাৎ সেদিন এত ভয়াবহ হবে যে, অত্যধিক ভয়-ভীতির কারণে আকাশ এত মজবুত হওয়া সত্ত্বেও বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۞

আল্লাহ্ পাকের কথা সেদিন অবশ্যই কার্যে পরিণত হবে, কেননা আল্লাহ্ পাকের কথা ধ্রুব সত্য, তাঁর ওয়াদা অনড়, অটল, তোমরা যত চেষ্টাই করনা কেন তাঁকে বাধা দিতে পারবেনা।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۞

'এটিতো নসিহত মাত্র, অতএব, যে কেউ চায় সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৭০
তফসীরে এবনে কাসীর পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৬৩
মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩১০

অর্থাৎ কোরআনে করীমের এ আয়াত সমূহ নসিহত মাত্র, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের জন্যেই এতে রয়েছে নসিহত, আল্লাহ পাকের পথ পাওয়ার জন্যেই এ নসিহত। আল্লাহ পাকের দয়া-মায়া, দান-দক্ষিণা লাভের পথ নির্দেশ করে এ আয়াত সমূহ। অতএব, যার ইচ্ছা সে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হবার পথ অবলম্বন করতে পারে। এ নসিহত তোমাদের কল্যাণার্থেই করা হয়েছে, এখনও সময় আছে, যে কেউ ইচ্ছা করে সে আল্লাহর পথ ধরতে পারে এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচার পথ গ্রহণ করতে পারে।

কোরআনে করীমে যে নসিহত রয়েছে, তা অবলম্বনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া যায়। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ পাক আমাদের প্রাণের চেয়েও নিকটতর, কিন্তু আমাদের গাফলত এবং উদাসীনতা আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের মাঝে আড়াল হয়ে আছে। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নূর এবং অন্ধকারের সত্তুর হাজার পর্দা রয়েছে। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের পর্দা সমূহ হলো নূরানী। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর, আর আজমত আমার পোষাক, যা বন্দাদের থেকে আমাকে গোপন করে রেখেছে। আর বন্দাদের গাফলতের পর্দা হলো অন্ধকারের, যদি আল্লাহ পাক এ পর্দা সমূহ দূরীভূত করেন, তবে তাঁর চেহারা মোবারকের জ্যোতি সমগ্র বিশ্বজগতকে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দেবে।

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক জানেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গী কিছু লোক রাতের দু' তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত অথবা এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকেন, আল্লাহ পাকই রাত দিনের পরিমাপ করেন, আল্লাহ পাক জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পারবেনা, তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা-পরায়ণ হয়েছেন। অতএব, কোরআনে করীমের যতটুকু তেলাওয়াত করা তোমাদের পক্ষে সহজ হয়, ততটুকুই তেলাওয়াত কর'।

এ সূরার শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যে, রাতের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ, অথবা দু' তৃতীয়াংশ

আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান থাকুন, অর্থাৎ এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকুন, এ আদেশ পালন করতে গিয়ে মুসলমানগণকে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, আধুনিক যুগের মত তখন সময় নিরুপণের কোন ব্যবস্থা ছিলনা, তাই অনেক সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন, কেননা তাঁরা অনেকেই সমস্ত রাত জাগ্রত থেকে আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকতেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! আল্লাহ পাক আপনার ও আপনার সঙ্গীদের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, যা সাধ্যের অতীত, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে পূর্বের আদেশ রহিত করে এরশাদ করেছেনঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

'অতএব, তোমরা সহজে যে পরিমাণ কোরআনে করীম থেকে পাঠ করতে পার, পড়'।

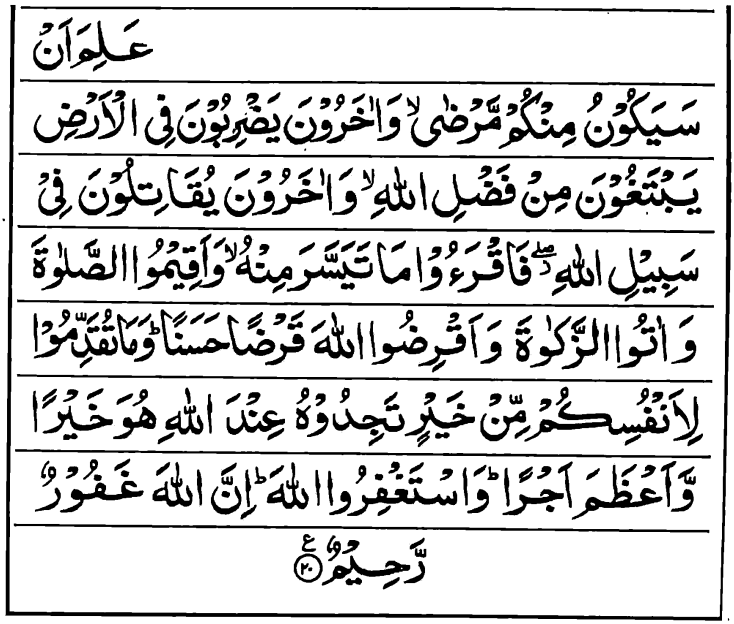
এ আয়াত দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাজ যা পূর্বে ফরজ ছিল তা রহিত হলো এবং অর্ধ রাত বা রাতের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়িয়ে থাকার যে আদেশ ছিল তা সহজ করা হলো। এখন যে পরিমাণ তৌফিক হবে এবং সহজে সম্ভব হবে সে পরিমাণই কোরআনে করীম পাঠ করবে, নামায আদায় করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে রাতের নামাজ তথা তাহাজ্জুদের নামাজ সম্পর্কে যে নির্দেশ রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে তাহাজ্জুদের নামাজ সকলের জন্যে অবশ্য কর্তব্য ছিল, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ঘোষিত হবার পর তাহাজ্জুদের নামাজ নফলে পরিণত হলো।

এ বিষয়ে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যেও কি তাহাজ্জুদের নামাজ নফলে পরিণত হলো? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইতোপূর্বে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাহাজ্জুদের নামায ফরজ ছিল। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পার তাহাজ্জুদের ফরজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারেও রহিত হয়েছে।

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের কেউ কেউ বলেছেন, উম্মতের প্রতি তাহাজ্জুদের নামাজ ফরজ রয়নি; কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা ফরজ ছিল।[১]

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৫, পৃষ্ঠা-১৫৮-১৬৩


عَلِمَ اَنْ
سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ
يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا
وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(২০) আল্লাহ পাক জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোক রুগ্ন হয়ে পড়বে, আর অন্যান্য কিছু লোক জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কিছু লোক আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে থাকবে, অতএব তোমরা পবিত্র কোরআনের যতটুকু সহজ বোধ কর, পাঠ কর এবং নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহ পাককে "করজে হাসানা" দিতে থাক (আল্লাহ পাকের রাহে দান করতে থাক), আর তোমরা নিজেদের উপকারার্থে যা কিছু কল্যাণকর কাজ করে পাঠাবে, তা অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট পাবে (আর যা পাবে) তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর, আর তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরুল কোরআন

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى.....فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

'আল্লাহ পাক জানেন যে, সমস্ত রাত আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকলে তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে'। কারো পক্ষে তা সম্ভবই হবেনা, এছাড়া কেউ কেউ

জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে এবং কেউ কেউ আল্লাহর রাহে জেহাদে মশগুল থাকে, এসব লোকের পক্ষে রাত-ভর এবাদত করা মোটেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক রাত্রি জাগরণের এ আদেশকে রহিত করলেন এবং যার পক্ষে যতখানি সম্ভব কোরআনে করীম পাঠ করার অনুমতি দেয়া হলো।

প্রশ্ন হলো, যতটুকু সহজ এবং সম্ভব তা কতখানি, এর কি কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কমপক্ষে একশত পঞ্চাশ আয়াত, আর অধিক হলে এক হাজার আয়াত, যেন এক সপ্তাহে কোরআনে করীম খতম হয়।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, এর পরিমাণ হলো একশত আয়াত।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রিতে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করবে, তাকে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত বলা হবেনা। আর যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রিতে একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে তার নাম এবাদত গুজারদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। আর যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রিতে দু' শত আয়াত তেলাওয়াত করবে, কেয়ামতের দিন কোরআন মজীদ তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবেনা। আর যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রিতে পাঁচশত আয়াত পাঠ করবে, সে অশেষ সওয়াব লাভ করবে।

দারেমী হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত পাঠ করবে, সে রাতে কোরআন তার সাথে ঝগড়া করবেনা, আর যে ব্যক্তি এক রাতে দু' শত আয়াত তেলাওয়াত করবে তার জন্যে সারা রাত এবাদতের সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। যে ব্যক্তি পাঁচশ' থেকে এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্যে অশেষ সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রতি মাসে একবার কোরআনে করীম খতম কর।

আমি আরজ করলাম, আমি নিজের মধ্যে তার চেয়ে বেশী শক্তি রাখি।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাহলে বিশ দিনে এক খতম কর।

আমি আরজ করলাম, আমি এর চেয়ে বেশী শক্তি রাখি।

তখন তিনি এরশাদ করলেন, সাত রাতে (একবার কোরআন শরীফ খতম কর), এর চেয়ে বেশী করোনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাকের দৃষ্টিতে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো তা, যা সর্বদা করা হয়। যদিও ঐ আমল অতি সামান্যই হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত আরেকখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যতখানি সাধ্য ততখানি আমল শুরু কর, কেননা সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করলে তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাবে অথচ আল্লাহ পাক (সওয়াব প্রদানে) ক্লান্ত হবেন না।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যতক্ষণ দেহে শক্তি থাকে ততক্ষণ নামাজ আদায় কর, গাফলত এবং অলসতা আসলে বসে পড়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কারো (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ার সময় তার ঘুম আসতে থাকে তখন তার ঘুমিয়ে পড়া উচিত, যাতে করে ঘুমের প্রভাব চলে যায়, কেননা নিদ্রিত অবস্থায় নামায পড়লে সে জানবে না কী পড়েছে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ তোমরা নামায কায়েম কর।,

وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

'আর তোমরা যাকাত আদায় কর'।

আলোচ্য আয়াতে নামাযের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে যথা সময়ে যথানিয়মে যাকাত আদায় কর।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا .

'আর আল্লাহ পাককে করজে হাসানা প্রদান কর'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর দ্বারা যাকাত ব্যতীত অন্য দান খয়রাত উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেমন আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ব্যয় করা।

অথবা এর অর্থ হলো তোমরা ভালভাবে যাকাত আদায় কর।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, قرضا শব্দের পর حسنا শব্দ সংযোজন করে দান খয়রাতের সওয়াবের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

তাহাজ্জুদের নামাযের ব্যাপারে যে আদেশ ছিল তা রহিত করার পর নামায এবং যাকাত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বিশেষ তাগিদ করার তাৎপর্য হলো, তাহাজ্জুদের নামায নফল হলেও তোমরা ফরয নামায এবং ফরয যাকাত আদায়ে বিশেষ ভাবে যত্নবান হও। সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠা সহকারে পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং যাকাত আদায় কর, এতে কোন রকম গাফলত করা চলবে না। এর পাশাপাশি আল্লাহর রাহে দান করা, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে সাহায্য করাকে আল্লাহ পাককে ঋণ প্রদানের নামান্তর বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ط

'আর তোমরা নিজেদের উপকারার্থে যা কিছু কল্যাণকর কাজ করে পাঠাবে, তা অবশ্যই আল্লাহ পাকের নিকট পাবে। (আর যা পাবে) তা হবে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর'।

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়াতে যে কোন নেক আমলই করুক না কেন আল্লাহ পাকের দরবারে তা কখনও ব্যর্থ হবেনা, বরং কৃত নেক আমলের উৎকৃষ্টতর বিনিময় তাকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমাদের মধ্যে কার নিজস্ব অর্থ-সম্পদের চেয়ে উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ অধিকতর প্রিয়? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার নিকট তার উত্তরাধিকারীদের সম্পদের চেয়ে নিজের অর্থ সম্পদ প্রিয় নয়। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদর করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার অর্থ-সম্পদ তার ওয়ারিশের অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, তা কি কিরে সম্ভব হয়? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের সম্পদ তাই যা তোমরা আল্লাহর রাহে দান করে নিজের জন্যে প্রেরণ কর। আর উত্তরাধিকারীদের সম্পদ তাই যা তোমরা দুনিয়াতে রেখে যাও।

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

'তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

মূলতঃ মানুষ শত চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে আল্লাহ পাকের এবাদত করতে পারেনা, কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থেকেই যায়। এজন্যে এবাদতের পর তওবা এস্তেগফার করা অবশ্য কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ এতে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের প্রতি, মানুষ যেন তার নেক আমলের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর না করে; বরং নেক আমলের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কেননা মানুষ যত বড় নেক আমলই করুক এবং যত নিখুঁত এবং সুন্দরভাবেই করুক না কেন কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের মহান দরবারের শান মোতাবেক হয়না। তাই বন্দার কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া এবং নিজের ত্রুটি স্বীকার করা।

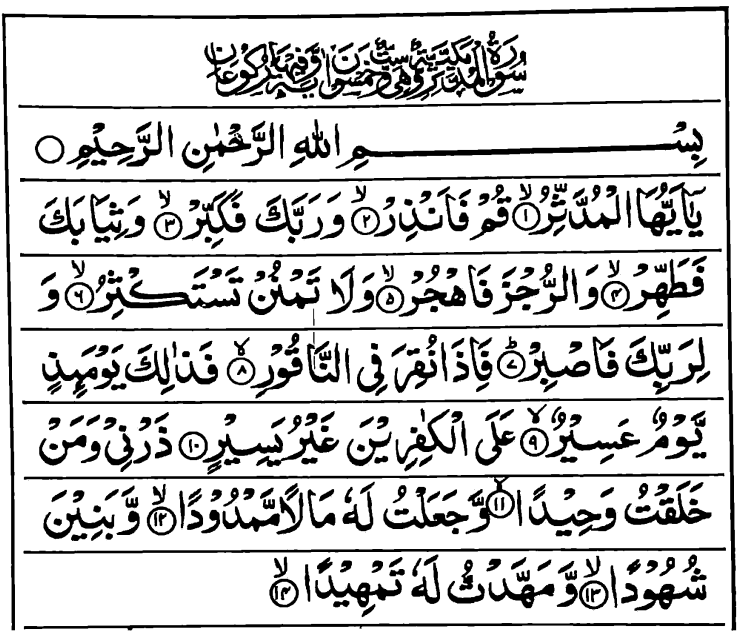
ক্ষমা প্রার্থনার এ আদেশের পাশাপাশি একথাও বলেছেন, অতীব দয়াবান। অর্থৎ তিনি মোমেনদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করেন, কেননা তিনি অত্যন্ত দয়াবান। তাঁর দয়ার কারণেই তিনি তাঁর বন্দাগণকে ক্ষমা করেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, غفرو শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক সকল গুনাহ মাফ করবেন। আর غفور এরপর رحيم শব্দটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক দয়া করে সামান্য আমলেরও অনেক বেশী সওয়াব দান করবেন।[১]

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৮৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৬৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুদ্দাস্‌সির


سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ سِتٌّ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ﴿۱﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ۙ﴿۲﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۙ﴿۳﴾ وَثِيَابَكَ

فَطَهِّرْ ۙ﴿۴﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۙ﴿۵﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۙ﴿۶﴾ وَ

لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۭ﴿۷﴾ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۙ﴿۸﴾ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ

يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ﴿۹﴾ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝﴿۱۰﴾ ذَرْنِيْ وَمَنْ

خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝﴿۱۱﴾ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿۱۲﴾ وَّبَنِيْنَ

شُهُوْدًا ۙ﴿۱۳﴾ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿۱۴﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হে বস্ত্রাবৃত (রসূল)!

(২) উঠুন, (কাফেরদেরকে) ভয় প্রদর্শন করুন।

(৩) আর আপনার পোষাক পবিত্র রাখুন।

(৪) আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।

(৫) আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।

(৬) আর অধিক পরিমাণে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দান করবেন না।

(৭) আর আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করুন।

(৮) অবশেষে যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে।

(৯) সেদিনই হবে অত্যন্ত কঠিন দিন।

(১০) যা কাফেরদের জন্যে আদৌ সহজ নয়।

(১১) আমাকে এবং আমি যাকে একা নিঃসঙ্গ সৃষ্টি করেছি, তাকে ছেড়ে দাও।

(১২) আমি যাকে অনেক ধন-সম্পদ দান করেছি।

(১৩) এবং দান করেছি নিত্য-সঙ্গী পুত্রদেরকে।

(১৪) এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের বহু উপকরণ।

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। দু' রুকু এবং ৫৬ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ২৫৫ বাক্য এবং ১০১০ খানি অক্ষর রয়েছে।

শানে নযুল

মক্কার অদূরে অবস্থিত গারে হেরায় সর্ব প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর প্রায় পৌনে তিন বছর বিশেষ কোন হেকমতের কারণে ওহী অবতরণ বন্ধ ছিল। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধীর আগ্রহে ওহী অবতরণের অপেক্ষা করতেন, এমনকি কখনো ব্যাকুল হয়ে মক্কা নগরী থেকে বের হয়ে যেতেন। হঠাৎ একদিন তিনি কিছু শব্দ শ্রবণ করলেন, কেউ যেন তাঁকে ডাকে, তিনি অগ্র-প্রশ্চাতে, ডানে-বামে তাকালেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না, অবশেষে তিনি উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সেই ফেরেশতাকে, যিনি ইতোপূর্বে হেরা গুহায় এসেছিলেন, তিনি আসমানে উপবিষ্ট রয়েছেন, যা আসমানের এক প্রান্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে এক প্রকার ভয়-ভীতির উদ্রেক হলো, যা হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিল হবার সময়ও হয়েছিলো। ঐ অবস্থায় তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বললেন, دثرونى دثرونى(আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও)।

ঐ সময়ই এ সূরার প্রথম পাঁচখানি আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (হে বস্ত্রাবৃত!) বলে সম্বোধন করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের কত নৈকট্য-ধন্য তা এর দ্বারা কিছুটা আঁচ করা যায়। আর এ কারণেই এ সূরার "মুদ্‌দাস্‌সির" নামকরণ করা হয়েছে।

ইয়াহয়া এবনে কাসীর বর্ণনা করেন, আমি আবু সালমা এবনে আবদুর রহমান (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সর্বপ্রথম কোরআনে করীমের কোন্ অংশটি নাযিল হয়েছে? আবু সালমা (রা.) বললেন, আল মুদ্‌দাস্‌সির। আমি বললাম, লোকেরা তো বলে, اقرا باسم ربك প্রথম নাযিল হয়েছে। তখন আবু সালমা (রা.) বললেন, আমি হযরত যাবের (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি। হযরত যাবের (রা.) এ মতই পোষণ করতেন যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদ্‌দাস্‌সিরের এ আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরামের মতে, اقرا باسم ربك সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে।

মূলতঃ ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরপর বলেছেন, সর্ব প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘ দিন ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে, এরপর সর্ব প্রথম সূরা মুদ্‌দাস্‌সির নাযিল হয়। হযরত যাবের (রাঃ) এ মর্মেই বলেছেনঃ সর্ব প্রথম সূরা মুদ্‌দাস্‌সির নাযিল হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে মতভেদের আর কোন অবকাশ রইলনা।[১]

এ সূরার আমল

সূরা মুদ্‌দাস্‌সির পাঠ করে কোরআন শরীফ কণ্ঠস্ত করার জন্যে দোয়া করলে ইনশাআল্লাহ হেফজ করা সহজ হয়ে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, সে সূরা মুদ্‌দাস্‌সির পাঠ করছে তবে সে অভাবগ্রস্ত হবে।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় বিশেষভাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের মর্যাদা এবং তাঁর মহান দায়িত্বের উল্লেখ করে তওহীদের বাণী পৌছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। নবুওয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ সম্পর্কে কয়েকটি মৌল নীতি যথা সংকল্পের দৃঢ়তা, সবর অবলম্বন এবং ক্ষমা ও ঔদার্যের নীতি গ্রহণের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এই সঙ্গে সুস্পষ্ট ভাবে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, পাপীষ্ঠরা যেন এ ধোঁকায় না থাকে যে, তাদেরকে কেউ পাকড়াও করবেনা, বরং কাফের, মুশরেক, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞদেরকে কঠোর শাস্তি

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১১৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৮৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৬৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪০৯-১০

ভোগ করতে হবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণকে আল্লাহ্ পাক পরকালীন জীবনে পুরস্কৃত করবেন, এমনিভাবে এ সূরায় কোরআনে করীমের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ ۝

'হে বস্ত্রাবৃত (রসূল)! উঠুন, (কাফেরদেরকে) ভয় প্রদর্শন করুন'।

قُمْ

(হে রসূল!) উঠুন, অর্থাৎ আপনার বিছানা থেকে উঠুন, নবুওয়্যত ও রেসালতের মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে উঠুন। সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মনোবল নিয়ে সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে দাঁড়ান। (হে রসূল!) আপনাকে আর নীরব থাকলে চলবেনা; কেননা আল্লাহ্ পাকের বন্দাগণ পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অতএব উঠুন তাদেরকে সাবধান করুন, কাফের মুশরেকদেরকে আল্লাহ্ পাকের আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন করুন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

'এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন'।

এর তাৎপর্য হলো, সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করা এবং তাঁর এবাদতে কোন কিছুকে শরীক না করা। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বায় এবং তাঁর গুণাবলীতে কোন কিছুকে তাঁর দৃষ্টান্ত মনে না করা। আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি এ বিশ্বাস স্থাপন করা মানুষ মাত্রেরই প্রধানতম কর্তব্য। এজন্যেই নামাযে তকবীরে তাহরীমাকে ফরজ ঘোষণা করা হয়েছে। আর একথার প্রমাণ হিসেবে আলোচ্য আয়াত পেশ করা হয়েছে। মূলতঃ তওহীদে বিশ্বাস করার বা স্বীকৃতির নামই হলো তকবীর। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহু আকবর বলেই নামায শুরু করতেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক কোন ব্যক্তির নামায সে পর্যন্ত কবুল করেন না, যে পর্যন্ত সে সঠিকভাবে অজু করে কেবলা রোখ না হয় এবং আল্লাহু আকবর না বলে। আল্লাহু আকবর বলার তাৎপর্য হলো আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কথা প্রকাশ করা। তাই শুধু মুখে নয়; বরং আচার-আচরণে, কথায় ও কাজে এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা একান্ত কর্তব্য।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

'আর আপনার পোষাক পবিত্র রাখুন'।

এর একটি প্রকাশ্য অর্থ হলো, স্বীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখুন।

অথবা এর অর্থ হলো, নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন।

কাতাদা (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), ইব্রাহীম (রঃ), যাহ্যাক (রঃ), শা'বী (রঃ) এবং জহুরী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, নিজ নিজ আমল ঠিক করে নাও।

আর সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, নেক আমলকারী মানুষকে পবিত্র পোষাক পরিধানকারী বলা হয়। আর বদকার মানুষকে অপবিত্র পোষাকধারী বলা হয়।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো, মন ও গৃহকে পবিত্র কর।

আর হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, নৈতিক গুণাবলী অর্জন কর।

এবনে সীরিন এবং এবনে যায়েদ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখারই আদেশ দেয়া হয়েছে, কেননা মুশরেকরা তাদের পোষাক পবিত্র রাখত না।

আর তাউস (রঃ) বলেছেন, নিজের ব্যবহারের পোষাককে সুদীর্ঘ করোনা, কেননা পোষাকের দৈর্ঘ কখনো কখনো অপবিত্রতার কারণ হয়। এক কথায় দৈহিক ও আর্থিক সর্ব প্রকার পবিত্রতা অর্জনই মানুষের উন্নতি-অগ্রগতি লাভের অন্যতম সোপান।

যদিও আলোচ্য আয়াতে পোষাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তবু একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, যখন পোষাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, তখন দেহ ও মনের পবিত্রতা অর্জন যে একান্ত কর্তব্য, একথা বলার অপেক্ষ রাখেনা।

বস্তুতঃ নামাজ হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, আল্লাহ পাক পবিত্র, তাই নামাজীর পোষাক-পরিচ্ছদ, দেহ-মন, নামাজের স্থান এক কথায় সব কিছু পবিত্র রাখা একান্ত জরুরী।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

'আর অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।'

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ), কাতাদা (রঃ), জুহরী (রঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) এবং আবু সালমা (রাঃ) প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, رجز অর্থ মূর্তি, অর্থাৎ মূর্তিগুলোকে বর্জন কর, এগুলোর কাছেও যেয়োনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো পাপাচার পরিহার করা।

আবুল আলীয়া এবং রবী বলেছেন, رجز অর্থ মূর্তি, আর رجز অর্থ অপবিত্রতা এবং গুনাহ, এগুলো পরিহার কর।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ শেরক, অর্থাৎ তোমরা শেরক বর্জন কর।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আযাব, অর্থাৎ তোমরা এমন আকীদা বিশ্বাস এবং কর্ম বর্জন কর, যা আযাবের কারণ হতে পারে।

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

'আর অধিক পরিমাণে পাওয়ার আকাঙক্ষায় দান করবেন না'।

তফসীরকারগণ এ বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন।

১. এ উদ্দেশ্যে মানুষকে নিজের সম্পদ দিওনা যে, তোমাদেরকে তা অধিক পরিমাণে দেয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ মতই পোষণ করেছেন।

২. কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো জাগতিক বিনিময় প্রাপ্তির লোভে কাউকে কিছু দিওনা; বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য দিও।

৩. হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নিজের নেক আমলকে অনেক বেশী মনে করে আল্লাহ পাকের প্রতি নিজের আমলের এহসান রেখোনা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) একথাও বলেছেন, আমলকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে অধিক মনে করোনা, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের মোকাবেলায় তোমার আমল অতি সামান্য।

৪. মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো অধিক পরিমাণ কল্যাণের অন্বেষণে নিজেকে দুর্বল মনে করোনা।

৫. এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক বলেছেন, (হে রসূল) নবুওয়্যতের এহসানের বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে জাগতিক কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন না।

(৬) আর এ ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, নিজের দানকে বড় মনে করে দরিদ্র মানুষের প্রতি এহসান রাখবেন না।[১]

বস্তুতঃ মানুষের প্রতি মানুষের অনুগ্রহ, দয়া-দাক্ষিণ্য অত্যন্ত মহৎ কাজ, কিন্তু এই মহৎ কাজের প্রতিদানে অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করা আদৌ উন্নত আদর্শের পরিচায়ক নয়। মানুষ একে অন্যকে সাহায্য করবে, এটিই স্বাভাবিক এবং সুন্দর কিন্তু কোন প্রকার বিনিময়ের আশায় তা করবেনা, বিনিময় পাওয়া যাবে তবে বন্দার কাছ থেকে নয়; বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে। শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই যাবতীয় কল্যাণকর কাজ হতে হবে।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

'আর আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করুন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহান বাণী মানুষের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে যে দুঃখ-কষ্ট আসে, তাতে সবর অবলম্বন করুন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো নবুওয়্যতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সব দুঃখ-যাতনা ভোগ করতে হয়, তাতে সবর অবলম্বন করুন।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, (হে রসূল!) আপনার উপর আরব-আজম তথা সমগ্র বিশ্বের মোকাবেলা করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ বিরাট দুর্বহ দায়িত্ব পালনে সবর অবলম্বন করুন।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যা হুকুম আসে, তা পালনে সবর অবলম্বন করুন।

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۞ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۞ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞

'অবশেষে যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে, সেদিনই হবে অত্যন্ত কঠিন দিন, যা কাফেরদের জন্যে আদৌ সহজ নয়।'

দুনিয়াতে কিছুকাল মানুষকে অবস্থানের সুযোগ এবং ভোগ-সম্পদ দেয়া হয়েছে। এ সীমিত সময়ের জন্যে মানুষকে কর্মের স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। এ সুযোগে যে যা-ই করুক না কেন, অবশেষে কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার আমল নিয়ে হাযির হতে হবে এবং ঈমান ও নেক আমল থাকলে তার শুভ পরিণতি ভোগ করার সুযোগ আসবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৬৮

পক্ষান্তরে, ঈমান ও নেক আমল না থাকলে অবশ্যই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

এ আয়াতে কেয়ামতের ঘোষণার কথাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

'অবশেষে যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনকার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, সেই কঠিন দিনের কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত, সেদিনই হবে অত্যন্ত কঠিন দিন, যা কাফেরদের জন্যে আদৌ সহজ নয়'।

আলোচ্য আয়াতের "নাকুর" শব্দটি "নকরুণ" থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হলো আওয়াজ করা, কোন জিনিসকে এমনভাবে করাঘাত করা যে, অবশেষে তাতে ছিদ্র হয়ে যায়।

এবনে হাব্বান "কিতাবুল আজমতে" ওহাব এবনে মোনাব্বেহর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাক সাদা চমকদার একটি মুক্তা থেকে শিংগা সৃষ্টি করেছেন, এরপর আরশকে আদেশ দিয়েছেন শিংগাকে ধরে রাখ, তখন শিংগা আরশের সাথে ঝুলে রইল, এরপর আল্লাহ পাক كن বললেন, তখন ইস্রাফীল (আঃ) পয়দা হলেন, আল্লাহ পাক তাঁকে শিংগা গ্রহণ করার আদেশ দিলেন, হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তাই করলেন, শিংগায় যত রুহ সৃষ্টি হয়েছে তার সংখ্যা অনুযায়ী ছিদ্র রয়েছে। একটি ছিদ্র দিয়ে দু'টি রুহ বের হবেনা, শিংগার মধ্যস্থলে একটি গোলাকার ছিদ্র রয়েছে, হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তাতে মুখ রেখে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, কেয়ামতের জন্যে ঘোষণা দেয়ার দায়িত্ব আমি তোমার প্রতি অর্পণ করেছি।

হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তখন আরশের সম্মুখভাগে প্রবেশ করেন, ডান পা আরশের নীচে এবং বাম পা আরশের অভ্যন্তরে রেখে আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আহমদ এবং তিরমিজী হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কিভাবে বিশ্রাম করবো, অথচ শিংগায় ফুঁকদানকারী শিংগায় মুখ দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কখন তার প্রতি শিংগায় ফুঁক দেয়ার আদেশ হয়। একথাটি সাহাবায়ে কেরামের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হলো, কেননা যখন হযরত

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরেই শান্তি নেই, তখন আমাদের কী অবস্থা হওয়া উচিত? আমরা কোথায় রয়েছি, আর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোথায়? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ কর।

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ

'সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন'।

অর্থাৎ কাফেররা দুনিয়াতে যত আনন্দ-উল্লাসই করুক না কেন যখন কেয়ামতের পূর্বক্ষণে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে সেদিন তাদের জন্যে হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর, ভয়াবহ। কাফেরদের জন্যে তা কোন অবস্থাতেই সহজ হবেনা, সেদিন তাদের কোন কষ্ট লাঘব করা হবেনা। তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কখনো নাজাত পাবেনা।

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۞

'আমাকে এবং আমি যাকে একা নিঃসঙ্গ সৃষ্টি করেছি, তাকে ছেড়ে দাও'।

মায়ের গর্ভ থেকে সকলেই একা জন্ম গ্রহণ করে এবং নিঃসঙ্গ অবস্থাই তখন থাকে, এরপর অবশ্য ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব জুটে যায়। ওলীদ এবনে মগীরা নামক যে কাফের তখন মক্কায় ছিল, আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ওলীদ ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি, অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সে পরিগণিত হতো। তার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অনেক, ক্ষেত-খামার, জীব-জন্তুও ছিল প্রচুর।

মুজাহেদ এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, তার নিকট হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল।

কাতাদা (রঃ)-ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

সুফিয়ান বলেছেন, তার নিকট লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তায়েফে ওলীদের একটি বাগান ছিল। তাতে সারা বছর ফল ধরত। মক্কা এবং তায়েফের মধ্যে তার উষ্ট্র, অশ্ব এবং বকরী থাকত, অনেক ঝর্ণা, গোলাম-বাদী তার মালিকানায় ছিল। এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۞

'যাকে আমি বহুল পরিমাণে ধন-সম্পদ দিয়েছি'।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۞ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۞

'আর তাকে দিয়েছি এমন সন্তান, যারা ছিল তার নিত্য-সঙ্গী এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ'।

সন্তাদের উপজীবিকার অন্বেষণে তাদের কোথাও গমনের প্রয়োজন হতো না। সব কিছু ছিল তাদের হাতের নাগালেই। ওলীদের দশ পুত্র ছিল।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, পুত্রদের সংখ্যা ছিল সাত (১) ওলীদ এবনে ওলীদ (২) খালেদ (৩) আম্মারা (৪) হিশাম (৫) আস (৬) কায়েস (৭) আবদুস শামস। তাদের মধ্যে খালেদ, আম্মারা এবং হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ধন-সম্পদ, সন্তান এবং তার শান-শওকত এসবই ছিল তার প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান, কিন্তু সে দানের জন্যে শোকর গুজার হয়নি, বরং সে ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ।

শানে নযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন এ আয়াত–

حٰمٓ ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.....لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে এ আয়াত সমূহ পাঠ করলেন। পাশেই ছিল ওলীদ এবনে মুগীরা। সে এ আয়াতের পাঠ শ্রবণ করছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার এ আয়াত সমূহ পাঠ করলেন, তখন ওলীদ এবনে মগীরা তার গোত্র বনী মখজুমের মজলিসে গিয়ে বললো, আমি এই মাত্র মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিকট এমন বাণী শ্রবণ করেছি যা মানুষের কথা নয়, এমনকি, জ্বীনের কথাও নয়, এতে দারুণ আকর্ষণ রয়েছে এবং রয়েছে সৌন্দর্য। সে একদিন বিজয়ী হবে, পরাজিত হবেনা, একথা বলে সে নিজ গৃহে চলে যায়। কোরায়শের লোকেরা তার উক্তি শ্রবণ করে বললো, ওলীদ তার পূর্ব পুরুষের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে (যদি এ অবস্থা হয় তবে

কোরায়শের সমস্ত লোকই ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে)। এসব কথা শুনে আবু জেহেল বললো, তোমাদের এ বিপদ আমি দূর করে দেব, এরপর আবু জেহেল ওলীদের নিকট গমন করলো এবং অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন চেহারা নিয়ে তার নিকট বসে গেল। ওলীদ জিজ্ঞাসা করলো, হে আমারা ভ্রাতঃস্পুত্র! তুমি এত চিন্তিত কেন? আবু জেহেল বললো, চিন্তিত না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে, কেননা কোরায়শের লোকেরা একত্রিত হয়ে আপনার বৃদ্ধ কালেও আপনার প্রতি অপবাদ দিচ্ছে। তারা বলে যে, আপনি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কথাকে অত্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছেন। আপনি এবনে আবি কাহাফার (হযরত আবুবকর) নিকট এজন্যে গমন করেন, যেন তাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করতে পারেন।

ওলীদ এসব কথা শুনে রাগান্বিত হলো এবং বললো, কোরায়শ কি জানেনা যে আমি অত্যন্ত সম্পদশালী ব্যক্তি, আমার অনেক সন্তান-সন্ততি রয়েছে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর নিকট উচ্ছিষ্ট কোথায়? এরপর সে আবু জেহেলকে নিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের মজলিসে আসল এবং বললো, তোমাদের ধারণা এই যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পাগল, তাঁকে কেউ কখনো পাগলের মত কথা বলতে শুনেছো? উপস্থিত লোকেরা জবাব দিলো, না। ওলীদ বললো, তোমাদের ধারণা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) গণক, তাঁকে কি কখনো কেউ গণকের কাজ করতে দেখেছো? লোকেরা বললো, খোদা স্বাক্ষী, কেউ দেখেনি, ওলীদ বললো, তোমরা বল মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কবি, তোমরা কখনো তাঁকে কাব্য রচনা করতে দেখেছ? লোকেরা বললো, খোদার শপথ! না। তোমরা বল, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মিথ্যাবাদী, কিন্তু তোমরা কি কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখেছ? তারা বললো, আল্লাহর শপথ! মোটেই নয়। তাঁর সত্যবাদিতার জন্যে নবুওয়্যতের পূর্বে আরববাসী তাঁকে আল্ আমীন খেতাবে ভূষিত করেছিল। এরপর কোরায়শের লোকেরা ওলীদকে বললো, তাহলে তিনি কি? একথা আপনিই-বলুন। তখন ওলীদ কিছুক্ষণ চিন্তা করলো এবং বললো, সে যাদুকর। তোমরা দেখেছ, সে তাঁর কথার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী, পিতা এবং সন্তান এবং ভাইয়ের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে দেয়।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ ঘটনার পরই আলোচ্য আয়াত ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا নাযিল হয়েছে।[১]

এ আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, আমি তাকে একা সৃষ্টি করেছি, যখন সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে তখন তার অর্থ সম্পদও ছিলনা, সন্তান-সন্ততিও ছিলন, এসব কিছু তাকে আল্লাহ্ পাকই দান করেছেন। কিন্তু সে আল্লাহ্ পাকের অকৃতজ্ঞ হয়েছে, অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহর প্রেরিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধী হয়েছে, তাঁকে যাদুকর বলেছে। মক্কাবাসী তাকে وحيد বলতো, কেননা অর্থ সম্পদে, জনশক্তিতে কেউ তার সমকক্ষ ছিলনা, আর সেজন্যে সে নিজেকে গর্বিত মনে করতো।

আবু সায়ীদ জরীর বলেছেন, وحيد সে ব্যক্তি যার পিতা নির্দিষ্ট নয়।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ইতোপূর্বে সূরায়ে কলমে زنيم শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, وحيد শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯১-৯২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৭০-৭১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-(৬), পৃষ্ঠা-৩১৩-১৪
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-১৯৮

ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ
أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُ
صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ
يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ
سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِي وَ
لَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(১৫) এরপরও সে চায় যে, আমি তাকে আরও অধিক পরিমাণে দেই।

(১৬) তা কখনও নয়। নিশ্চয় সে ছিল আমার আয়াত সমূহের বিরোধী।

(১৭) অচিরেই আমি তাকে দোযখের পর্বতে চড়ারো।

(১৮) সে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(১৯) সে নিপাত যাক! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো?

(২০) সে আরও অভিশপ্ত হোক! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো?

(২১) এরপর সে আবার তাকিয়ে দেখে।

(২২) এরপর সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে এবং মুখ বিকৃত করে।

(২৩) এরপর সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে এবং অহংকার করে।

(২৪) সে বলে, এ-তো কিছুই নয়, এটি পূর্ব প্রচলিত যাদু মাত্র।

(২৫) এটি তো মানুষেরই কথা।

(২৬) আমি তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করবো।

(২৭) (হে রসূল!) আপনার কি জানা আছে, অগ্নিকুন্ড কি?

(২৮) তা তাদেরকে জীবিতও রাখবে না মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না।

(২৯) তাতো দেহের চর্মকে দগ্ধ করবে।

(৩০) ঐ অগ্নিকুন্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সূহের ন্যায় এ আয়াতেও মক্কার কুখ্যাত কাফের ওলীদ এবনে মগীরা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ

'এরপরও সে চায় যে, আমি তাকে আরও অধিক পরিমাণে দেই'।

ওলীদ এবনে মগীরাকে আল্লাহ পাক অনেক নেয়ামত দান করেছিলেন, তার কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়া, কিন্তু সে ছিল অবাধ্য অকৃতজ্ঞ. অর্থ সম্পদ এবং ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মত্ত, দান পেয়ে সে স্বয়ং দাতাকেই ভুলে যায়, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অপরিমিত নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আহবান জানালে, সে তাতেও অস্বীকৃতি জানায়। সে আরো বলে, এই লোকটি কেয়ামতের যে কথা বলছে যদি তা সত্য হয়, তবে আখেরাতেও আমি এমনিভাবে প্রচুর নেয়ামতের অধিকারী হবো। তার মনে যে লোভ-লালসা জাগ্রত ছিল, তারই কারণে সে এমনি ভিত্তিহীন আস্ফালন করে। এমন আশা যে সম্পূর্ণ দূরাশা মাত্র তা বলার অপেক্ষা রাখেনা, তাই এরপরই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَلَّا

কখনও নয়! অবশ্যই নয়, আর কখনও আল্লাহ পাক এমন অকৃতজ্ঞ নেমকহারামকে কিছুই দান করবেন না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এরপর থেকে ওলীদ এবনে মগীরার আর্থিক দুরবস্থা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে সে নিঃস্ব এবং কপর্দকশূণ্য হয়ে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেয়, কেননা সে ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান।

اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۞

'নিশ্চয় সে ছিল আমার আয়াত সমূহের বিরোধী'।

সে কোরআনে করীমকে যাদু বলতো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাদুকর বলতো, তাই তার শাস্তি অবধারিত, পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে.

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا

'অচিরেই আমি তাকে দোযখের পর্বতে চড়াবো'।

তফসীরকারগণ বলেছেন, صعود দোযখের একটি পর্বত, সকল আযাব থেকে এই আযাব হবে কঠিনতর, ভয়াবহ।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, صعود হলো দোযখের একটি পাহাড়, ওলীদকে সে পাহাড়ে আরোহনের আদেশ দেয়া হবে। যখন সে তার হাত তাতে রাখবে তখন তার হাত গলে যাবে। আর যখন হাত উঠিয়ে নেবে তখন তা আবার পূর্বের মত হয়ে যাবে। আর যখন সে পা রাখবে তখন তার পা গলে যাবে। যখন পা উঠিয়ে নেবে তখন তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ)-এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, صعود দোযখের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি পাহাড়, ওলীদ ৭০ বছর যাবত তাতে আরোহন করতে থাকবে, এরপর তার নিম্নদেশে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরদিন এ অবস্থাই থাকবে।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, صعود হলো দোযখের একটি উপত্যকা, ওলীদকে তাতে আরোহনের হুকুম দেয়া হবে। উপর থেকে লৌহ নির্মিত জিঞ্জির দ্বারা তাকে টানা হবে, আর নীচ থেকে হাতুড়ি দ্বারা তাকে প্রহার করা হবে। চল্লিশ বছর যাবত উপরের দিকে উঠতে থাকবে, যখন উচ্চ চূড়ায় পৌঁছে যাবে তখন তাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর পুনরায় উপরের দিকে উঠার আদেশ হবে এবং উপর থেকে টেনে তোলা হবে। এরপর পেছন থেকে প্রহার করা হবে। এ অবস্থা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১২৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৪

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

'সে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে'।

ওলীদ এবনে মগীরা কোরআনে করীমের সমালোচনা করতে গিয়ে চিন্তা করে যে, কোরআনে করীমের বিরদ্ধে সে কী বলবে। কোরআনে করীমের প্রতি তার মনে যে বিদ্বেষ ছিল তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

'সে নিপাত যাক! অভিশপ্ত হোক, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো?'

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

'সে আরো অভিশপ্ত হোক! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো'?

যেহেতু কোরআনে করীম সম্পর্কে কুখ্যাত ওলীদ এবনে মগীরা বলেছে যে, এটি যাদু, তাই তার সম্পর্কে বলা হয়েছে সে অভিশপ্ত হোক, কেমন করে সে এমন আপত্তিকর, অলীক, অন্যায় মন্তব্য করলো?

ثُمَّ نَظَرَ ۝

এরপর সে উপস্থিত লোকদের চেহারার দিকে দেখল, তা এজন্যে যে তারা তার কোরআন বিরোধী আচরণে তার প্রশংসা করে।

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝

এরপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করে এবং মুখ বিকৃত করে, কেননা সে পবিত্র কোরআনের বিরুদ্ধে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বলার মত কিছুই যখন পেলনা, তখন সে ভ্রু কুঞ্চিত করে।

ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝

'এরপর সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলো এবং দম্ভ প্রকাশ করলো'।

এরপর সে বললো–

فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۝

এটি তো শুধু পূর্ব প্রচলিত যাদু মাত্র, অর্থাৎ ইতোপূর্বেও এমন যাদু ছিলো আর এখনো সে যাদুই পেশ করা হচ্ছে।

দূরাত্মা অহংকারী ওলীদ এবনে মুগীরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এ ভিত্তিহীন মন্তব্য করলো যে এটি হলো যাদু, পূর্বকালেও এমন যাদু ছিলো, যুগ যুগ ধরে তা এভাবেই চলে আসছে। এরপর সে বললোঃ

اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ۝

'এটিতো মানুষেরই কথা'।

ওলীদ এবনে মগীরা কোরআনে করীমকে আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী বলে বিশ্বাস করেনি, মানুষের কথা বলে মন্তব্য করেছে, তাই পরবর্তী আয়াতে তার শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছেঃ

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ۝

'আমি তাকে অচিরেই "সাকার" নামক দোযখে নিক্ষেপ করবো'।

"সাকার" হলো দোযখের অন্যতম নাম। তাকে চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا سَقَرُ۝

'(হে পাঠক) তুমি কি জান সাকার কি'?

"সাকার" নামক দোযখের শাস্তির ভয়াবহতা প্রকাশ করতেই এভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, 'তুমি কি জান সাকার কি'?

পরবর্তী আয়াতে সাকার নামক দোযখের শাস্তি সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ۝

'তাদেরকে জীবিতও রাখবে না, মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেবে না'।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সাকার দোযখ এমন ভয়াবহ যে, সে কাউকে জীবিত রাখেনা আর মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দেয়না। যখন কোন দোযখী তাতে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তার দেহকে নতুন ভাবে গঠন করা হয়।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি জিনিসেরই তেজ এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সাকার নামক দোযখের তেজ কখনো কমবে না। দোযখের শাস্তি কত কঠিন, কত ভয়াবহ তা কল্পনাতীত।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ۝

'তাতো দেহের চর্মকে দগ্ধ করবে, সাদা চামড়াকে জ্বালিয়ে কালো করে দেবে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেন, সাকার নামক দোযখ তার অধিবাসীদের চর্মকে জ্বালিয়ে শেষ করে দেবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝

'ঐ অগ্নিকুন্ডের তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী'।

এবনে ওহাব (রঃ) যায়েদ এবনে আসলামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দোযখের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত এ উনিশজন ফেরেশতার দু' কাঁধের মধ্যে এক বছরের দূরত্ব থাকবে, তাদের অন্তর থেকে দয়া বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ফেরেশতা সত্তুর হাজার কাফেরকে দোযখের যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিক্ষেপ করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ উনিশজন ফেরেশতা হলেন কর্মকর্তা পর্যায়ের। তাদের অধীনে কত আমলা থাকবে তা এক আল্লাহ পাকই জানেন। আর এ উনিশজনের মধ্যে যিনি প্রধান তার নাম হলো মালিক।

দোজখের প্রহরী উনিশজন কেন?

উনিশজনের এ সংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আযীয (রঃ) লিখেছেন, দোযখের আযাবের ক্ষেত্রে উনিশ প্রকার দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের জন্যে একজন ফেরেশতার প্রতি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। একজন ফেরেশতা এত কাজ করতে পারে যা লক্ষ লক্ষ লোকও করতে পারেনা। কিন্তু ফেরেশতার শক্তি যত বেশি থাকুক না কেন, তার কর্মের গন্ডি সুনির্দিষ্ট রয়েছে। যাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার বাইরে তার কিছুই করার নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, হযরত আজরাইল (আঃ) মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করতে পারেন। কিন্তু মাতৃ-গর্ভে একটি প্রাণও সঞ্চার করতে পারেন না। এমনিভাবে হযরত জিব্রাইল (আঃ) মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পাকের বাণী তাঁর নবী রসূলগণের নিকট পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু এক ফোঁটা পানি আসমান থেকে বর্ষণ করতে পারেন না, কেননা এটি হযরত মিকাঈল (আঃ)-এর দায়িত্ব। এর দৃষ্টান্ত এমন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ পাক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেমন কর্ণ সকল শব্দ শ্রবণ করতে পারে, কিন্তু কোন কিছুই দেখতে পারেনা। চক্ষু কিছুই শ্রবণ করতে পারেনা, কিন্তু সব কিছুই সে দেখতে পারে। ঠিক এমনিভাবে প্রত্যেক ফেরেশতাকে যে প্রকার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে দায়িত্বই ঐ ফেরেশতা পালন করে। অন্যের দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য করার কোন সুযোগ তার নেই । এতে একথা প্রমাণিত হয়, দোযখে উনিশ প্রকার

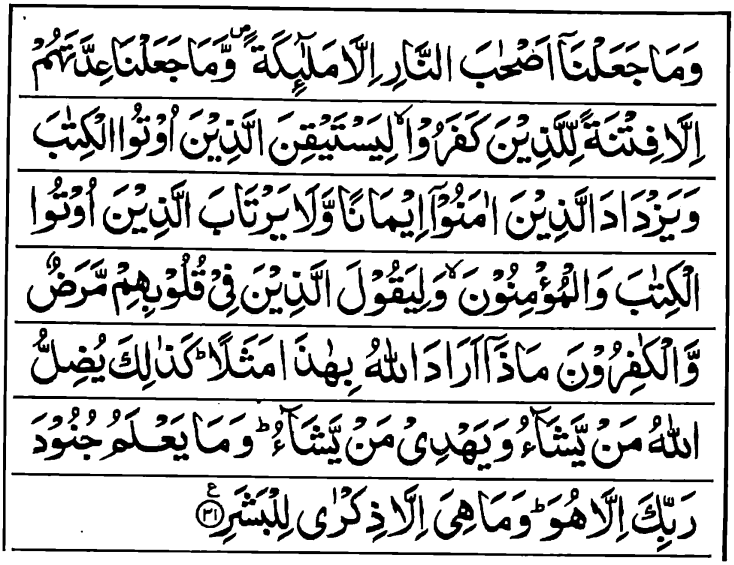
আযাব হবে। আর প্রত্যেক প্রকার আযাবের জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়েছে। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সদা সর্বদা সক্রিয় থাকে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক দোযখের ব্যবস্থাপনায় উনিশ জন ফেরেশতার যে কথা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন, এর ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ বলেছেন, تسعة عشر এরপর আর একটি কথা উহ্য থাকতে পারে, আর তা হলো صنفا অর্থাৎ উনিশ প্রকার ফেরেশতা।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, تسعة عشر এরপর صف শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ উনিশ কাতার ফেরেশতা।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, উনিশ জনের প্রধান হলেন মালিক নামক ফেরেশতা, তার সাথে রয়েছেন আঠারো জন শক্তিশালী ফেরেশতা, তাদের চক্ষুগুলো বিদ্যুতের ন্যায়, তাদের চুলগুলো তাদের পা স্পর্শ করে, তাদের মুখ থেকে অগ্নি নির্গত হয়, তাদের দু' কাঁধের মধ্যে দূরত্ব হলো এক বছরের, তাদের যে কোন একজন এক সঙ্গে সত্তর হাজার লোককে পাকড়াও করে দোযখে ফেলতে পারে।[২]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৬
২। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২০৩


وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ
اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ
رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝۳۱

তরজমা

(৩১) আর আমি শুধু ফেরেশতাদেরকেই দোযখের প্রহরী নিযুক্ত করেছি এবং কাফেরদের পরীক্ষার জন্যেই তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট রেখেছি, যারা কিতাব পেয়েছে, যাতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং ঈমানদারগণের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়, আহলে কিতাব এবং মোমেনগণ যেন সন্দেহে পতিত না হয়, এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং কাফেররা বলবে, আল্লাহ পাক এমনি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কি বোঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউ জানেনা, দোযখের এ বর্ণনা তো মানুষের জন্যে বিশেষ সতর্কবাণী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তফসীরুল কোরআন

দোযখের ব্যবস্থাপনায় উনিশ জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন, একথা শ্রবণ করে কাফেররা বিদ্রুপ করে বললো, উনিশ জন আমাদের কি করতে পারে? এদের একজনের বিরুদ্ধে না হয় আমাদের দশ জন দাঁড়িয়ে যাবে। একজন কাফের দম্ভ প্রকাশ করে বললো, আমি একাই সতের জনকে শেষ করতে পারি, বাকি দু'জনের মোকাবেলা করবে তোমরা সকলে। কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথা-বার্তার জবাবে

এ আয়াত নাযিল হয়েছে। মূর্খ লোকেরা এ সত্য উপলব্ধি করেনি, মানুষ ও ফেরেশতার মোকাবেলা কখনও হতে পারেনা। একটি দেশকে, একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্যে একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট। ইতিহাস সাক্ষী! হযরত লূত (আঃ)-এর বসতিকে একজন ফেরেশতা উপরে তুলে মাটিতে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং ক্ষণিকের মধ্যে ঐ জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বায়হাকী এবনে এসহাকের সূত্রে লিখেছেন, যখন এ আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল হয় তখন আবু জেহেল কোরায়শকে বললো, তোমাদের দশ দশটি মানুষও কি দোযখের একজন প্রহরীর মোকাবেলা করতে পারবে না, সেখানেতো মাত্র ঊনিশ জন প্রহরীই থাকবে, তোমরাতো বেশ শক্তিশালী। আবুল আসাদ এবনে কাল্‌দা জামহী বললো, সতেরো জন প্রহরীর জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, দশজনকে পেছন থেকে আর সাতজনকে সামনে থেকে বেধে নেব, আর দুজনের মোকাবেলা তোমরা সকলে করবে। তখন আলোচ্য আয়াত وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً নাযিল হয়।

বায়হাকী সুদ্দী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যখন عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ আয়াত নাযিল হয় তখন এক ব্যক্তি যাকে আবুল আসাদাইন বলা হতো সে বললো, হে কোরায়শ গোত্র! তোমাদের এ উনিশ জন ফেরেশতাকে ভয় করা উচিত নয়, আমি একাই এ ঊনিশ জনের মোকাবেলা করবো এবং তোমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দেব, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ص

'আর আমি শুধু ফেরেশতাদেরকেই দোযখের প্রহরী নিযুক্ত করেছি'।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১২৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৫-৯৬
তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২০৩-০৪
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১০১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩

এর কয়েকটি হেকমত বর্ণিত হয়েছেঃ

১. অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই এ ফেরেশতাগণকে নিযুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু তারা অন্য সৃষ্টি, তাই যাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তাদের প্রতি ঐ ফেরেশতাদের কোন দয়া মায়া হবেনা। পক্ষান্তরে, মানুষের জন্য নবী রসূল হিসেবে মানুষই প্রেরণ করা হয়েছে, যেন মানুষের জন্যে তাঁদের অন্তরে দয়া মায়া থাকে।

২. ফেরেশতাগণ এমন এক সৃষ্টি যারা কখনও আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেনা, যারা সর্বদা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকে।

৩. ফেরেশতাগণের শক্তি জ্বীন ও মানুষের শক্তির চেয়ে অনেক বেশি, তাদের শক্তি সম্পর্কে কোন প্রকার ধারণা করাও সম্ভব নয়। তাই কাফেরদের "আমরা ঊনিশ জন ফেরেশতার মোকাবেলা করবো" উক্তিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অলীক কল্পনা।

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'আর কাফেরদের পরীক্ষার জন্যেই তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছি'।

কেননা তারা ফেরেশতাদের সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে এর প্রতি বিদ্রুপ করেছে এবং দম্ভ প্রকাশ করেছে। তারা ধারণা করেছে, এত অল্প সংখ্যক ফেরেশতার পক্ষে মানুষকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হবেনা। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা তাদের কঠিন শাস্তিরই কারণ হবে।

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

'যারা কিতাব পেয়েছে, যাতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে'।

কেননা ফেরেশতাদের এ সংখ্যা সম্পর্কে তৌরাত ইঞ্জিলে ঘোষণা রয়েছে। তাই কোরআনে করীমের প্রতি এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের একটি সুযোগ আসবে আহলে কিতাবদের জন্য।

তিরমিজী শরীফে সংকলিত একটি বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদী খৃষ্টানরা এ সংখ্যা সম্পর্কে অবগত ছিল। কোরআনে করীমের ঘোষণার মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস অধিকতর সুদৃঢ় হয়ে যায়।

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا

'এবং ঈমানদারগণের ঈমান যেন বৃদ্ধি পায়'।

মুসলমানদের ঈমান তো পূর্ব থেকেই রয়েছে, কিন্তু আহলে কিতাবরা যখন স্বীকার করে, তাদের নিকট যখন তৌরাত ইঞ্জিলে এ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে তখন মোমেনদের ঈমান আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাবে, আর এটিই স্বাভাবিক।

وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

আহলে কিতাব এবং মোমেনগণ যেন সন্দেহে পতিত না হয় এবং এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে।

وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ط

'এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং কাফেররা বলবে, আল্লাহ পাক এমনি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে কি বোঝাতে চেয়েছেন'?

আলোচ্য আয়াতে مرض শব্দটির অর্থ সন্দেহ অথবা মুনাফেকী। এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কা শরীফে, সেখানে মুনাফেক ছিলনা। হিজরতের পর মদীনা মোনাওয়্যারায় মুনাফেকদের তরফ থেকে যে কথা বলা হবে, তারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। মুনাফেক ও কাফেররা এ সংখ্যা সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করবে যে, আল্লাহ পাক এ দৃষ্টান্ত দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন? তারা বলে আমরা এমন অবান্তর কথায় বিশ্বাস করতে পার বনা।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

'এভাবে আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন'।

যেমন দোযখীদের প্রহরীদের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার ব্যাপারে কিছু লোকের ঈমান সুদৃঢ় হয়েছে। যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের ঈমান বেড়ে যায়, আর যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তাদের বিদ্রুপ এবং পথভ্রষ্টতা বেড়ে যায়।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ

'(হে রসূল) আপনার প্রতিপালকের সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে তিনি ব্যতীত কেউ জানেনা'।

যে উনিশ জন ফেরেশতার কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তারা দোযখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের অধিনায়ক স্বরূপ। তাদের অধীনে

কত ফেরেশতা রয়েছে, তা আল্লাহ্ পাকই জানেন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সপ্তম আসমানে রয়েছে বায়তুল মামুর, তাতে প্রতি দিন সত্তর হাজার নতুন ফেরেশতা তওয়াফ করে, এরা জীবনে আর কখনও তওয়াফ করার সুযোগ পায়না, অতএব ফেরেশতাদের সংখ্যা কত হবে তা কল্পনা করাও কঠিন।

ইমাম আহমদ এবনে হাম্বল (রঃ) হযরত আবুজর গেফারী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আসমানে এক আঙ্গুলের সমান জায়গা নেই, যেখানে কোন ফেরেশতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে সেজদা রত নেই। এরপর তিনি এরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তবে অধিক পরিমাণে ক্রন্দণ করতে আর বিছানায় বিশ্রাম গ্রহণের স্থলে বনে-জঙ্গলে বেরিয়ে যেতে এবং আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করতে এবং আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ক্রন্দণ করতে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এ ঘোষণায় জবাব রয়েছে আবু জেহেলের মন্তব্যের। আবু জেহেল বলেছিল, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহায্যকারী শুধু উনিশ জন ফেরেশতা। তারই জবাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এ ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের ফেরেশতাদের সংখ্যা তিনি ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক দোযখীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে যে ফেরেশতাদের তৈরী করেছেন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ অবগত নয়, শুধু আল্লাহ্ পাকই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে জানেন।

হান্নাদ কা'ব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তিকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে, তাকে ধরার জন্যে এক লক্ষ ফেরেশতা এগিয়ে আসবে।

কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, تسعة عشر বা উনিশ জন বলে দোযখের ফেরেশতাদের অধিনায়কদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হলো, দোযখের শাস্তি বিধানের জন্যে কত ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে, তা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১২৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৭৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-১৯৭

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, দোযখের পরিচালনায় নিযোজিত যে ফেরেশতাদের সংখ্যা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে যে হেকমত রয়েছে তা আল্লাহ পাকই জানেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ তা জানেনা। দ্বিতীয়তঃ ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা-ও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। তৃতীয়তঃ কাফের ও ফাসেকদের শাস্তির জন্যে এত ফেরেশতারও কোন প্রয়োজন নেই, কাফেরদের শাস্তি বিধান এক আল্লাহ পাকের হুকুমেই হবে।

وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۞

অর্থাৎ মানুষের উপদেশের জন্যেই দোযখ সম্পর্কে এ বর্ণনা সন্নিবেশিত হলো, যেন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, অন্যায় অনাচার পরিহার করে, সত্যকে গ্রহণ করে, অসত্যকে বর্জন করে।

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ﴿٣٢﴾
وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۙ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ﴿٣٤﴾ اِنَّهَا لَاِحْدَى
الْكُبَرِ ۙ﴿٣٥﴾ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۙ﴿٣٦﴾ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ
اَوْ يَتَاَخَّرَ ؕ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ﴿٣٨﴾ اِلَّآ اَصْحٰبَ
الْيَمِيْنِ ؕ﴿٣٩﴾ فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ﴿٤١﴾ مَا
سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۙ﴿٤٢﴾ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿٤٣﴾ وَلَمْ
نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ﴿٤٥﴾ وَ
كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿٤٦﴾ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ؕ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ؕ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ﴿٤٩﴾

তরজমা

(৩২) কখনও নয়; তারা এতে কর্ণপাত করবেনা, চন্দ্রের শপথ!

(৩৩) এবং শপথ রাত্রের! যখন তার অবসান ঘটে,

(৩৪) এবং শপথ প্রভাত কালের! যখন তা উদ্ভাসিত হয়।

(৩৫) নিশ্চয় দোযখ ভয়াবহ বিপদ সমূহের অন্যতম।

(৩৬) মানব জাতির জন্যে সতর্ককারী,

(৩৭) তোমাদের মধ্যে যে কেউ অগ্রসর হতে চায় বা পিছিয়ে পড়তে চায়।

(৩৮) প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।

(৩৯) তবে ডান দিকের ব্যক্তিগণ নয়।

(৪০) তারা থাকবে উদ্যান সমূহে এবং তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে।

(৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে,

(৪২) কিসে তোমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করেছে?

(৪৩) তারা বলবে, আমরা মুছল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না (নামাজ আদায় করতাম না),

(৪৪) আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাবার দান করতাম না,

(৪৫) এবং আমরা তর্ককারীদের সঙ্গে তর্কে মেতে থাকতাম।

(৪৬) এবং আমরা কেয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম।

(৪৭) এমনকি, শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকট মৃত্যু এসেই গেল।

(৪৮) তাই সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজেই আসবেনা।

(৪৯) তবু তাদের কি হয়েছে যে, উপদেশের কথায় তারা ভ্রুক্ষেপ করছেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের নাফরমানীর উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন ঈমানদারগণ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করবে এবং কাফের ও মুশরেকরা আল্লাহ পাকের কঠিন কঠোর আযাব ভোগ করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

كَلَّا وَالْقَمَرِ

'কখনও নয়, তারা এতে কর্ণপাত করবেনা, চন্দ্রের শপথ'!

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, কখনও নয়, একথা বলে আবু জেহেল ও তার সঙ্গীদের ভিত্তিহীন কথার উপর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এ মর্মে যে তারা কখনও দোযখীদের প্রহরীদের মোকাবেলা করতে পারবে না। তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অথবা ফেরেশতাগণ যাদের কথা ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে ।

অথবা এ সূরা, এসব হলো মানুষের জন্যে উপদেশ, কিন্তু কাফেররা এর দ্বারা কখনও উপদেশ গ্রহণ করবে না।

অথবা এর অর্থ হলো যারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথাকে বিদ্রুপ, করতো তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَالْقَمَرِ ۞ وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۞ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۞

'শপথ চন্দ্রের! এবং শপথ রাতের! যখন তার অবসান ঘটে এবং শপথ প্রভাত কালের! যখন তা উদ্ভাসিত হয়'।

আরবরা এসব কিছুর শপথ গ্রহণ করে তাদের কথার সত্যতর উপর দলিল পেশ করতো। এখানেও চন্দ্রের, রাতের এবং প্রভাত কালের শপথ করা হয়েছে এ মর্মে যে, কেয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে। দোযখের উপর উনিশ জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই, আর এ ফেরেশতাগণের মোকাবেলায় তোমাদের কোন শক্তিই উপকারী হবেনা। আর একথা দিবালকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে মনে রেখ

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۞

'নিশ্চয় দোযখ ভয়াবহ বিপদ সমূহের অন্যতম'।

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۞

'মানব জাতির জন্যে সতর্কবাণী'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমে "সাকার" নামক দোযখের চেয়ে বড় কোন বিপদের দ্বারা ভয় দেখানো হয়নি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল, হে বস্ত্রাবৃত! দন্ডায়মান হোন, মানব জাতিকে ভয় প্রদর্শন করুন, আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করুন।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْيَتَاَخَّرَ ۞

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ অগ্রসর হতে চায় বা পিছিয়ে পড়তে চায়'।

মানুষ স্বীয় কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ

অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের পর যে দল কল্যাণকর কাজে অগ্রসর হতে চায় তারা অগ্রসর হবে। আর যারা অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়ে থাকতে চায় তারা সে অবস্থায়ই থাকবে। তাদের জন্যে থাকবে সতর্কবাণী কেননা,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

প্রত্যেকটি মানুষ নিজ নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, প্রত্যেককে তার কর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে, প্রত্যেককে তার কৃত অন্যায়-অনাচারের জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে সেদিন, যেদিন আত্মীয়-স্বজনের আত্মীয়তা, বন্ধু-বান্ধবের বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে না, কেউ কারও কোন সাহায্য করতে পারবে না, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে এবং প্রত্যেককে তার আমলের বদলা দেয়া হবে পুরোপুরি, আর তাদের প্রতি সেদিন কোন প্রকার জুলুম করা হবে না।

অর্থাৎ সেদিন এমন হবেনা যে, কেউ নেক আমল করবে আর তাকে তার শুভ পরিণতি প্রদান করা হবেনা, বরং প্রত্যেককে তার নেক আমলের পুরস্কার পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে।

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ

'তবে ডান দিকের ব্যক্তিগণ নয়'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ তাদেরকে বলা হয়েছে যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ সেসব জান্নাতীদের বলা হয়েছে যারা সৃষ্টির প্রথম দিন হযরত আদম (আঃ)-এর ডান দিকে ছিলেন। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে সেদিন বলেছিলেন–

هٰؤُلَآءِ للجنة ولا أبالى

'এরা জান্নাতের জন্যে আর আমি পরোয়া করিনা'।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-কে বলেছিলেন, আখেরাত সম্পর্কে তোমার কাছে কোন তথ্য আছে কি? হযরত কা'ব বললেন, জ্বী হ্যাঁ হে আমিরুল মোমেনীন! কেয়ামতের দিন লওহে মাহফুজ সম্মুখে রাখা হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের বিবরণ দেখতে পাবে, এরপর মানুষের আমলনামাগুলো আরশের চারপার্শ্বে ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং মোমেনদেরকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথা রয়েছে, اليمين। اصحٰب। তারাই হবে যারা পবিত্র সত্ত্বা, যারা মোবারক।

এ সমস্ত কথার সারমর্ম হল, اليمين। اصحٰب। দ্বারা মোমেনদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা মোমেনদেরকে চিরস্থায়ী শাস্তি দেয়া হবেনা, হয়তো গুনাহর হিসেবে কিছুদিন শাস্তি হওয়ার পর তাদেরকে মাফ করা হবে। অথবা শাফাআতের বরকতে তারা মাগফেরাত লাভ করবে। অথবা শুধু আল্লাহ পাকের রহমতেই তারা আযাব থেকে নাজাত লাভ করবে। আর এজন্যেই হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, اصحٰب। اليمين। কথাটি দ্বারা মোখলেস ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

কাসেম (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ভাল মন্দ আমলের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। তবে যে এক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সে-ই اليمين। اصحٰب। অর্থাৎ যে কামেল বা পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী।

সায়ীদ এবনে মানসুর ও এবনে আবি হাতেম হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে اليمين। اصحٰب। দ্বারা মুসলমানদের শিশুদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, (শৈশবেই যাদের মৃত্যু হয়েছে)। হাকেম বলেছেন, এ বর্ণনায় শুধু একটি কথা বাড়তি রয়েছে, তা হল তারা কখনও কোন আমল করেনি।

আবু সুফিয়ান হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এর দ্বারা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

فِىْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ

'তারা থাকবে উদ্যান সমূহে এবং তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে'।

জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে পৌঁছে যাবে এবং দোযখীরাও দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন জান্নাতীগণ আপনজনদের মধ্যে কথাবার্তা হবে, একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করবে কে কোথায় আছে এবং যে সব লোক সম্পর্কে জানা যাবে যে তারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাদেরকে জান্নাতীগণ জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের এ শোচনীয় পরিণতি কেন হল? তোমরা কি কারণে দোযখে নিক্ষিপ্ত হলে? তোমাদেরতো বিবেক বুদ্ধি ছিল, তবুও কেন তোমাদের এ দুর্গতি?

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ

তারা বলবে, আমরা নামাজ আদায়কারী ছিলাম না অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এবাদতের যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমরা পালন করিনি।

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ

আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না, যা আমাদের একান্ত কর্তব্য ছিল।

অর্থাৎ আমরা বন্দার হকও আদায় করিনি এবং আল্লাহ পাকের সৃষ্টির প্রতিও দয়া করিনি।

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ

'এবং আমরা তকর্কারীদের সঙ্গে তর্কে মেতে থাকতাম'।

অর্থাৎ যারা ইসলামের সমালোচনা করতো তাদের সঙ্গে সমালোচনায় শরীক হতাম, যা মুখে আসতো তাই বলতাম, যখনই কেউ ইসলামের বিধান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করতো তখন আমরাও তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করতাম, এমনকি কেয়ামতের দিনকেও অস্বীকার করতাম।

حَتّٰٓى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ۙ

'আর এমনি অবস্থায় আমাদের মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো'।

আলোচ্য আয়াতের يقين শব্দটি মৃত্যুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতেও এ শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

'তোমার নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের এবাদত করতে থাক'।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ۞

'তাই সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজেই আসবেনা'।

কেননা সকল সুপারিশকারী যদি একত্রিত হয়েও কারো জন্যে সুপারিশ করে তবু তা দরবারে এলাহীতে গ্রহণযোগ্য হবেনা।

এসহাক এবনে রাহবীয়া তাঁর মাসনাদে হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) অথবা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে ছিলাম, এমন সময় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমন হলো। তিনি এরশাদ করলেনঃ যে মুসলমানের তিনটি শিশু সন্তান যৌবন লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে জান্নাতের দরজায় দাঁড় করানো হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হবে, তারা বলবে যদি আমাদের পিতা-মাতা বেহেশতে প্রবেশ করে, তবে আমরাও বেহেশতে প্রবেশ করবো, যদি তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ না করে তবে আমরাও জান্নাতে প্রবেশ করবো না। অবশেষে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হবে, এমনকি তাদেরকে একথাও বলা হবে, তোমাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং তোমাদের পিতাকেও।

আলোচ্য আয়াতে شافعين শব্দ দ্বারা শিশু সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ফেরেশতাগণ নবীগণ, শহীদগণ, নেক বন্দাগণ তথা মোমেনগণ সুপারিশ করবেন। এরপর দোযখে ঐ চার প্রকার লোক ব্যতীত, যাদের উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে আর কেউ থাকবে না। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত সমূহ পাঠ করেন।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) বলেছেন, শাফায়াত বা সুপারিশ উপকারী হবে কিন্তু যাদের আলোচনা এ আয়াত সমূহে করা হয়েছে, তাদের জন্যে উপকারী হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত এমরান (রাঃ)-এর কথায় এ বিষয়টিই প্রমাণিত হয়, যারা নিয়মিত নামাজ আদায় করেনা, যাকাত আদায়

করেনা, খেলাধূলায় মত্ত থাকে, ইসলামের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে এমন লোকদের জন্যে সুপারিশ উপকারী হবেনা। প্রত্যেক মোমেনের জন্যেই সুপারিশ করা বৈধ হবে। কোন কোন মোমেন দোযখে প্রবেশের যোগ্য হওয়ার পরও সুপারিশের বরকতে দোযখে প্রবেশ করবেনা, আর যারা দোযখে প্রবেশ করে ফেলেছে, তাদেরকে সুপারিশের বরকতে বের করে আনা হবে।

শাফাআতের সুসংবাদ

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাফাআত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় সুসংবাদ দান করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্যে শাফাআত করবো, অবশেষে আমার প্রতিপালক আমাকে ডাক দিয়ে বলবেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এখন আপনি খুশি হয়েছেন? আমি আরজ করবো, জ্বী হ্যাঁ, আমি খুশী হয়েছি।

তেবরানী, আবু নাঈম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবীরা গুনাহকারী উম্মতের জন্যে আমার শাফাআত থাকবে।

তিরমিজী, এবনে হাব্বান, হাকেম এমনি হাদীস হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং কা'ব এবনে আজুরা (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ওসমান এবনে আফ্‌ফান (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন আলেম ও আবেদকে হাযির করা হবে। আবেদকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে চলে যাও। আর আলেমকে বলা হবে, তুমি শাফাআত করার জন্যে অপেক্ষা কর। (ইসবাহানী)

হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে আরও একখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মন্দ কাজে লিপ্ত লোকও ভাল। তখন আরজ করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তা কি করে হয়? তখন তিনি এরশাদ করেনঃ আমার উম্মতের মন্দ লোকদেরকে আল্লাহ পাক আমার সুপারিশক্রমে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর নেককার লোকদেরকে তাদের নেক আমলের কারণে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (তেবরানী, আবু নাঈম)

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আলেমদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের শাগরেদদের পক্ষে শাফাআত কর, তাদের সংখ্যা আসমানের তারকারাজির সমান হলেও। (দায়লামী)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একজন শহীদ তার চার পার্শ্বের সত্তুরটি বাড়ীর লোকদের পক্ষে সুপারিশ করবে। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন লোকেরা কাতারে কাতারে দন্ডায়মান থাকবে, এরপর একজন জান্নাতী ব্যক্তি একজন দোযখী ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে। দোযখী ব্যক্তি তাকে বলবে, তোমার স্মরণ নেই একদিন তুমি পান করার জন্য পানি চেয়েছিলে, অথচ আমি তোমাকে শরবত পান করিয়েছিলাম। একথা শ্রবণ করে জান্নাতী ব্যক্তি ঐ দোযখী ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপাশি করবে, এরপর সেই শাফাআতপ্রাপ্ত দোযখী অথবা ঐ জান্নাতী ব্যক্তি অন্য একজন দোযখী ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবেন, তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, তোমাকে আমি পানি পান করিয়েছিলাম। একথা শুনে সে ঐ দোযখী ব্যক্তির শাফাআত করবে। এরপর ঐ দ্বিতীয় নাজাত প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং প্রথম জান্নাতী ব্যক্তি একজন দোযখী ব্যক্তির পার্শ্ব অতিক্রম করবে। আর দোযখী ব্যক্তি বলবে, তোমার স্মরণ নেই, আমি তোমার অমুক কাজ করে দিয়েছিলাম। একথা শ্রবণ করে সে ঐ দোযখী ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে।

যাদের জন্যে শাফাআত করা হবেনা

যারা শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে, তাদের কথাও হাদীস শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যারা শাফাআতকে মিথ্যা জ্ঞান করবে, শাফাআত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা। এমনিভাবে যারা হাওজে কাওসারকে মিথ্যা জ্ঞান করবে, হাওজে কাওসার থেকেও তারা কিছু পাবেনা। হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) সহ অন্য আরো দশজন সাহাবী থেকে এই হাদীস বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আমার শাফাআত হক্ব, যে শাফাআতের প্রতি ঈমান আনবেনা, সে শাফাআতের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেনা।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার শাফাআত প্রত্যেক মোমেনের জন্যে বৈধ, শুধু সে সব লোক ব্যতীত যারা আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিয়েছে। (আবু নায়ীম)

হাদীস শরীফে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন গুনাহ এমন রয়েছে, যা শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আরবকে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফাআত লাভ করবেনা। (বায়হাকী)

হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন দু' ব্যক্তি আমার শাফাআত লাভ করবেনা। বড় জালেম, যে মানুষের হক্ব বিনষ্ট করেছে। যে ব্যক্তি দ্বীন থেকে বের হয়েছে এবং দুনিয়াদারীতে অধিক পরিমাণে লিপ্ত হয়েছে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ কর, আমি কেয়ামতের দিন কলহ প্রিয় লোকের শাফাআত করবোনা। (তেবরানী)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۞

'তবু তাদের কি হয়েছে যে, তারা উপদেশের কথায় ভ্রুক্ষেপ করছে না'।

আলোচ্য আয়াতের تذكرة শব্দটি দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অথবা সে সব নসিহত ও উপদেশ যা কোরআনে করীমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আয়াতের তাৎপর্য হলো এই, তাদের এমন অবস্থা কেন হয়েছে, যা তাদেরকে আখেরাতের আযাব পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।[১]

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ
كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا
يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ
ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ
التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২০১-০৩

তরজমা

(৫০) যেন তারা সেই ভীত-সন্ত্রস্ত গর্ধভের ন্যায়

(৫১) যা বাঘের ভয়ে পলায়নপর হয়।

(৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে তাকে একটি খোলা চিঠি দেয়া হোক।

(৫৩) কখনও নয়, তারাতো আখেরাতকেই ভয় করেনা।

(৫৪) কিছুই নয়, নিশ্চয় পবিত্র কোরআন তো শুধু উপদেশ মাত্র।

(৫৫) অতএব, যার ইচ্ছা সে যেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে।

(৫৬) অবশ্য আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কেউ শিক্ষা গ্রহণ করবে না, ভয়ের যোগ্য শুধু তিনিই, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী।

তফসীরুল কোরআন

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফেরদের কি হল যে তারা পবিত্র কোরআনের উপদেশ থেকে দূরে থাকে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না। আর এ আয়াতে কাফেরদের পবিত্র কোরআনের নসিহত থেকে দূরে থাকার একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। যেভাবে অরণ্যের একটি গর্ধভ বাঘ দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করে, মক্কার এ কাফেররা এমনিভাবে কোরআনে করীম থেকে পলায়নপর হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের قسورة শব্দটির অর্থ বাঘ।

আতা (রঃ) ও কালবী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ)-এর মতে, قسورة শব্দটির অর্থ হল, তীর নিক্ষেপে দক্ষ শিকারী।

আতা (রঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

যায়েদ এবনে আসলাম (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল শক্তি, আর সকল মোটা তাজা, হৃষ্ট-পুষ্ট শক্তিশালী বস্তুকেই আরবরা قسورة বলে।

একরামা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরও একটি কথা বর্ণিত আছে , قسورة শব্দটির অর্থ হল শিকারীর জাল।

আর সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) শব্দটির অর্থ বলেছেন, শিকারী।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

'বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় যে তাকে একটি উন্মুক্ত কিতাব দেয়া হোক'।

শানে নযুল

এবনুল মুনজের সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কাফেররা বলেছিল, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবুওয়্যতের দাবীতে সত্য হন, তবে আমাদের প্রত্যেকের নিকট খোলা চিঠি আসা উচিত, যাতে দোযখ থেকে আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

كَلَّا ؕ

কখনও নয়।

بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

বরং তাদের এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ আবদারের কারণে একথা প্রমাণিত হয় যে তারা আখেরাতকে ভয় করেনা, আখেরাতের জীবনে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনের হিসাব দিতে হবে এবং নাফরমানীর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে তাদের অন্তরে কোন ভয়ই নেই।

كَلَّاۤ

'কখনও নয়'।

اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

'নিশ্চয় পবিত্র কোরআন তো শুধু উপদেশ মাত্র'।

পবিত্র কোরআন হলো উপদেশ-বাণী

এতে মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলী, তাঁর রহমত ও আযাবের বিবরণ স্থান পেয়েছে। মানুষের কল্যাণের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ কাফেররা পবিত্র কোরআন থেকে বিমুখ রয়েছে, যদি তাদের দাবী মোতাবেক আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে খোলা চিঠিও দেয়া হয় তবু তারা ঈমান আনবে না, কেননা তারা যে খোলা চিঠির মোযেজা চায় তা এজন্যে নয় যে, নবুওয়্যতের সত্যতা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নয়; বরং বিষয়টি তাদের নিকট দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। এখন তারা খোলা চিঠির যে দাবী করছে তার কারণ হল, তাদের মনে আখেরাতের কোন চিন্তা নেই, তাই তারা এ ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা বলছে। পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণই উপদেশ-বাণী। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۝

'অতএব, যার ইচ্ছা সে যেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে'।

মানুষকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, সে ইচ্ছা করলে পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, ইচ্ছা করলে পবিত্র কোরআনের উপদেশ থেকে বঞ্চিতও থাকতে পারে।

এ আয়াতে প্রকাশ্যে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানান হয়েছে। তবে এতে সতর্কবাণী রয়েছে, যদি কেউ আল্লাহর বিধান অমান্য করে তবে তার শাস্তি অবধারিত।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ط هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

'অবশ্য আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত কেউ শিক্ষা গ্রহণ করবে না, ভয়ের যোগ্য শুধু তিনিই, আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী'।

অর্থাৎ কারো পক্ষে আল্লাহ পাকের মর্জি হলেই সে পবিত্র কোরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের মর্জি না হলে কোরআনে করীম থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের তৌফিক ব্যতীত নেক আমল হয়না। মওলানা রুমী (রঃ) বিষয়টিকে এভাবে বলেছেনঃ

بلال از حبش صهيب از روم حسن ز بصرى است
بو جهل كه در مكه بود اين چه بو العجبيست

'হযরত বেলাল (রঃ)-কে আবিসিনিয়া থেকে, সোহায়েব (রাঃ)-কে রোম থেকে, হাসান বসরীকে (রঃ) বসরা থেকে আনা হয়েছে অথচ আবু জেহেল মক্কাতেই ছিল, সে হেদায়েত লাভ করেনি, এটি কত বিস্ময়কর ব্যাপার'।

কেননা যদি কারো পক্ষে আল্লাহ পাকের মর্জি হয়, তাহলেই সে সত্য পথের সন্ধান পায়।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى

'ভয়ের যোগ্য শুধু তিনিই'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য আর তার পন্থা হল, আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা, আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা।

وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

'আর তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী'।

অর্থাৎ মোমেন বন্দাদের গুনাহ তিনিই মাফ করতে পারেন। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করে বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক এরশাদ করেছেনঃ আমার সাথে শেরক করা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রত্যেকেরই একান্ত করণীয় কাজ, কেউ যেন আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে। যে তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করবে, আমি তাকে মাফ করবো। (আহমদ, তিরমিজী, এবনে মাজা)

অতএব, আল্লাহ পাককেই ভয় করা উচিত, তিনিই মাফ করতে পারেন, সকল আশা শুধু তাঁরই নিকট এবং ভয়ও শুধু তাঁকে করা উচিত এবং ভরসাও শুধু তাঁর প্রতিই করা উচিত, তিনিই মহান দাতা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা কেয়ামাহ

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّفِيْهَا رُبُوْعٌ وَّاحِدٌ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ﴿۱﴾ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۭ﴿۲﴾
اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۭ﴿۳﴾ بَلٰى قٰدِرِيْنَ
عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ﴿۴﴾ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ
اَمَامَهٗ ۚ﴿۵﴾ يَسْـَٔـلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۭ﴿۶﴾ فَاِذَا بَرِقَ
الْبَصَرُ ۙ﴿۷﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ﴿۸﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ﴿۹﴾
يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۚ﴿۱۰﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ۭ﴿۱۱﴾ اِلٰى
رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ ِۨالْمُسْتَقَرُّ ۭ﴿۱۲﴾ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ
بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۭ﴿۱۳﴾ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰي نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ﴿۱۴﴾

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) কেয়ামতের দিনের শপথ করছি।

(২) আরও শপথ করছি সেই প্রবৃত্তির, যা নিজেকে ভর্ৎসনা করে।

(৩) মানুষ কি মনে করে, আমি তার অস্থি সমূহ একত্রিত করবো না?

(৪) অবশ্যই আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে পারি।

(৫) কিন্তু তবু মানুষ তার সম্মুখে যা আসে তাকে অস্বীকার করতে চায়।

(৬) সে প্রশ্ন করে কেয়ামত কবে আসবে?

(৭) অতএব যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে

(৮) এবং চন্দ্র নিস্প্রভ হয়ে পড়বে।

(৯) যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে।

(১০) সেদিন মানুষ বলবে আজ পলায়নের স্থান কোথায়?

(১১) কখনও নয়, কোথাও কোন আশ্রয়-স্থল নেই।

(১২) সেদিন শুধু তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই থাকবে আশ্রয়-স্থল।

(১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, যা কিছু সে সম্মুখে প্রেরণ করেছে আর যা কিছু সে পশ্চাতে রেখে এসেছে।

(১৪) বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজেই সম্যক অবগত।

সূরা কেয়ামাহ্ প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে। এতে দু' রুকু, চল্লিশ আয়াত রয়েছে। এর বাক্য সংখ্যা ৯৯টি, এতে অক্ষর রয়েছে ৬৫২টি।

সূরার মূল বক্তব্য

এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং এমন সুস্পষ্ট দলিল–প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যার কারণে বুদ্ধিমান মাত্রকেই কেয়ামতের কথা স্বীকার করতে হয়, কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং মানুষ মাত্রকেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করা হবে।

মূলতঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহের অন্যতম। এ সূরায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়, তখনকার অসহায় অবস্থার সম্যক বিবরণ রয়েছে এ সূরায়। এরপর কিভাবে কেয়ামত কায়েম হবে, আসমান-যমীন-চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে ধ্বংস করা হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজ নিজ কবর থেকে কিভাবে উঠানো হবে এবং মানব দেহের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কিভাবে একত্রিত করা হবে, তা-ও বর্ণনা করা হয়েছে এ সূরায়।

এমনিভাবে কেয়ামতের ময়দানে যখন সকলে হাযির হবে তখন মানুষ কিভাবে তার আমলের জন্যে আক্ষেপ করবে, তারও উল্লেখ রয়েছে এ সূরায়।

উপসংহারে মানুষের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে কেয়ামত এবং পুনরুত্থানকে প্রমাণিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা মুদ্দাস্‌সেরের শেষার্ধে একখানা আয়াত রয়েছেঃ

كَلَّا ط بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ

(কখনও নয়; বরং তারা আখেরাতকে ভয় করেনা।)

যেহেতু কাফেররা আখেরাতকে ভয় করেনা, কেয়ামতকে অস্বীকার করে, তাই আলোচ্য সূরায় কেয়ামতের বিবরণ রয়েছে এবং তার ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানব দেহ থেকে কিভাবে রুহ বের হয়ে আসবে তারও উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

এ সূরার আমল

সূরা কেয়ামাহ পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অন্তরের কাঠিন্য দূর হয় এবং অন্তরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে তবে সে কল্যাণ লাভ করবে, অর্থ-সম্পদে বরকত পাবে, খাদ্য-দ্রব্য সুলভ হবে।

তফসীরুল কোরআন

একদিন সমগ্র সৃষ্টি জগত লয়ঃপ্রাপ্ত হবে, কেয়ামত সংঘটিত হবে, কেয়ামতের বাস্তবতা অনস্বীকার্য, অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত। তাই কেয়ামতের শপথ করেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষ পুনরুত্থিত হবে। সেদিন ভাল-মন্দ, নেক ও বদ সত্য ও অসত্যের বিচার হবে। এরশাদ হয়েছেঃ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۞

বাক্যের শুরুতে لا অক্ষরটি বাড়তি। এর অর্থ না নয়, আর اقسم। অর্থ শপথ করি। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৩৫

وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۞

'আরও শপথ করি সে প্রবৃত্তির যা নিজেকে ভর্ৎসনা করে'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী কথাটির এ তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, কেয়ামতের দিন নেককার বদকার সকলেই নিজেকে তিরস্কার করবে। যে নেককার হবে সে একথা বলে তিরস্কার করবে আরও বেশী নেক আমল কেন করলাম না? যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে এর প্রমাণ। এরশাদ হয়েছেঃ

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ

'সেদিন সে বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি আমার এ জীবনের জন্যে কিছু করে পাঠাতাম'!

আর যারা বদকার তারাতো একথা বলে আক্ষেপ করবে, হায়! কেন মন্দ কাজ করেছি, হায়! কেন ঈমান আনিনি, কেন ইসলামের উপর আমল করিনি? যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছেঃ

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا

'কাফেররা বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম তবে আজ এত বড় বিপদের সম্মুখীন হতাম না'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, اللوامة نفس বলে মোমেনের নফ্সকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা মোমেন জীবনের সকল অবস্থায় নিজের প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করতে থাকে। পক্ষান্তরে, কাফের কখনও নিজেকে তিরস্কার করেনা; বরং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ-উল্লাস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তার কাছে আখেরাতের হিসাব-নিকাশের কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اللوامة نفس বলে কাফেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা কাফেররা কেয়ামতের দিন নিজেদেরকে অত্যন্ত মন্দ বলবে। তারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের হক বিনষ্ট করেছে, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, তাঁর প্রেরিত রসূলকে অস্বীকার করেছে। তাই কেয়ামতের দিন তারা এজন্যে আক্ষেপ করবে, নিজেকে তিরস্কার করবে।

সুফি-সাধকগণ বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কাজের জন্যে নির্দেশ দেয়, কিন্তু মানুষ যদি সত্য-সাধনা করে আল্লাহ পাকের জিকরে

মশগুল থাকে, আর আল্লাহ পাকের মহব্বত তার সাহায্যকারী হয়, তবে প্রবৃত্তির মন্দ ও ঘৃণ্য দিকটি তার সম্মুখে উম্মুক্ত হয়। তখন সে তার প্রবৃত্তিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে ব্যস্ত দেখতে পায় এবং সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্রষ্টার প্রতি সম্পূর্ণ ধ্যানে তন্ময় হওয়ার শক্তি রাখেনা। এ অবস্থায় সে নিজের প্রবৃত্তিকে তিরস্কার করে, আর এ অবস্থায় পৌঁছার পর তার প্রবৃত্তিকে اللوامة বলা হয়। কিন্তু এ অবস্থার যখন ধারাবাহিক উন্নতি হয়, যখন সে ফানাফিল্লাহ ও বকাবিল্লাহর মর্যাদা অর্জন করে এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত যাবতীয় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হয়, তখন আল্লাহর যিকর দ্বারাই সে শান্তি লাভ করে। প্রবৃত্তি যখন এ মর্তবা লাভ করে তখন তাকে نفس مطمئنة বলা হয়।

আত্মশুদ্ধি লাভের এ সুদীর্ঘ সাধনার প্রতিটি স্তরেই সাধক নিজেকে ভর্ৎসনা করে। আর তাই তাকে نفس اللوامة বলা হয়।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۞

'মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থি সমূহ একত্রিত করবো না'?

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আদী এবনে রবীয়া সম্পর্কে। আদী ছিল আখনাছ এবনে সোরায়েক ছাকাফীর জামাতা। এই আদী ও আখনাছ সম্পর্কেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে মন্দ প্রতিবেশীর ঘৃণ্য আচরণ থেকে রক্ষা কর'।

একবার আদী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমাকে বলুন, কেয়ামত কবে হবে? তার অবস্থা কি হবে? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার নিকট কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করলেন। সব কথা শ্রবণ করে সে বললো, যদি আমি স্বচক্ষেও কেয়ামত দেখি তবু আপনার কথা আমি বিশ্বাস করবো না এবং আপনাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেবনা, আল্লাহ কি ভেঙ্গে যাওয়া এ হাড়গুলোকে একত্রিত করবেন? তাই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেনঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ

'মানুষ কি একথা ভেবে রেখেছে যে, আল্লাহ পাক মানুষকে তার অস্থি একত্রিত করবেন না, মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান হবে না'?

بَلٰى

'কেন নয়, অবশ্যই তা করা হবে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক পুনরায় হাড়গুলোকে একত্রিত করবেন, মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন।

কোন কোন মানুষের ধারণা যে, বিচ্ছিন্ন দেহকে একত্রিত করার শক্তি কারোই হবেনা, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ۞

'অবশ্যই আমি তার অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে পারি'।

যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বিষয়কে একত্রিত করা সম্ভব, তখন বড় বড় হাড়গুলোকে একত্রিত করা তো মোটেই কঠিন হবেনা।

তফসীরকারগণ বলেছেন, بنان শব্দ দ্বারা মানুষের সর্বাঙ্গ সৃষ্টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন, মানব দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় আঙ্গুলের সৃষ্টি অধিকতর কঠিন, যিনি কঠিনকে সহজ করতে পারেন, তিনি সহজকে সৃষ্টি করতে পারেন, তাই সহজকে সৃষ্টি করতে তাঁর কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۞

'কিন্তু তবু মানুষ তার সম্মুখে যা আসে তা অস্বীকার করতে চায়'।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), একরামা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) কথাটির এ ব্যাখ্যা করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষই অবগত আছে যে আল্লাহ পাক তার হাড়গুলোকে জুড়ে দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে যা আসন্ন তথা কেয়ামতকে অস্বীকার করতে চায়। কুফরী ও নাফরমানীর উপর অবিচল থাকতে এবং কুফরী পরিত্যাগ করতে চায়না, তওবাও করেনা।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হতে আগ্রহী হয় আর তওবার বিষয়টি পেছনে ফেলতে থাকে এবং বলে, এখন পাপাচারে লিপ্ত হই পরে সৎ কাজ করবো। অবশেষে অসৎ কর্মে লিপ্ত অবস্থায়ই মৃত্যু তার নিকট এসে পড়ে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা করা, মানুষ মনে করে আমি অনেক দিন জীবিত থাকব, প্রচুর অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করবো। আর এমন অবস্থায় তার মৃত্যুর কথা কখনও স্মরণ হয়না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের يفجر শব্দটির অর্থ হল يكذب আর امامه। শব্দ দ্বারা কেয়ামতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যা আগে আসবে, যা সুনিশ্চিতভাবে আসন্ন তা হলো কেয়ামত, হাশর নশর, হিসাব-কিতাব। এসব কিছুকে মানুষ মিথ্যা মনে করে। فجور শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো, কোন দিকে আকৃষ্ট হওয়া আর ফাজেরকে ফাজের এজন্যে বলা হয় যে, সে সত্যকে বর্জন করে অসত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ۞

'সে প্রশ্ন করে, কেয়ামত কবে আসবে'?

অর্থাৎ সে "কেয়ামত আসবে" একথা বিশ্বাস করেনা, তথা কেয়ামতকে অস্বীকার করে।

কাফেররা কেয়ামতকে যেমন অস্বীকার করে তেমনি তারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করে, তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনকে অস্বীকার করে। আর তাদের অস্বীকৃতির কারণ এই নয় যে, তারা আল্লাহ পাকের এমন ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। মূলতঃ কেয়ামতের কথা মেনে নিলে তথা কেয়ামতের দিন যাবতীয় কর্মকান্ডের জবাবদেহী করতে হবে একথা মেনে নিলে তাদের ভোগ-বিলাস, তাদের দৌরাত্ম অচল হয়ে পড়ে। তাদের ইচ্ছা হল, পরিণামের কথা ভুলে যাওয়া, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকা। এজন্যেই তারা কেয়ামতের কথার উপর বিদ্রুপ করে আর কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কবে আসবে কেয়ামত? আর এ প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে কেয়ামতের প্রতি তাদের অবিশ্বাস। তাই আল্লাহ পাক তাদের কথার জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ۞ وَخَسَفَ الْقَمَرُ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۞ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ۞

'অতএব যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে এবং চন্দ্র নিস্প্রভ হয়ে পড়বে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে, সেদিন মানুষ বলবে, আজ পলায়নের স্থান কোথায়'?

এ কয়েকখানি আয়াতে কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। সেদিন কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা পরিলক্ষিত হবে, চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্রের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে, সেই ভয়ংকর অবস্থায় মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। চন্দ্র ও

সূর্যকে সেদিন একত্রিত করা হবে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য উভয়টিই পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হবে।

আতা এবনে ইয়াসার বলেছেন, কেয়ামতের দিন চন্দ্র সূর্যকে একত্রিত করে মহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সমুদ্রগুলো অগ্নিকুন্ডে পরিণত হবে। আর এ অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যে, চন্দ্র সূর্য যখন জ্যোতি বিহীন হয়ে যাবে, তখন চন্দ্র সূর্যের মধ্যে একটি সমন্বয় সৃষ্টি হবে। অথবা চন্দ্র সূর্য একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো, চক্ষু স্থির হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুহ বের হয়ে যাবে।

অথবা এর অর্থ হলো, তারা চন্দ্র-সূর্য তথা মহাশূণ্যের উচ্চতর মকামে পৌঁছে যাবে যেখান থেকে মানুষকে বিবেক বুদ্ধির নূর প্রদান করা হয়, তখন মানুষ বলবে, আজ পলায়নের স্থান কোথায়?

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الانسان শব্দ দ্বারা কাফেরদের বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কাফেরদের জন্যে আজ পলায়নের স্থান কোথায়?

كَلَّا لَا وَزَرَ۝

'অবশ্যই নয়, কখনও নয়, আশ্রয়ের কোন স্থান নেই'।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِالْمُسْتَقَرُّ۝

সেদিন শুধু তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই আশ্রয়-স্থল হবে। কোন শক্তিই সেদিন আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রেহাই দিতে পারবে না। সেদিন প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হয়ে সারা জীবনের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে।

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ۝

'সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, যা কিছু সে সম্মুখে প্রেরণ করেছে আর যা কিছু সে পশ্চাতে রেখে এসেছে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ما قدم শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে সব ভাল মন্দ কর্ম যা মানুষ মৃত্যুর মুহূর্তের পূর্বে করে। আর واخر অর্থ সে সব ভাল মন্দ পন্থা যার বুনিয়াদ দুনিয়াতে রাখা হয়।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সম্মুখে প্রেরণ করার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। আর পশ্চাতে রেখে আসার অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য না করা।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সম্মুখে পেশ করার কথাটির অর্থ হলো প্রথম আমল, আর পশ্চাতে রেখে আসার অর্থ হলো, শেষ আমল।

যায়েদ এবনে আসলাম বলেছেন, সম্মুখে পেশ করার অর্থ হলো সেই অর্থ-সম্পদ যা মানুষ আল্লাহর রাহে ব্যয় করে। আর পেছনে রেখে আসার অর্থ হলো, যা মানুষ উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে আসে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার কাজকে চিরস্থায়ী আখেরাতের কাজের উপর প্রাধান্য দেয়া বা তার বরখেলাফ করা। উভয় প্রকার কর্ম সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তাকে অবহিত করা হবে।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝

'বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজেই সম্যক অবগত'।

অর্থাৎ মানুষের দুনিয়ার জীবনের কীর্তিকলাপ মানুষ নিজেই দেখতে পাবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

'আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট'। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ১৪)।

আবুল আলীয়া এবং আতা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষী হবে

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ যদি নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখে, তবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ে ঈমান আনা তার পক্ষে অতি সহজ।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা র উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর অর্থ হলো, মানুষ নিজের অবস্থা দেখার জন্যে নিজেই পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবে, অথবা এর অর্থ হলো, কেয়ামতের দিন মানুষ নিজেই নিজের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মানুষ নিজেই নিজের উপর তত্ত্বাবধায়ক, কেয়ামতের দিন সে নিজেই নিজের কর্মকান্ডের উপর স্বাক্ষ্য দেবে। তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের কর্মের স্বাক্ষী হবে, যেমন সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۞

'আজ আমি তাদের মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেব, তাদের হাতগুলো আমার সঙ্গে কথা বলবে। তাদের চরণ স্বাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের'। (আয়াত-৬৫)

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

'তারা যা কিছু করেছিল, সবই তারা মওজুদ দেখতে পাবে'। (সূরা কাহাফ)

যাহোক, মানুষ নিজের অবস্থার উপর, নিজের কৃতকর্মের উপর নিজেই স্বাক্ষী হবে, মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে।

وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ
بِهٖ ﴿١٦﴾ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ﴿١٧﴾ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ
قُرْاٰنَهٗ ﴿١٨﴾ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ
اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾ كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾
وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَالْتَفَّتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨالْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾

তরজমা

(১৫) যদিও তারা নানা অজুহাত পেশ করতে এতটুকু ত্রুটি করবেনা।

(১৬) (হে রসূল!) আপনি তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার লক্ষ্যে তা পাঠ করার জন্যে রসনাকে চালিত করবেন না।

(১৭) ওহীকে সংরক্ষিত রাখা এবং তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব।

(১৮) অতএব, আমি যখন তা পাঠ করতে থাকি, তখন আপনি তার অনুসরণ করুন।

(১৯) এরপর এর ব্যাখ্যা করা নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব।

(২০) হে অবিশ্বাসীরা! (তোমরা মনে কর, কেয়ামত হবেনা) এরূপ কখনও নয়; বরং (প্রকৃত অবস্থা এই যে,) তোমরা দুনিয়ার এ জীবনকে ভালবাস।

(২১) আর আখেরাতকে উপেক্ষা কর।

(২২) সেদিন কোন কোন চেহারা উজ্জ্বল থাকবে,

(২৩) তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

(২৪) পক্ষান্তরে, কোন কোন চেহারা সেদিন হয়ে পড়বে উদাস এবং বিবর্ণ

(২৫) এ আশঙ্কায় যে, এক ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় আসন্ন।

(২৬) কিছুই নয়, যেদিন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে

(২৭) এবং বলা হবে কে তাকে ঝাঁড়-ফুক করে রক্ষা করবে?

(২৮) আর সে-ও মনে করবে যে, বিচ্ছেদ-মুহূর্ত এখনই আসল।

(২৯) এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে।

(৩০) সেদিন তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাগমন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজেই সম্যক অবগত। তার কীর্তিকলাপের ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অবহিত। তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় কৃতকর্মের উপর সাক্ষী।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যদিও সে তার নানা অজুহাত পেশ করবে, কিন্তু এতে তার কোন উপকার হবেনা।

আলোচ্য আয়াতের معاذير শব্দটি معذار শব্দের বহুবচন। তার অর্থ হল পর্দা, আবরণ।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) এজন্যেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মানুষ তার কৃতকর্মকে গোপন রাখার জন্যে যত পর্দা বা আবরণই ব্যবহার করুক না কেন, তাতে তার কোন উপকার হবেনা। তার প্রবৃত্তিই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং যে ফেরেশতা তার উপর মোতায়েন রয়েছে, তারাও ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আর আল্লাহ পাক সব কিছু দেখছেন, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, মানুষ যতই ওজর-আপত্তি পেশ করুক আর যতই বিতর্ক করুক, কোন ফল হবেনা, যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ

'জালেমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না'।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ফররা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল মানুষ যত ওজরই পেশ করুক না কেন, তার প্রবৃত্তি তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবে।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ۝

'(হে রসূল!) আপনি তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করার লক্ষ্যে তা পাঠ করার জন্যে রসনাকে সঞ্চালন করবেন না'।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যখন ওহী নিয়ে আসতেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরআনের আয়াতকে কণ্ঠস্ত করার জন্যে তাঁর রসনাকে বার বার সঞ্চালন করতেন। কাজটি তাঁর জন্যে কঠিন হতো। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থাৎ (হে রসূল!) কোরআনে করীম কণ্ঠস্ত করার লক্ষ্যে আপনি তাড়াতাড়ি নিজের রসনাকে সঞ্চালন করবেন না, ওহী অবতরণ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে এ চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা কোরআনে করীমকে আপনার বক্ষে একত্রিত করে দেয়া এবং তা সংরক্ষিত রাখা এবং তা আপনার রসনায় পাঠ করানো সবই আমার দায়িত্ব, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ۝

'ওহীকে সংরক্ষিত রাখা এবং তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমারই দায়িত্ব, অতএব আমি যখন তা পাঠ করতে থাকি তখন আপনি তার অনুসরণ করুন, যাতে করে আপনার মনে তা বসে যায়'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (আঃ)-এর পাঠকে নিজের পাঠ বলে উল্লেখ করেছেন। এতে তাঁর উচ্চ মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়, এর দৃষ্টান্ত হলো

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

(যে আল্লাহর রসূলের অনুগত হলো সে যেন আল্লাহ পাকের অনুগত হলো) এ আয়াত হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ۝

'এরপর এর ব্যাখ্যা করা নিশ্চয় আমারই দায়িত্ব'।

অর্থাৎ কোরআনে করীমের ব্যাখ্যায় যদি কোন সমস্যা দেখা দেয়, তবে তার সমাধান করা আমারই কাজ। যে কোন আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ পাকই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে এলকা করেন।

আলোচ্য আয়াতের ثم শব্দটি দ্বারা এ অর্থ বোঝা যায় যে, যখন ওহী নাযিল হয় তখন যদি তার ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পায়, তবে তারপর তা বুঝিয়ে দেয়া হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ হয়েছে, জীব্রাঈল (আঃ) থেকে ওহী গ্রহণ করার সময় প্রথমতঃ আপনি শ্রবণ করতে থাকুন, ভুলে যাবেন এ ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার চেষ্টা করবেন না। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

অর্থাৎ আপনার অন্তরে কোরআনে করীমকে চিত্রিত করে দেয়া এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করিয়ে দেয়া, এটি আমারই দায়িত্ব। এরপর তার ব্যাখ্যা আপনাকে জানিয়ে দেয়াও আমারই দায়িত্ব।

এ পর্যায়ে মসনদে সংকলিত একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য, ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কষ্ট হত, এ আশঙ্কায় যে, যদি ভুলে যাই, এ কারণে ফেরেশতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পাঠ করতেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যিনি এই হাদীসের বর্ণনাকারী, তিনি যেভাবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করতেন সেভাবে পাঠ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয় এ মর্মে যে, (হে রসূল!) পবিত্র কোরআনকে মুখস্ত করার জন্যে আপনি তা বার বার পাঠ করবেন না, আপনার ঠোটকে নড়াচড়া করবেন না, আপনার অন্তরে কোরআনে করীমকে একত্রিত করে দেয়া এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব, আমি যখন (ফেরেশতার মাধ্যমে) তা পাঠ করি আপনি তার অনুসরণ করুন।

বোখারী শরীফ ও মুসীলম শরীফে এ বর্ণনা সংকলিত হয়েছে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন ওহী অবতীর্ণ হত, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে নিতেন। যখন ওহী অবতরণ শেষ হত তখন তিনি

পাঠ করা শুরু করতেন। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আরও সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ

'এরপর অবতীর্ণ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করাও আমার দায়িত্ব'।

অর্থাৎ যখন আয়াত নাযিল হয় তখন যদি কোন কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা না যায়, তবে তা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাকই গ্রহণ করেছেন।

কোরআনে করীমের ব্যাপারে এই বিশেষ হেদায়েত দানের পর পুনরায় কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

كَلَّا

কখনও নয়, হে অবিশ্বাসীরা! তোমরা যে মনে কর কেয়ামত হবেনা, তা কখনও নয়। এ কাফেররা যে আখেরাতকে বিশ্বাস করেনা, কেয়ামতের কথা মানেনা, পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেনা এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা তার কারণ হল, তাদের অন্তরে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের মায়া মহব্বত অত্যন্ত বেশী, তারা পরকালীন জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তারা লোভ-লালসায় মত্ত, গাফলতের আবর্তে নিপতিত, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۞

তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস, আর আখেরাতকে উপেক্ষা কর, অথচ প্রকৃত জীবনই হল আখেরাতের জীবন।

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ

আর নিশ্চয় আখেরাতের জীবনই হল প্রকৃত জীবন, অথচ কাফেররা আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন। কেয়ামতের দিন তাদের কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা। কাফেরদের অবস্থা হল এই, দুনিয়ার মায়া মোহে তারা আচ্ছন্ন, যা দুনিয়াতে আছে তা নিয়েই মুগ্ধ ব্যস্ত, এজন্যে আখেরাতের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ গাফেল।

পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের জীবনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞

'সেদিন কোন কোন চেহারা উজ্জল থাকবে, তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে'।

সেদিন ঈমান ও নেক আমলের কারণে নেককার লোকদের চেহারা আনন্দ-উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তারা এ আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করবে পরম প্রিয়তম মহান আল্লাহ পাকের দীদার লাভের মাধ্যমে।

আখেরাতে আল্লাহ পাকের দীদার

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস তেবরানী বায়হাকী প্রমুখ সংকলন করেছেন। এই হাদীসে রয়েছে, জুমআর দিন জান্নাতে একটি বাড়তি নেয়ামত লাভ হবে তা হলো, সেদিন জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভের মহা সৌভাগ্য অর্জন করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতীগণ প্রত্যেক জুমআর দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে একথাও রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যার দুটি প্রিয় চক্ষু আমি নিয়ে নেব (অর্থাৎ কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে অন্ধ করে দেয়া হবে) তাকে এ বিনিময় দেয়া হবে, সে জান্নাতে অবতরণ করবে এবং আমার দীদার লাভ করবে।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের প্রতি ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন, তোমরা যেভাবে চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছ ঠিক তেমনি নিঃসন্দেহে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করবে। সূর্য উদিত হওয়ার এবং অস্ত যাওয়ার পূর্বের নামায সমূহকে যত্নসহকারে আদায় করার চেষ্টা করবে।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তোমরা মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের প্রতিপালকের দীদার লাভ করবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ। পাঠ করে এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে বলেছেন হে মুসা! আমাকে মৃত্যুর পূর্বে কেউ দেখবেনা, আমাকে শুধু জান্নাতীগণ জান্নাতে দেখবে, তাদের চক্ষুর মৃত্যু হবেনা, তাদের দেহ পুরানো হবেনা।

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا....

(যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে, তার কর্তব্য হল, নেক আমল করা।)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের দীদার লাভ করতে চায় তার কর্তব্য হল, নেক আমল করা এবং কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক না করা। (বায়হাকী)

আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত সম্পূর্ণ একমত। দীদারে এলাহী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রত্যেক জুমআয় জান্নাতীগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন, আর কোন কোন জান্নাতীর সপ্তাহে দু'বার দীদার নসীব হবে, আর কোন কোন জান্নাতীর ঈদের সমান দীদার নসিব হবে, অর্থাৎ বছরে দু' বার।

ইয়াহয়া এবনে সালাম আবদুল্লাহ আবুবকর এবনে আবদুল্লাহ আল মোজানীর বর্ণনা মোতাবেক বলেছেন, কোন কোন জান্নাতী দু'বার অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও একথা রয়েছে।

আবু নাঈম আবু ইয়াজীদ বোস্তামীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ পাকের কিছু বিশেষ বন্দা রয়েছেন, যদি আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর দীদার থেকে আড়ালে রাখেন তবে তারা এভাবে ফরিয়াদ করবে, যেভাবে দোযখীরা দোজখ থেকে নাজাত লাভের জন্যে ফবিয়াদ করবে।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দীদারে এলাহী লাভে ধন্য ব্যক্তিদের অগণিত মর্তবা রয়েছে। হাদীস শরীফে একথা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ পাকের দরবারে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সে-ই হবে, যাকে সকাল-সন্ধ্যায় দীদার লাভের সৌভাগ্য প্রদান করা হবে। এমন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মানিত এবং খোশ নসীব বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এতে একথা প্রমাণিত হয়না যে, এ ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত হবে, তার চেয়ে বেশী সম্মান কারো হবেনা, দীদারে এলাহীর নেয়ামত সর্বক্ষণ যাঁরা লাভ করবেন, তাঁরা হলেন নবী রসূলগণ।

অথবা আল্লাহ পাকের সে সব নৈকট্য-ধন্য বন্দাগণ, যারা সর্বদা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির থাকতেন, দুনিয়ার জীবনে দীদার সম্ভব ছিলনা আর আখেরাতে দীদার লাভে কোন বাধা থাকবেনা, এজন্যে তাঁরা সর্বক্ষণ দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

আলোচ্য আয়াতের إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (জান্নাতীগণ আল্লাহ পাকের দিকে তাকিয়ে থাকবে) কথাটির তাৎপর্য হলো, যতক্ষণ আল্লাহ পাকের মর্জি হবে ততক্ষণ

জান্নাতীগণ তাঁর দীদারে তন্ময় থাকবেন, অর্থাৎ দীদারের সময় অন্য দিকে মন যাবেনা, একথার প্রমাণ পাওয়া যায় হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে আনন্দ-উল্লাসে থাকবে, হঠাৎ একটি নূর চমকাবে, জান্নাতীগণ মাথা তুলে উপরের দিকে তাকাবে, তখন স্বয়ং মহান রব্বুল আলামীন আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, হে জান্নাতীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম।

যেমন সূরা ইয়াসীনে سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ এ অর্থেই উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এরপর আল্লাহ পাক তাদের দিকে এবং তারা আল্লাহ পাকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন দিকে মন যাবেনা। অবশেষে আল্লাহ পাক নিজেই তাদের থেকে পর্দার অন্তরালে চলে যাবেন, কিন্তু তাঁর নূরানী অবস্থা এবং বরকত সে স্থানগুলোতে থাকবে। (এবনে মাজা, এবনে আবিদ্দুনিয়া, দারে কুতনী)

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করা শুধু মোমেন বন্দাগণেরই বৈশিষ্ট্য, ফেরেশতাগণও এ নেয়ামত লাভ করবেনা, কিন্তু ইমাম বায়হাকী (রঃ) এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। এই হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর এবাদতের জন্যে বিভিন্ন ফেরেশতাকে বিভিন্ন প্রকার এবাদতের লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ফেরেশতা সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে কাতারবন্দী হয়ে দন্ডায়মান রয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত দন্ডায়মান অবস্থই থাকবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করবেন। ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হবে এবং তারা বিনীতভাবে আরজী পেশ করবে, আমরা তোমার বন্দেগীর হক্ব আদায় করিনি।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَّاسِرَةٌ ۞

'পক্ষান্তরে কোন কোন চেহারা সেদিন হয়ে পড়বে উদাস এবং বিবর্ণ'।

কেননা, তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে যাবে যে তাদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, রয়েছে কঠিন-কঠোর শাস্তি, এজন্যে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

'সেদিন অনেক চেহারা সুন্দর গৌরবর্ণের হবে, আর অনেক চেহারা হবে কালো, মলিন'।

تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

(এর কারণ এই যে,) তারা আশঙ্কা করবে যে, এক ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় আসন্ন।

তফসীরকার এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় হলো দোযখে প্রবেশ করা।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এ বিপদ হলো আল্লাহ পাকের দীদার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

মূলতঃ সেদিন দূরাত্মা কাফেরদের মুখ শুকিয়ে যাবে শাস্তির ভয়ে, সারা জীবনের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার পর তাদের দুশ্চিন্তার সীমা থাকবেনা। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, সে ভয়েরই আলামত লক্ষ্য করা যাবে তাদের চেহারায়। যারা দুনিয়ার জীবনকে, তার আনন্দ-উল্লাসকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের উদ্দেশ্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

كَلَّا

অবশ্যই নয়, তোমরা যা মনে করেছ তা সত্য নয়, একদিন দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটবে, প্রত্যেকের ব্যাপারেই মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হবে। এ কাফেররা কেয়ামত দেখেনি বলে কেয়ামতকে অস্বীকার করে কিন্তু মৃত্যু তো প্রতিনিয়তই দেখে থাকে, মৃত্যুকে অস্বীকার করা যায়না কোন অবস্থাতেই। কেয়ামতের প্রথম মঞ্জিলই হলো মৃত্যু। এ মৃত্যুর কথা চিন্তা করলেই কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা আঁচ করা যায়।

মৃত্যু থেকে কেউ পলায়ন করতে পারেনা। আপনজনদের বাহুবন্ধন, আহাজারি দ্বারা মৃত্যুকে ঠেকানো যায়না। তাই মৃত্যুর সে অবস্থার বিবরণ দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۝

'কিছুই নয়, যেদিন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে তাকে ঝাড়-ফুঁক করে রক্ষা করবে'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির অবস্থা এই হয়, কোন ঔষধ-পথ্য রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে উপকারী হয় না, রুগ্ন ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন এবং সে নিজেও নিরাশ হয়ে পড়ে। তখন আত্মীয়-স্বজনরা বা সে নিজেও বলে, এমন কেউ আছে কি যে, ঝাঁড়-ফুঁক দিয়ে তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে এসব কিছুই ফলপ্রসূ হয়না। মৃত্যু থেকে বাঁচার কোন পথই থাকেনা।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সোলায়মান তামিমী এবং মোকাতেল এবং সোলায়মান বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ বলবে, এর রুহ কে নিয়ে যাবে? রহমতের ফেরেশতা, না আযাবের ফেরেশতা?

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ۝

'আর সে-ও মনে করবে যে, বিচ্ছেদ-মুহূর্ত এখনই আসল'।

অর্থাৎ মৃত্যু-পথযাত্রী নিজেও উপলব্ধি করবে যে, পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায়ের সময় এসে গেছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল স্বাদ, আনন্দ, আরাম-আয়েশ, প্রীতি-ভালবাসা, আত্মীয়তার বন্ধন এক কথায় সব কিছুই শেষ হওয়ার মুহূর্ত এগিয়ে এসেছে। এভাবে ধীরে ধীরে অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۝

মৃত্যু-পথ যাত্রী ব্যক্তির পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে যাবে। সে নিজের পা সরিয়ে নেয়ারও শক্তি রাখবেনা, একে একে সব কিছুই যেন শেষ হয়ে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ساق শব্দটি দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতের বিষয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ তখন মৃত্যু-পথ যাত্রী ব্যক্তির দুনিয়া এবং আখেরাতের সমস্ত বিষয় একাকার হয়ে যাবে। দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিন এবং মৃত্যু-পথের যাত্রীর তখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে। চিরতরে দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার এবং আখেরাতের মুখোমুখি হবার অবস্থা তখন বিরাজ করবে।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো লোকেরা তার জানাযার ব্যবস্থাপনায় মশগুল হবে, আর ফেরেশতাগণ ঐ ব্যক্তির রুহ নিয়ে যাবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হবে।

একরামা (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো একটি বড় বিষয় আরেকটি বড় বিষয়ের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, অর্থাৎ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবন একাকার হচ্ছে, তাই মৃত্যু-পথ যাত্রীর বিপদের সীমা থাকেনা।

হাসান বসরী (রঃ) সহ অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো মৃত্যু-পথ যাত্রীর অস্থিরতা, অসহনীয় ব্যথা-বেদনা এত বেশী হয় যে, তার পায়ের উপর পা উঠে যায়, কিন্তু সে নিজে পা নাড়াতেও পারেনা, এ পায়ের উপরই সমগ্র জীবন সে চলাফেরা করছে, আজ তাতে প্রাণ নেই। অথবা এর অর্থ হলো, কাফন পরানোর সময় এক পা আরেক পায়ের সঙ্গে মিলে যায়।

যাহ্যাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দু'টি কাজ দু'দিকে একত্রিত হয়ে যায়। একদিকে লোকেরা মৃত ব্যক্তির দেহকে গোসল দিয়ে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থাপনায় মশগুল থাকে, অন্যদিকে ফেরেশতাগণ তার রুহ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি ঈমানদার ও নেককার হয়, তবে তার জন্যে উত্তম পন্থায় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

পক্ষান্তরে, যদি ঐ ব্যক্তি বেঈমান ও বদকার হয়, তবে তার জন্যে ব্যবস্থাও তেমনই হয়। প্রকৃতপক্ষে যে হয় বেঈমান ও বদকার, সে বদনসীব হয়। এমন লোকের রুহ আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখান থেকে আদেশ হয়, তাকে পুনরায় যমীনে নিয়ে যাও।

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۞

'সেদিন তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাগমন করতে হবে'।

বস্তুতঃ সেদিনই আল্লাহ পাকের দরবারে যেতে হয়, আল্লাহ পাক যেমন ইচ্ছা তেমন আদেশ করেন, মৃত ব্যক্তি আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট প্রত্যাবর্তন করেনা, এটিই আল্লাহ পাকের অমোঘ বিধান। এর কোন ব্যতিক্রম হয়না কখনো। কোন পরিবর্তনও হয়না। যারা পৃথিবীতে আগমন করে, তাদেরকে এভাবেই পৃথিবী থেকে গমন করতে হয়। যিনি পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। যারা আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করে তারাই চিরসুখ-চিরশান্তি লাভ করে। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করে, তাদের চির দুঃখ অবধারিত হয়।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ﴿٣١﴾ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٢﴾
ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٣﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٤﴾
ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٥﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ
يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ
يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩১) সে (আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি) বিশ্বাসও করেনি এবং নামাযও আদায় করেনি।

(৩২) বরং সে (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং (তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(৩৩) এরপর সে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভ ভরে।

(৩৪) দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ আগত।

(৩৫) পুনরায় দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভাগ্য আগত।

(৩৬) মানুষ কি মনে করে, তাকে এভাবে অবাধে ছেড়ে দেয়া হবে?

(৩৭) সে কি এক বিন্দু শুক্র ছিলনা? যা নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

(৩৮) এরপর সে জমাট রক্তে পরিণত হয়, এরপর আল্লাহ পাক তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন।

(৩৯) এরপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল-নর ও নারী।

(৪০) তবু কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন না?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ

'মানুষ কি মনে করে, আমি তার অস্থি সমূহ একত্রিত করবো না'?

মানুষের এ ভ্রান্ত ধারণার কারণেই সে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি, আল্লাহ পাকের প্রেরিত রসূলকেও মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى

সে (আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি) বিশ্বাসও করেনি এবং নামাযও আদায় করেনি।

অথবা এর অর্থ হবে, সে কোরআনে করীমেও বিশ্বাস করেনি।

অথবা এর অর্থ হবে, সে অর্থ সম্পদের যাকাতও আদায় করেনি।

وَلَا صَلّٰى

আর সে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত ফরজ নামাযও আদায় করেনি।

আয়াতের মর্মকথা

যেহেতু মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে যে, তার হাড়গুলো জোড়া দেয়া হবেনা এবং কেয়ামতের দিন তাকে পুনরুত্থিত করা হবেনা, এজন্যেই সে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনা এবং নামাযও আদায় করেনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত আদী এবনে রবীয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তবে আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা আবু জেহেলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তফসীরকারগণের মতে, শুধু আদী এবনে রবীয়া বা আবু জেহেল নয়; বরং পৃথিবীর অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সে সব লোককে এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যাদের মধ্যে আয়াতে উল্লেখিত চরিত্র বর্তমান থাকবে।

وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى۞

বরং সে (হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং (তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কেয়ামত আসবে তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে কিন্তু কেয়ামতের পূর্বে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে তার কর্মের পরিণতি ভোগ করা শুরু হয়। ঠিক যেভাবে মানুষ মৃত্যুর সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত নয়, তেমনি কেয়ামতের সময় সম্পর্কেও মানুষ অবহিত নয়। যে কাফের মুশরেক বে-দ্বীনরা

আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মানেনা এবং নামায রোজা করেনা, পাপাচারে লিপ্ত অবস্থায়ই জীবন-যাপন করে তাদের শাস্তি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায়। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে এ শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারেনা।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى۞

'এরপর সে তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়েছে দম্ভভরে'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস না করা, নামায আদায় না করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কোরআনকে মিথ্যা জ্ঞান করা, সত্য গ্রহণে বিমুখ হওয়া, দূরাত্মা কাফের শুধু এসব অপরাধই করেনি; বরং সে দম্ভ প্রকাশ করেছে এবং তার পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়েছে। সে ভেবেছে, এ জীবন এভাবেই অতিবাহিত হতে থাকবে কিন্তু বাস্তব অতি অপ্রিয়, প্রত্যেককে তার কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে সব চরিত্রের কথা ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى۞

'দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ আগত'।

অর্থাৎ তোমার দুঃখ-দুর্দশা অনিবার্য, তোমার জন্যে কঠিন-কঠোর শাস্তি অবধারিত।

ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى۞

'পুনরায় দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভাগ্য আগত'।

পূর্ববর্তী আয়াতের কথাগুলোর তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। অথবা পূর্ববর্তী আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা হল দুনিয়ার শাস্তি। আর এ আয়াতে যে শাস্তি ও দুর্ভোগের কথা বলা হয়েছে তা হল আখেরাতের দুর্ভোগ। অতএব, দুনিয়াতে অপমান, বদনাম, হত্যা প্রভৃতি শাস্তি তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। আর আখেরাতের শাস্তিও অনিবার্য। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় ধ্বংস অনিবার্য।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জেহেলের পোষাক ধরে টান দিয়ে বলেছিলেন ঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى

'তোর জন্যে দুর্ভোগ অবধারিত'।

তখন আবু জেহেল বলেছিল, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি আমাকে ধমক দিচ্ছেন, আল্লাহর শপথ! আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না, আপনার প্রতিপালকও আমার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবেনা। আমি মক্কার পাহাড়ের মধ্যে পদচারণাকারী সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। কিন্তু বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ পাক এ কাফেরদের চরম শাস্তি দিয়েছেন, তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্যে একজন ফেরাউন থাকে, এ উম্মতের ফেরাউন হল আবু জেহেল।

এবনে জরীর উফীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন এ আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল হয় তখন আবু জেহেল কোরায়শকে বললো, তোমাদের মায়েরা যেন তোমাদের জন্য কাঁদে, আবু কাবশার পুত্র তোমাদের বলেছে, দোযখের প্রহরীর সংখ্যা মাত্র উনিশজন, তোমরা বীরপুরুষ, তোমরা দশজন একত্রিত হয়েও কি একজনকে ধরে রাখতে অক্ষম হবে, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত এরশাদ করেছেনঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۞ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى

(দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ আগত, পুনরায় দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ আগত।)

আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললেন, আবু জেহেলকে একথাটি শুনিয়ে দিন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন اَوْلٰى لَكَ কথাটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের থেকে বলেছিলেন, না আল্লাহ পাক বলার জন্যে আদেশ দিয়েছিলেন? তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) জবাব দিয়েছিলেন, প্রথমে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছিলেন, পরে আল্লাহ পাকের তরফ থেকেও একথাগুলো নাযিল হয়েছে।[১]

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۞

'মানুষ কি মনে করে, তাকে এভাবে অবাধে ছেড়ে দেয়া হবে'?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২২৩
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৮৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৪৯

অর্থাৎ মানুষ কি একথা মনে করে যে, তার সৃষ্টি উদ্দেশ্য বিহীন, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা কি অহেতুক? যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সে জীবন অতিবাহিত করবে, কেউ তার নিকট থেকে তার জীবনের হিসাব নেবে না? তাকে কোন আদেশ দেয়া হবেনা? তার প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবেনা? তাকে তার ভাল কাজের জন্য পুরষ্কার ও মন্দ কাজের জন্যে শাস্তিও দেয়া হবেনা।

প্রকৃত অবস্থা এই, মানুষকে দায়িত্বহীন ভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, তার সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আর আমি জ্বীন ও মানুষকে শুধু আমার বন্দেগীর জন্যেই সৃষ্টি করেছি'।

আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, মানুষ তার জীবনের সাধনা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সফল করবে, এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে মানুষকে অনেক বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তাই মানুষ মাত্রকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে কঠোর সাধনায় ব্রতী হতে হয়।

মূলতঃ মানুষ যদি তার জন্ম-বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে এবং তার অতীত ও বর্তমানের মূল্যায়ন করে, তবে সত্য তার সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হবে।

মানব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۞

'সে কি এক বিন্দু শুক্র ছিলনা? যা নিক্ষেপ করা হয়েছিল'?

বস্তুতঃ মানুষ কিভাবে কেয়ামত ও হাশর-নশরকে অস্বীকার করে, এমনিভাবে পুনরুত্থানকে সে অসম্ভব মনে করে, তার অবস্থা কি ছিল? সে কি এক ফোঁটা শুক্র ছিলনা?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً

এরপর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়, এতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। এরপর আরও চল্লিশ দিনে সে গোশ্ত খন্ডে পরিণত হয়, এরপর হাড়গুলো তৈরী হয়, এরপর চর্মের আবরণ তাকে পরানো হয়।

فَخَلَقَ فَسَوّٰى۞

'এরপর আল্লাহ পাক তাকে আকৃতি দান করেন এবং সুঠাম করেন'।

আল্লাহ পাক মানুষকে আকৃতি দান করে তাতে রুহ ফুঁকে দিয়ে সৃষ্টি করেন।

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى۞

'এরপর তা থেকে তিনি সৃষ্টি করেন যুগল-নর ও নারী'।

এ হল মানব সৃষ্টির ইতিহাস। মহান আল্লাহ পাক, যিনি নগণ্য তুচ্ছ একটি শুক্র বিন্দু থেকে আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তিনি কি মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারবেন না? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى۞

'তবু কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন না'? অবশ্যই পারেন এবং কেয়ামতের দিন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাদের সকলকে একত্রিত করবেন। সেদিন প্রত্যেকটি মানুষকে তার কর্মফল দেয়া হবে।

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলোচ্য সূরার এ আয়াতটি اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى পাঠ করে, তার কর্তব্য হল بَلٰى وَاِنَّ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ বলা।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? তারই জবাবে বন্দা বলবে, অবশ্যই তিনি সক্ষম, আমি তার অন্যতম সাক্ষী।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২২৪
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৫০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৮৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা দাহ্‌র

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ إِحْدٰى وَثَلٰثُوْنَ آيَةً وَّمِائَتَانِ وَعِشْرُوْنَ كَلِمَةً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ①

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ

سَمِيْعًا بَصِيْرًا ② إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا

كَفُوْرًا ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَأَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ④

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ⑤

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑥ يُوْفُوْنَ

بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ⑦

পরম করুণাময় অনন্ত অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে।

তরজমা

(১) মানুষের উপর এমনও এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।

(২) নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, যেন তাকে পরীক্ষা করি, এরপর করেছি তাকে শ্রবণকারী এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন।

(৩) নিশ্চয় আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, এখন সে হয় কৃতজ্ঞ অন্যথায় অকৃতজ্ঞ।

(৪) নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শেকল বেড়ী ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

(৫) নিশ্চয় নেককারগণ পান করবে এমন পাত্র থেকে, যার পানীয় কর্পুর মিশ্রিত।

(৬) এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বন্দাগণ পান করবে, আর তাকে প্রবাহিত করবে।

(৭) যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে।

সূরা দাহ্‌র প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ। অধিকাংশ তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সূরাকে মক্কী সূরা বলেই মত প্রকাশ করেছেন। তবে মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সূরা দাহ্‌র মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে।

অন্যদিকে, হাসান বসরী (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, একখানি আয়াত ব্যতীত সমস্ত সূরা মদীনা মোনাওয়্যারায় নাযিল হয়েছে। একখানি আয়াত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

দু' রুকু এবং ৩১ আয়াত বিশিষ্ট এ সূরায় ২৪০টি বাক্য ও ১০৫৪টি অক্ষর রয়েছে।

নামকরণ

সূরাতুত দাহ্‌রকে "সূরাতুল ইন্‌সান"-ও বলা হয়। যেহেতু এ সূরায় মানব সৃষ্টির ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে তাই এ সূরাকে সূরাতুল ইনসান বলা হয়। আর যেহেতু এতে দাহ্‌র বা যুগের কথা বলা হয়েছে তাই তাকে সূরাতুত দাহ্‌রও বলা হয়।

মূল বক্তব্য

এ সূরায় পরকালীন জীবনের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। নেককার পরহেযগারদের জন্যে আখেরাতে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, বিস্তারিতভাবে তারও উল্লেখ রয়েছে এ সূরায়।

এ সূরা শুরু করা হয়েছে মহান আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের বর্ণনা দ্বারা, কিভাবে মানুষকে আল্লাহ পাক অস্তিত্ব দান করেছেন, এ বর্ণনার লক্ষ্য হলো মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক করা। এতদ্ব্যতীত, এ সূরায়

কেয়ামতের দিনের অবস্থা, মানুষের জীবনের শুরু ও সারা এবং মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণ সমূহ বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহারে, কোরআনে করীমের নাযিল করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বিধান পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ সূরার আমল

যে ব্যক্তি এ সূরা অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করবে, তার রসনায় এলমের কথা জারী হয়ে যাবে।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে নিজেকে সূরা দাহ্‌র পাঠ করতে দেখবে, সে অধিক পরিমাণে কল্যাণ লাভ করবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে এবং যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বর্ণনা রয়েছে, মানুষকে তিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর মানুষের সম্মুখে তিনি হেদায়েত ও গোমরাহীর দু'টি স্বতন্ত্র পথ তুলে ধরেছেন। মানুষকে আল্লাহ পাক বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন, যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং হেদায়েতের পথ গ্রহণ করে সে আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করবে, যে বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করবেনা, হেদায়েতের স্থলে গোমরাহীকে গ্রহণ করবে তার শাস্তি অবধারিত।

তফসীরুল কোরআন

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۞

'মানুষের উপর এমনও সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা'।

বর্ণিত আছে যে, যখন এ সূরা অবতীর্ণ হলো, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা তেলাওয়াত করলেন, তখন শ্যামবর্ণের একজন সাহাবী তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। যখন জান্নাতের বৈশিষ্ট্য সমূহের উল্লেখ হলো তখন হঠাৎ ঐ সাহাবী চিৎকার দিলেন এবং তাঁর প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে গেল। তখন হযরত রসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমাদের সাথী এবং তোমাদের ভাইয়ের প্রাণ জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় বের হয়ে গেছে।[১]

পবিত্র কোরআন আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে একটি মহা সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তা হলো মানুষের একথা মনে রাখা উচিত, ইতোপূর্বে সে পৃথিবীতে ছিলনা, তার কোন নাম-নিশানাও ছিলনা, এটিই তার অতীত, এখন সে বহাল রয়েছে, কিন্তু সে কিভাবে আসল, নিজে নিজে তো কেউ অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনা, মানুষ যদি একটু বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তবে এ সত্য তার সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে যে,

১. আল্লাহ পাকই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

২. তিনি দান করেছেন তাকে তার আকৃতি-প্রকৃতি, তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বর্তমানকে উপলব্ধি করার জন্যে অতীতের কথা স্মরণ করতে হবে, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ

অর্থাৎ এমনও সময় ছিল যখন মানুষ কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা, দ্বিতীয়তঃ একথাও মানুষকে স্মরণ করতে হবে যে, আল্লাহ পাক তাকে ঘৃণ্য, অপবিত্র শুক্র বিন্দু থেকেই সৃষ্টি করেছেন, এটি তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন। এক আল্লাহ পাকই তাকে ঘৃণ্য ধাতু থেকে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সৃষ্টির সেরা বা আশরাফুল মাখলুকাত বলে ঘোষণা করেছেন।

অতএব, মানুষ কোন্ যুক্তিতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হতে পারে। মানুষের অস্তিত্ব লাভের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

'নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে মিশ্র শুক্র বিন্দু থেকে"।

نَّبْتَلِيْهِ

তাকে আমি সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার জন্যে, যেমন সূরা মুলকের শুরুতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৮৪

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

'যেন আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে অধিকতর উত্তম'।

فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

আজ তাকে আমি করেছি শ্রবণকারী এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন, কেননা মানুষ কারো কথা শ্রবণ করে বা দেখে শিখতে পারে, জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ পাক মানুষকে শ্রবণ শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, যেন সে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দান, যা সে অহরহ ভোগ করে তা উপলব্ধি করতে পারে এবং আল্লাহ্ পাকের অনুগত ও শোকর গুজার হতে পারে। সে উপলব্ধি করতে পারে, আল্লাহ্ পাক শূণ্যের কোঠা থেকে এনে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ অপবিত্র, ঘৃণ্য শুক্র থেকে সৃষ্টি করে তিনি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। মানুষের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নেই অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করা, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী না করা।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۞

'নিশ্চয় আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, এখন সে হয় কৃতজ্ঞ, অন্যথায় অকৃতজ্ঞ'।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের দান অপরিসীম, আল্লাহ্ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি এবং তাকে দিশেহারা করে রাখেননি, বরং তাকে সরল-সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং ভাল কাজের শুভ-পরিণতি এবং মন্দ কাজের শোচনীয় পরিণাম সবই তার সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন। নবী রসূলগণকে প্রেরণ করে আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করে মানুষকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান করেছেন এবং মানুষকে এ শিক্ষাও দিয়েছেন, যেন তারা সরল সঠিক পথ লাভের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজী পেশ করে। যেমন সূরা ফাতেহায় এরশাদ হয়েছেঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

'হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর'।

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا

'এখন সে হয় কৃতজ্ঞ, অন্যথায় অকৃতজ্ঞ'।

এ দু'টি পথের যে কোন একটিকে সে গ্রহণ করবে। যে শোকর গুজার হবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য মন্ডিত হবে। পক্ষান্তরে যে নাফরমানী করবে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে সে শাস্তি ভোগ করবে।

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۞

'নিশ্চয় আমি কাফেরদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শেকল বেড়ী ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি'।

মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করে তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে কেউ নাজাত পেতে পারেনা। কাফের মুশরেকদের জন্যে আল্লাহ্ পাক তাদের কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ দোযখের অগ্নিকুন্ড, শেকল বেড়ী প্রভৃতি তৈরী করে রেখেছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতে যেহেতু বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে একদল হয় কৃতজ্ঞ, বাধ্য, আরেক দল অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, সেহেতু কারো মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে, যারা অবাধ্য তাদের পরিণতি কি হবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তাদের জন্যে দোযখের অগ্নিকুন্ড, শেকল বেড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত রেখেছি। এরপর পরবর্তী আয়াতে নেককারদের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা সৎ, যারা মহৎ কাজে মশগুল থাকবে, আল্লাহ্ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করবে তাদের জন্যে রয়েছে চিরকালীন সুখ ও শান্তির জীবন। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۞

'নিশ্চয় নেককারগণ পান করবে এমন পাত্র থেকে যার পানীয় কর্পুর মিশ্রিত'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের জন্যে যে শরবত তৈরী করা হবে তাতে কর্পুর ও কস্তুরী ব্যবহার করা হবে।

আর একরামা (রঃ) বলেছেন, বেহেশতের ঐ শরবতে কর্পুরের সুগন্ধি থাকবে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, কর্পুর হলো জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۞

'এটি একটি ঝর্ণা, যা থেকে আল্লাহর বন্দাগণ পান করবে, আর তাকে প্রবাহিত করবে'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত প্রিয় বন্দা, যারা আল্লাহর বিধি-নিষেধ পালন করে চলে, তারা জান্নাতের যে কোন স্থানে যেতে পারবে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঐ ঝর্ণার পানি প্রবাহিত করবে। পানি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۞

'যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের অকল্যাণ ছড়িয়ে পড়বে'।

যাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে তাদের এমন সৌভাগ্য হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তারা আল্লাহ্ পাকের জন্যে যা মানত করতো, তা পূর্ণ করতো। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আরোপিত দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকত। কেয়ামতের দিনকে তারা ভয় করতো, কেয়ামতের দিনের জন্যে তারা সম্বল সংগ্রহ করতো, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا

'এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের অকল্যাণ ছড়িয়ে যাবে'।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন দিনকে তারা ভয় করে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন يوفون بالنذر থেকে একটি অনুক্ত প্রশ্নের জবাব রয়েছে যে, নেককার লোকদের জন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে অনেক নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশ্ন হলো তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কি? যে কারণে তাদেরকে এত নেয়ামত প্রদান করা হবে। এক কথায় কোরআনে করীমের ভাষায় ابرار কারা? এর জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। যারা তাদের উপর আরোপিত ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে, যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, যারা নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে আত্মরক্ষা করে, যারা আল্লাহ্ পাকের বন্দাদের প্রতি দয়া করে, যারা অনাথ বিপদগ্রস্ত, দারিদ্র-প্রপীড়িত, এতীম মিসকীন এবং দুর্দশাগস্ত মানুষকে সর্বদা সাহায্য করতে থাকে, সর্বদা নেক আমল করতে যত্নবান থাকে কোরআনে করীমে এমন লোকদেরকেই ابرار বলা হয়েছে। আর এ অবস্থা তখন হয় যখন মানুষ সত্য-সাধনার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এর

ফলশ্রুতিতে সকল চারিত্রিক ও নৈতিক দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় তথা সকল নৈতিক গুণাবলী অর্জিত হয়।

অথবা يوفون بالنذر অর্থ হল, তারা মানত পুরা করতো। মানতের তাৎপর্য হল, যে কাজ অবশ্য কর্তব্য নয় তাকে অবশ্য কর্তব্য বলে গ্রহণ করা এবং তা আদায় করা। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জেহাদ এমনি কর্তব্য সমূহতো তারা আদায় করেই, তদপুরি বাড়তিও তারা অনেক নেক আমল করে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ

'যারা মানত পূর্ণ করে'।

মানত পূর্ণ করার জন্যে দু'টি পূর্বশর্ত রয়েছে।

এক. যে বিষয়ের মানত করা হবে তা হতে হবে এবাদত ধর্মী। কোনভাবেই পাপ কার্যের মানত হয়না, কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানতের তাৎপর্য হলো, কোন কাজ যা শরীয়তের আলোকে ওয়াজিব নয়; তাকে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়া। যদি তা এবাদত ধর্মী না হয় তবে ওয়াজিব করার প্রশ্নই ওঠেনা, কেননা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানত তাই হয়, যা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়। এই হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং মসনদে আহমদে সংকলিত।

দুই. যে বিষয় মানত করা হবে, তা পূর্বেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওয়াজিব ঘোষিত হবেনা, কেননা এমন অবস্থায় নতুন করে নিজের উপর মানতের মাধ্যমে ওয়াজিব করার কোন সুযোগ নেই।

যদি কোন ব্যক্তি এ মানত করে যে, আমি অমুক মসজিদে নামায আদায় করবো, যেমন আমি মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় করবো, এমন অবস্থায় অন্য কোন স্থানে নামায আদায় করলে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, মানত পূর্ণ হবেনা।

কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, যেখানেই নামাজ আদায় করুক, মানত পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি এর দলিল হিসেবে হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত আছে যে মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আমি মানত করেছিলাম, যদি আল্লাহ পাক আপনাকে মক্কা বিজয় দান করেন, তবে আমি বয়তুল মোকাদ্দাসে নামায আদায় করবো। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি এ স্থানেই নামাজ আদায় করে লও।

ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার একই আরজী পেশ করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি জান তোমার অবস্থা, (অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা, মক্কা শরীফে অথবা বয়তুল মোকাদ্দাসে নামাজ পড়)।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ নিজের ঘরে যে নামাজ আদায় করে, তাতে এক নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়। আর মহল্লার মসজিদে পঁচিশটি নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়। আর জামে মসজিদে পাঁচশত নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়। ঐ নামাজই মসজিদে আকসায় আদায় করলে এক হাজার নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়। আর ঐ নামাজই আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) আদায় করলে পঞ্চাশ হাজার নামাজের এবং মসজিদে হারামে এক লক্ষ নামাজের সওয়াব পাওয়া যায়।[১] (এবনে মাজা)

এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, যদি কেউ গুনাহর কাজের মা'নত করে তবে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

এমনিভাবে যদি কেউ এমন কাজের মানত করে যা এবাদত হতে পারেনা, এমন মানতও পূর্ণ করা ওয়াজেব নয়।

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজের কোন মানত হয়না।

وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

আর তারা ভয় করে সেদিনকে, যার অমঙ্গল ছড়িয়ে পড়বে।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিনকে তারা ভয় করে, কেননা কেয়ামতের দিন হবে সর্বগ্রাসী ধ্বংসের দিন। আসমান-যমীনে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে এক কথায় সর্বত্র নেমে আসবে ধ্বংস, সেদিন অকল্যাণ বা ধ্বংস ছড়িয়ে পড়বে।

مستطيرا শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন বলা হয় استطار الفجر। (অগ্নি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে)

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিনের বিপদ যখন আসমানে ছড়িয়ে পড়বে তখন আসমান ফেটে পড়বে, নক্ষত্রগুলো ঝরে যাবে, চন্দ্র সূর্যের আলো নিস্প্রভ হয়ে যাবে। ফেরেশতারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আর যখন কেয়ামতের বিপদ যমীনে ছড়িয়ে পড়বে তখন পাহাড়-পর্বত মাটি হয়ে উড়ে যাবে, সমুদ্রের পানি শুষ্ক হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যত স্থাপনা আছে সবই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৩২-৩৩

وَيُطْعِمُونَ
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن
رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَ
لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾
مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا
زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾

তরজমা

(৮) আর তারা শুধু আল্লাহ পাকের মহব্বতে মিসকীন ও এতীম এবং বন্দীদেরকে খাবার দান করে।

(৯) (তারা বলে) আমরা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে খাবার দান করি। আমরা (এজন্যে) তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান এবং কৃতজ্ঞতাও কামনা করিনা।

(১০) নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক কঠিন ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করি।

(১১) ফলে আল্লাহ পাক তাদেরকে সেদিনের ভয়াবহ দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে দান করেন স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ।

(১২) আর তাদের সবরের বিনিময়ে তাদেরকে দান করবেন বেহেশত এবং রেশমী পোষাক।

(১৩) তারা বেহেশতের মধ্যে পালংকে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। সেখানে তারা অত্যন্ত গরম অথবা অত্যন্ত শীত বোধ করবে না।

(১৪) আর এমন অবস্থা হবে যে (বেহেশতের) বৃক্ষ সমূহের ছায়া সম্পূর্ণ রূপে তাদের নিয়ন্ত্রাণধীন থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

পূববর্তী আয়াতে "আবরার" বা নেককার পরহেযগার লোকদের শুভ- পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, এর পাশাপাশি নেককারগণের বৈশিষ্ট্যও বর্ণিত হয়েছে, যেমন মানত্ করলে "আবরার"গণ তা পূর্ণ করে এবং কেয়ামতের দিনকে ভয় করে, কেয়ামতের দিনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে।

আলোচ্য আয়াতেও আবরারদের আরো কিছু গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, আর তারা আখেরাতের জন্যে যে সব সম্বল সংগ্রহ করে, তারও উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۞

(এবং তারা আল্লাহ পাকের মহব্বতে মিসকীন, এতীম এবং বন্দীদেরকে খাবার দান করে) এতীম মিসকীন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত মানুষকে খাবার দান করা নেককার লোকদের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য আয়াতের على حبه শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারেঃ

১. নেককার ব্যক্তিগণ শুধু আল্লাহ পাকের মহব্বতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত, বিপদগ্রস্ত মানুষকে খাবার দান করে।

২. অথবা এর অর্থ হলো, নিজের শত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও এবং অর্থ-সম্পদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বা আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের লক্ষ্যে তাদেরকে অর্থ-সম্পদ দান করে। এ দুঃখী মানুষ হলো এতীম, মিসকীন এবং বন্দী। এদেরকে সাহায্য করার প্রতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে আলোচ্য আয়াত দ্বারা। বন্দী মুক্তির জন্যে দান-খয়রাত করার যে বিশেষ ফজিলত রয়েছে, তা-ও এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এখানে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বন্দী মুক্তির ক্ষেত্রে বন্দী যে মুসলমানই হবে এমন নয়; বরং অমুসলিম বন্দীকেও মুসলমানগণ মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করতে পারে। ইসলামী শরীয়ত এ বিধান পেশ করেছে। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের জন্যে ইসলাম যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে, এ বিধান তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক যখন মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন, তখন ৭০ জন বন্দী নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদর রণাঙ্গণ থেকে মদীনা মোনাওয়্যারা রওয়ানা হলেন। প্রায় একশত মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে এ পবিত্র কাফেলাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন বন্দীদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে দু'টি নির্দেশ দিলেনঃ

১. তোমাদের নিকট যে সামান্য খাদ্য রয়েছে, তা একত্রিত কর এবং নিজেরা না খেয়ে বন্দীদেরকে খেতে দাও। অথচ আজ যারা বন্দী তারাই বিগত চোদ্দ বছর যাবত মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিল।

২. যেহেতু যানবাহনের ব্যবস্থা অপ্রতুল ছিল, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশ দিলেন, তোমরা পদব্রজে চল, আর বন্দীদেরকে উষ্ট্রের উপর আরোহন করাও।

এ ছিল বন্দীদের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নীতি। মানব জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত বিরল।

এবনুল মুনজের এবনে জোরায়েযের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন মুসলমানকে বন্দী করতেন না, এজন্যে আলোচ্য আয়াতে ।اسير। শব্দটি দ্বারা মুসলমান বন্দী নয়; বরং অমুসলিম বন্দীই এর দ্বারা উদ্দেশ্য। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুশরেক বন্দীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। কাতাদা (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।

কিন্তু মুজাহেদ (রঃ) এবং সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা মুসলমান কয়েদীও উদ্দেশ্য হতে পারে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ।اسير। শব্দ দ্বারা বাঁদী গোলামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তারাও বন্দীদের মতই জীবন যাপন করে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো স্ত্রীলোক। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু'টি দুর্বল জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক। তারা হলো (১) গোলাম-বাঁদী (২) স্ত্রীলোক। (এবনে আসাকের)

আবু আমর হযরত উম্মে সালমার (রাঃ) সূত্রে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তোমরা গোলাম-বাঁদী এবং নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক।

আল্লামা বগভী (রঃ) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ মর্মে যে, তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কেননা তারা তোমাদের নিকট বন্দী।

শানে নুযুল

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে একজন আনসারী সাহাবী সম্পর্কে, তিনি একই দিনে মিসকীনকে খাবার দান করেছিলেন এবং এতীম, বন্দীদেরকেও খাবার দান করেছিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

মুজাহেদ (রঃ) এবং আতা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে, হযরত আলী (রাঃ) একজন ইহুদীকে শ্রম দিয়ে যা উপার্জন করেন, তার কিছু অংশ দ্বারা তাঁর পরিবারবর্গের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। যখন খাবার প্রস্তুত হলো তখন একজন অভাবগ্রস্ত লোক এসে সাহায্য প্রার্থী হয়, তখন যে খাবার প্রস্তুত হয়েছিল তা দিয়ে দেয়া হয়। এরপর দ্বিতীয়বার হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে খাবার তৈরী করা হয়, এবারও ঠিক সে মুহূর্তে একজন মিসকীন হাযির হয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়। তখন তাকে সে খাবার দিয়ে দেয়া হয়।

যখন তৃতীয়বারের মত হযরত আলী (রাঃ)-এর গৃহে খাবার প্রস্তুত করা হয়, তখন একজন মুশরেক বন্দী এসে সাহায্য প্রার্থী হয়, তখন যা খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, সবই তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সেদিন পরিবারের লোকেরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। তাই হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

সা'লাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার ইমাম হাসান, হোসায়েন অসুস্থ হলেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে দেখার জন্যে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেন, হে আবুল হাসান! যদি তুমি এ শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্যে কিছু মানত কর, তবে ভাল হয়।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) এবং হযরত ফোজ্জা (রাঃ) এ মানত করলেন, যদি এ দু'জন সুস্থ হয়, তবে আমরা তিনটি রোজা রাখব।

প্রায় বার সের যব ঋণ করে আনা হয়েছিল। তা থেকে হযরত ফাতেমা (রাঃ) পাঁচটি রুটি প্রস্তুত করলেন। আর সে মুহূর্তে একজন মিসকীন এসে হাযির হলো। তখন তারা নিজেরা অভুক্ত থেকে ঐ মিসকীনকে রুটিগুলো দিয়ে দিলেন। শুধু পানি পান করে তাঁরা ঐ রাত অতিবাহিত করলেন। সন্ধ্যায় খাবার প্রস্তুত করে সম্মুখে রেখেছেন এমন সময় একজন বন্দী হাযির হলো, তাঁরা ঐ খাবার বন্দীকে দিয়ে

দিলেন। তখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) এ আয়াত নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ্ পাক আপনাকে আপনার পরিবার পরিজনের জন্যে মোবারকবাদ দিয়েছেন।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۞

'আমরা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে খাবার দান করছি, তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান এমনকি, কৃতজ্ঞতাও আমরা চাইনা'।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ খাবার দানের সময় তারা সাহায্য প্রার্থীদেরকে একথা বলেছেন।

অথবা তারা মুখে এমন কিছু বলেননি, তবে তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, এই তথ্য প্রকাশ পায়।

অথবা তাদের এই মনের অবস্থারই প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) কারো গৃহে কোন দান খয়রাত প্রেরণ করলে বাহককে জিজ্ঞাসা করতেন, তারা কিছু বলেছে? বাহক বলতো, তারা আপনার জন্যে দোয়া করেছে। তখন তিনিও তাদের জন্যে তেমনি দোয়া করতেন, যাতে করে দান খয়রাত শুধু আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যেই হয়। এর বিনিময়ে তারা দোয়া করুক তা-ও তাঁর নিকট কাম্য ছিলনা।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۞

'নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক কঠিন ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করি'।

আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, সওয়াব লাভের আশায় এবং আল্লাহর আযাবের ভয়ে তোমাদেরকে খাবার দান করছি। আমরা অত্যন্ত কঠিন ভয়ংকর দিনের আশঙ্কা করছি।

অর্থাৎ আমরা কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার আশঙ্কা করছি, সেদিন শুধু তারাই নাজাত পাবে, যারা ঈমানদার ও নেককার হবে। দুনিয়ার জীবনে দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ করলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ পাক সেদিন আমাদের দুঃখ নিবারণ করবেন।

বস্তুতঃ আল্লাহর রাহে দান করা অত্যন্ত মহৎ কাজ, কিন্তু তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে কিছু পূর্বশর্ত রয়েছেঃ

১. দানের উদ্দেশ্য হতে হবে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা। এতদ্ব্যতীত কোন প্রকার দানই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না।

২. দান গ্রহীতাকে কখনও তার প্রতি এহসান করার কথা বলা যাবেনা। সে দান গ্রহণ করেছে বলে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া যাবেনা। অন্যথায় দান খয়রাত দরবারে এলাহীতে কবুল হবেনা, কোরআনে করীমেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَا لَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

'এবং তোমরা তোমাদের সদকাকে বাতিল করোনা দানগ্রহীতার প্রতি এহসান প্রকাশ করে এবং তাকে কষ্ট দিয়ে, সে ব্যক্তির ন্যায়, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার সম্পদ ব্যয় করে'।

আর দানগ্রহীতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা করাও এমনি একটি কাজ, যা দ্বারা দান খয়রাত বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেজন্যেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমরা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমাদেরকে দান করি, এজন্যে কোন বিনিময় আশা করিনা এমনকি, তোমরা দানের জন্যে আমাদের প্রতি সৌজন্যমূলক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তা-ও আমরা কামনা করিনা।

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۞

'ফলে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সেদিনের ভয়াবহ দুঃখ কষ্ট থেকে রক্ষা করেন, এবং তাদেরকে দান করেন স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ'।

অর্থাৎ যেহেতু নেককারগণ আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাকে এবং শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে দান করে, তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কেয়ামতের দিনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তাদেরকে দান করেছেন স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ। এবং তাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য এবং মনের আনন্দ।

এতে একথা প্রমাণিত হয় নেককারগণের সাধনা, আরাধনা, এখলাস এবং নেক আমল আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কবুল হয়েছে এবং কেয়ামতের ভয়াবহ দিনের মহা বিপদ থেকে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে রক্ষা করবেন, তাদেরকে বেহেশতের মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করাবেন।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ (আল্লাহ্ পাক তাদেরকে রক্ষা করেন) উক্তিটিতে অতীতকালের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ এ ঘটনা ঘটবে

কেয়ামতের দিন, এর কারণ হলো এই, নেককারগণের নাজাত লাভের বিষয়টি এত সুনিশ্চিত যে মনে হয় তা ঘটেছে, তাই এক্ষেত্রে অতীতকালের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

'আর তাদের সবরের বিনিময়ে দান করবেন তাদেরকে বেহেশত এবং রেশমী পোষাক'।

নেককারগণের শুভ-পরিণতি

আবরার বা নেককারগণকে আল্লাহ পাক শুধু যে কেয়ামতের দিনের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন তাই নয়; বরং আল্লাহ পাক নিজে তাদেরকে বিনিময় দান করবেন তাদের সবরের কারণে, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করার জন্যে এবং সর্বদা পাপাচার থেকে বিরত থাকার জন্যে তারা যে সবর অবলম্বন করেছেন, এমনিভাবে নিজেরা ক্ষুধার্ত থেকে এতীম মিসকীনকে খাবার প্রদানের জন্যে যে কষ্ট করেছেন এবং জেহাদে শাহাদত বরণ করার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এসব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবেন, আর তাদেরকে সেখানে রেশমী পোষাক পরিধান করানো হবে।

শুধু তাই নয়; বরং জান্নাতে তারা তাদের দুনিয়ার জীবনের কৃচ্ছ্র সাধনার আরো অনেক শুভ-পরিণতি লাভ করবেন, যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝

'তারা বেহেশতের মধ্যে পালংকে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। আরাম কেদারায় তারা বসবে, সেখানে সূর্যের তাপ থাকবেনা, শীতের প্রকোপও থাকবেনা'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রঃ) বলেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, জান্নাত অত্যন্ত শান্তিময় স্থান, সেখানে যেমন সূর্যের তাপ নেই তেমনি শীতের কষ্টও নেই। সেখানে অন্ধকারও নেই। জান্নাত নিজেই আলোকময়, আল্লাহ পাকের নূরেই আলোকিত, সেখানে সূর্যেরও প্রয়োজন নেই। আল্লাহ পাকের নূর দ্বারাই জান্নাত আলোকময়। চন্দ্র-সূর্যের তার কোন প্রয়োজনই নেই।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

'আর এমন অবস্থা হবে যে, (বেহেশতের) বৃক্ষ সমূহের ছায়া সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে'।

নেককারগণ জান্নাতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করবে। ফলের বৃক্ষগুলো জান্নাতবাসীগণের নিকটবর্তী থাকবে, ফলে ভরপুর ডালাগুলো জান্নাতবাসীদের প্রতি ঝুঁকে থাকবে, যখনই তারা ইচ্ছা করবে তখনই অনায়াসে ফলগুলো তারা ভক্ষণ করতে পারবে। জান্নাতবাসীগণ যখন ইচ্ছা তখনই ফল মূল নিতে পারবে, কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন থাকবেনা।

হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) বলেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতের ফল যেভাবে ইচ্ছা ছিড়ে খেতে পারবে। দন্ডায়মান অবস্থায়, উপবিষ্ট অবস্থায়, শায়িত অবস্থায়। (বায়হাকী)

বস্তুতঃ জান্নাতের নেয়ামত যেমন অগণিত, তেমনি অকল্পনীয়।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥
قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨ وَيَطُوْفُ
عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنْثُوْرًا ۝١٩ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠
عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۫ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ
مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١ اِنَّ هٰذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢

তরজমা

(১৫) আর তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে আর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পান পাত্রে।

(১৬) রৌপ্য নির্মিত স্ফটিক পাত্রে পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করেই পূর্ণ করবে।

(১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে এমন পানীয়, যা আদ্‌রক মিশ্রিত হবে।

(১৮) বেহেশতে এমন একটি প্রস্রবন রয়েছে যার নাম হলো সালসাবীল।

(১৯) তাদেরকে (খাদ্য ও পানীয়) পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে, তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

(২০) আর যখন আপনি সেখানে দেখবেন, দেখতে পাবেন ভোগ-বিলাসের বহু উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

(২১) তাদের পোষাক হবে সূক্ষ্ম সবুজ ও মোটা রেশম, অধিকন্তু তারা অলংকৃত হবে রূপালী কংকন দ্বারা, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

(২২) নিশ্চয় তা তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের সাধনা হয়েছে সার্থক।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে নেককার লোকদের জন্যে জান্নাতে যে নেয়ামত সমূহ রয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ আয়াত সমূহেও জান্নাতেরই আরও কিছু নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۞ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞

জান্নাতবাসীদের জন্যে রৌপ্য নির্মিত পান-পাত্র ব্যবহার করা হবে, যা হবে অত্যন্ত স্বচ্ছ, কাঁচের সোরাই নিয়ে জান্নাতের পরিচারকরা জান্নাতীদের নিকট আসা-যাওয়া করবে। যেহেতু জান্নাতের যমীন হবে রৌপ্যের তাই তার পান-পাত্রও হবে রৌপ্যেরই, তার চাকচিক্য দেখলে মনে হবে পান-পাত্রগুলো কাঁচের। বেহেশতবাসীগণের মনের চাহিদা মোতাবেকই তাতে পানীয় ঢালা হবে।

ফরিয়াবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ইয়াকুব কারখী (রঃ) বলেছেন, হয়তো قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا (পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করেই পূর্ণ করবে।) কথাটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে এ বিষয়ের প্রতি যে, রুহ সমূহের মধ্যে আল্লাহ পাকের মা'রেফাতের যোগ্যতার মাপকাঠিতে পান পাত্রের সংখ্যা নির্ণয় করা হবে।

হান্নাদ মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, পরিবেশনকারীদের পরিমাপের তাৎপর্য এই, পান পাত্র এত পূর্ণ হবেনা যে তা বাইরে পড়ে যায়, আর তা এত কমও হবেনা যে পাত্র পূর্ণ নয় বোঝা যায়।

অথবা এর অর্থ হলো, জান্নাতবাসীগণ নিজেরাই মনে মনে একটা ধারণা করে নেবেন, আর সে ধারণা মোতাবেকই তাদেরকে পান পাত্র দেয়া হবে।

অথবা এর অর্থ হলো, প্রত্যেকের নেক আমল অনুযায়ী তাকে বেহেশতী পান-পাত্র দেয়া হবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۞

'তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে এমন পানীয়, যা আদ্‌রক মিশ্রিত হবে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জান্নাতের যে সব নেয়ামতের কথা কোরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব নেয়ামতের কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই।

زنجبيل জান্নাতের একটি ঝর্ণার নাম।

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۞

'বেহেশতে এমন একটি প্রস্রবণ রয়েছে, যার নাম হলো সালসাবীল'।

যে পানীয় সহজে মানুষের কণ্ঠনালী দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাকে সালসাবীল বলা হয়। এ নামকরণের কারণ হলো, জান্নাতবাসীগণ যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে এ ঝর্ণাকে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবেন, আল্লাহ পাকের হুকুমে ঐ ঝর্ণাটি জান্নাতবাসীগণের অনুগত থাকবে।

মোকাতেল (রঃ) এবং আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, সালসাবীল নামক এ ঝর্ণাটি জান্নাতবাসীগণের গৃহে এবং তাদের পথের পার্শ্বে প্রবাহিত হতে থাকবে। আরশের নিম্নদেশ থেকে জান্নাতে আদনের ভেতর থেকে ঝর্ণাটি উৎসারিত হবে এবং জান্নাতীগণের নিকট পৌঁছবে।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

'তাদেরকে (খাদ্য ও পানীয়) পরিবেশন করবে চির কিশোরগণ, তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা'।

এটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে বেহেশতের খাদেমদের, যারা চিরকাল কিশোর থাকবে।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক, হান্নাদ (রঃ) এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতী যে হবে তার খেদমতে এক হাজার খাদেম সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। আর প্রত্যেক খাদেমের খেদমত হবে স্বতন্ত্র। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সবচেয়ে কম মর্তবার জান্নাতী ব্যক্তির জন্যে দশ হাজার খাদেম খেদমতের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে।

এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, সবচেয়ে কম মর্তবার জান্নাতী সে ব্যক্তি হবে, যার খেদমতের জন্যে সকাল-সন্ধ্যা পাঁচ হাজার খাদেম আসবে। আর প্রত্যেক খাদেমের নিকট এমন তৈজষপত্র থাকবে, যা অন্যের কাছে থাকবেনা।

উল্লেখ্য, পানাহারের আনন্দ বৃদ্ধি পায় পরিবেশনের সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের মাধ্যমে, আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে পরিবেশনকারীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতে সুন্দর-সুশ্রী বালকেরা জান্নাতীদের নিকট পানাহারের দ্রব্য-সামগ্রী পরিবেশন করবে। তাদের যে কয়টি বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণিত হয়েছে তাহলো তারা হবে চির কিশোর। তাদের অবস্থা এই–

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا

'তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা'।

এবনুল মুনজের একরামার (রঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত ওমর (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এমন সময় হাযির হলেন, যখন তিনি খেজুর পাতার তৈরী চাটাইয়ে শায়িত ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারকে চাটাইয়ের দাগ বসে যায়। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আরজ করলেন, পারশ্য রাজা এবং আবিসিনিয়ার রাজা কত আরাম-আয়েশে থাকে, আর আপনি আল্লাহর রসূল, অথচ আপনি খেজুর পাতার চাটাইয়ে শায়িত রয়েছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে ওমর! তুমি কি এর জন্যে রাজী নও যে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আমাদের জন্যে আখেরাত। তখনই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞

'আর যখন তুমি সেখানে (বেহেশতে) দেখবে, তখন দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের বহু উপকরণ এবং বিশাল রাজত্ব' (তখন তোমার এ ভুলের নিরসন হবে)। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীর খাদেমের সংখ্যা হবে দশ হাজার, সেখানে জান্নাতীগণ যে অনন্ত অসীম সুখ-শান্তি লাভ করবে, তা অন্যদের জন্যে সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। জান্নাতে জান্নাতীরা যা কিছু ইচ্ছা করবে তাই পাবে।

عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج

'তাদের পোষাক হবে সূক্ষ্ম সবুজ এবং মোটা রেশমের। অধিকন্তু তারা অলংকৃত হবে রূপালী কংকনে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! জান্নাতীদের পোষাক সম্পর্কে কিছু এরশাদ করুন। তা কি সৃষ্টি করা হবে নাকি বুনন করা বস্তু হবে? তিনি এরশাদ করলেন না, তা এমন বস্তু হবে, যা জান্নাত থেকে উৎসারিত হবে আর তা হবে জান্নাতের একটি ফল। (নেসায়ী)

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে সুন্দস সৃষ্টি হবে, যা দ্বারা জান্নাতীদের পোষাক তৈরী হবে (তেবরানী)।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমী পোষাক পরিধান করেছে, সে আখেরাতে তা পরিধান করবেনা। এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে।

وَحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ

'তারা অলংকৃত হবে রূপালী কংকন দ্বারা'।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের হাতের অলংকার সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার ওজুর পানি পৌছে।

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۞

'তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়'।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, জান্নাতের দ্বার প্রান্তে একটি পানির ঝর্ণা রয়েছে, তারই নাম তহুর। যে ব্যক্তি ঐ পানি পান করবে, আল্লাহ পাক তার

অন্তরকে হিংসামুক্ত করবেন। আলোচ্য আয়াতের شَرَابًا طَهُوْرًا বলতে সে পানীয়ের কথা বলা হয়েছে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ পানীয় সর্ব প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত, কারো হাতের স্পর্শ থেকেও পবিত্র।

আবু কালাবা এবং ইব্রাহীম (রঃ) বলেছেন, জান্নাতের যে পানীয়ের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তা পান করার পর জান্নাতীদের দেহে প্রস্রাবে পরিণত হবেনা; বরং তা তাদের দেহের ঘামে পরিণত হবে, যার সুগন্ধি হবে কস্তুরীর ন্যায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, জান্নাতীদেরকে সর্ব প্রথম খাবার সরবরাহ করা হবে। এরপর ঐ পানীয় পান করানো হবে। এ শারাবান তহুরা বা পবিত্র পানীয় পান করার কারণে জান্নাতীগণ ইতোপূর্বে যা ভক্ষণ করেছিল তা ঘাম হয়ে তাদের দেহ থেকে বের হয়ে আসবে, এরপর পুনরায় খাবার গ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

ঈমানদার ও নেককারদের জন্যে এটি হবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে চূড়ান্ত মর্তবা, আর সিদ্দিকীনদের মর্যাদায় যারা উন্নীত হবেন, তাদের জন্যে এটি হবে সূচনা মাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ফেরেশতাগণ "আবরার" বা নেককার লোকদেরকে এসব খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করবেন, আর কখনও চির কিশোররাও এসব তাদেরকে পরিবেশন করবেন, আর কখনও এমন হবে যে, কোন মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহ পাকের খাছ রহমতে এসব পানীয় জান্নাতীদের মুখে এসে লাগবে। অবশ্য যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য, অধিকাংশ সময় তাঁদেরকে কোন মাধ্যম ব্যতীত আপনা আপনিই খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হবে।[১]

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۞

'নিশ্চয় এসব নেয়ামত তোমাদের নেক আমল সমূহের বিনিময়। আর তোমাদের সাধনা সার্থক হয়েছে'।

উল্লেখিত নেয়ামত সমূহ তোমাদের সমগ্র জীবনের সত্য-সাধনার ফলশ্রুতি ও শুভ-পরিণতি। যারা এতীম মিসকিনদেরকে দান করে তাদের কৃতজ্ঞতাও কামনা করতো না, যারা সর্বদা আল্লাহ পাককে ভয় করতো এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানী

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৪৫-৪৬

থেকে বিরত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতো এবং সর্বদা আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট হতো, তাঁদের জন্যেই এ সমস্ত নেয়ামত সমূহের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতের প্রধান প্রবেশ পথে পৌছবেন, তখন তারা দু'টি নহর দেখতে পাবেন, তখন তাদের ইচ্ছা হবে পানি পান করার, একটি নহরের পানি পান করা হলে তাদের অন্তরের হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় নহরে গোসল করলে তাদের চেহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল হবে। এভাবে তারা জাহেরী এবং বাতেনী সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে অর্জন করবে। এরপর তাদের আনন্দ দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বলা হবে, তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমরা যে সত্য-সাধনা করেছ, তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ জান্নাতের অগণিত নেয়ামত তোমরা লাভ করেছ। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ

'দুনিয়াতে তোমরা যে আমল করেছ, তারই বিনিময়ে আজ আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গে পানাহার করতে থাক'।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৯১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২১, পৃষ্ঠা-১৬৪-৬৫

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا
أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ
الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾
إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾ وَمَا
تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾

তরজমা

(২৩) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে।

(২৪) অতএব, আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করুন এবং কোন পাপীষ্ঠ অথবা অকৃতজ্ঞ লোকের কথা মেনে চলবেন না।

(২৫) আর সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন।

(২৬) এবং রাতের কিছু অংশ তাঁর প্রতি সেজদায় রত হোন এবং রাতের দীর্ঘ সময় আপনার প্রতিপালকের তসবীহ্‌ পাঠ করতে থাকুন।

(২৭) নিশ্চয় তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে আর তারা এক অত্যন্ত কঠিন দিনকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।

(২৮) নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের স্থলে তাদের ন্যায় অন্য লোক পরিবর্তন করে আনতে পারবো।

(২৯) নিশ্চয় এটি উপদেশ মাত্র। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

(৩০) আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মানব সৃষ্টির ইতিকথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং মানুষকে জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দান করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সুসজ্জিত করার পর হেদায়েত এবং গোমরাহীর পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্বেও মানুষ পথভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত হয়েছে, এদের মোকাবেলায় তারাই সফলকাম হয়েছে যারা আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে তাঁর এবাদতে মশগুল হয়েছে। এ পর্যায়ে উভয় দলের অবস্থা এবং পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে।

আর এ আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার পাশাপাশি কোরআনে করীমের হেদায়েতের পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে, আর একথাও এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের জিকর ও তসবীহে মশগুল থাকা এবং তাঁর এবাদত বন্দেগীই নাজাত লাভের একমাত্র মাধ্যম। পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য এতেই রয়েছে নিহিত। এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۞

'(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে'।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো একই সঙ্গে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম নাযিল হয়নি; বরং প্রয়োজন মাফিক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। আর কোরআনে করীম এভাবে পর্যায়ক্রমে অবতরণের মধ্যে রয়েছে হেকমত।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۞

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি ধৈর্যের সাথে আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করুন এবং তাদের কোন পাপীষ্ঠ, অকৃতজ্ঞ লোকের কথা মেনে চলবেন না'।

নেককার এবং বদকারদের অবস্থা এবং তাদের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, কাফেরদের তরফ থেকে যে দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে তার উপর আপনি

সবর অবলম্বন করুন। যদি কাফেররা পবিত্র কোরআনকে না মানে, যদি তারা আপনাকে বিশ্বাস না করে এবং কোরআনে করীমেরও বিরোধিতা করে তবে আপনি তাতে ব্যাকুল হবেন না, সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে রেসালতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। অবিচলিত চিত্তে আল্লাহ্ পাকের হুকুমের অপেক্ষা করুন। এ কাফেররা আপনাকে বিচলিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না, আপনি তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না, অবশেষে সাফল্য আপনারই হবে, বিজয় সত্যেরই হবে, বিজয় লাভে বিলম্বের কারণে মনক্ষুন্ন হবেন না, পাপীষ্ঠ এবং অবাধ্য লোকদের কথা মানবেন না; বরং সর্বদা আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নামের তসবীহ্ পাঠ করতে থাকুন এবং আল্লাহ্ পাকের এবাদতে মশগুল থাকুন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اٰثما (পাপীষ্ঠ) শব্দটি দ্বারা ওতবা এবনে রবীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর كفورا (অবাধ্য) শব্দ দ্বারা ওলীদ এবনে মগীরাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

এ দু' দুরাত্মাই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, আপনি যা কিছু করেছেন তা যদি শুধু কোন স্ত্রীলোকের জন্যে হয় তবে এ কাজ থেকে বিরত থাকুন, আমি আমার কন্যাকে কোন প্রকার মোহরাণা ব্যতীত আপনার নিকট বিবাহ দিতে প্রস্তুত রয়েছি, আর ওলীদ বলেছিল, আমি আপনার ইচ্ছা মাফিক অর্থ-সম্পদ আপনাকে দেব। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۞

'আর (হে রসূল!) সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে থাকুন'।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে ذكر শব্দটির তাৎপর্য হলো নামায, কেননা নামাযের প্রত্যেকটি আরকান আহকামে আল্লাহ্ পাকের জিকর রয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নামাযের কোন অংশে মানুষের কথা নেই; বরং তাতে তসবীহ, তাকবীর এবং কোরআনে করীমের তেলাওয়াত রয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

بُكْرَةً

অর্থাৎ দিনের প্রথম অংশ।

এর দ্বারা ফজরের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَّاَصِيْلًا

দিনের শেষাংশ, এর দ্বারা জোহর এবং আছরের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ

আর রাতের কিছু অংশে তাঁর প্রতি সেজদায় রত হোন।

এ আয়াতাংশে সেজদা করার তাৎপর্য হলো নামায আদায় করা, এর দ্বারা মগরিব এবং এশার নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেহেতু রাতের নামাযে অধিকতর কষ্ট হয় এজন্যে فَاسْجُدْ শব্দটির পূর্বে مِنَ الَّيْلِ কথাটি বলা হয়েছে।

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۞

'আর রাতে দীর্ঘ সময় আপনার প্রতিপালকের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের জিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারের মতে, সর্বদা আল্লাহ পাকের জিকর জারী রাখার আদেশ হয়েছে, কেননা এ সময় মানুষের মধ্যে গাফলত অথবা বিশ্রাম করার ইচ্ছা থাকে। অথবা মানুষ এ সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকে বা খেলা-ধূলায় লিপ্ত থাকে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ এ সময় আল্লাহর জিকরে মশগুল থাক।

وَمِنَ الَّيْلِ

এর দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাযের তাগিদ করা হয়েছে। পাশাপাশি তসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, রাতের একটি বড় অংশ তথা অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম-বেশী আল্লাহ পাকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করার তথা তসবীহ পাঠের আদেশ দেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচীর বাস্তবায়নে মানুষ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে এবং এ অধ্যাত্মিক সাধনায় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সুযোগ আসে। আউলিয়ায়ে কেরাম এভাবে সাধনা করেই আল্লাহ পাকের দরবারে প্রিয় ও পছন্দনীয় হন।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۞

'নিশ্চয় তারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে আর তারা এক অতি কঠিন দিনকে পশ্চাতে ফেলে রাখে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাকের জিকরের এবং তাঁর নামের তসবীহ পাঠের আদেশ হয়েছে, এটিই কল্যাণের পথ, এটিই শান্তির পথ এবং জীবন-সাধনায় সাফল্য লাভের পথ। কিন্তু কাফেররা শান্তি ও কল্যাণের পথে আসেনা, সত্যকে গ্রহণের স্থলে তার বিরোধিতাকেই তারা শ্রেয় মনে করে। তাদের এ দূরবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এতে সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ মক্কার কাফের তথা দুনিয়ার সমস্ত কাফেররা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়। এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ভোগের নেশায় মত্ত থাকে। পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের কথা ভুলে যায়। কেয়ামতের কঠিন দিনের ব্যাপারে তারা চিন্তাও করেনা। অথচ সেদিন হবে তাদের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ভোগ-বিলাসে অত্যধিক মত্ত থাকার কারণে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশ মানেনা। মূলতঃ তারা আখেরাতে বিশ্বাসই করেনা। তাদের ভ্রান্ত ধারণা হলো এই যে, মাটির কায়া মাটিতে মিশে গেলে সবই শেষ হয়ে যায়। অতএব (হে রসূল!) আপনি তাদের কথা মানবেন না।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۞

'নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং আমিই তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি, আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের স্থলে তাদের ন্যায় অন্য লোক পরিবর্তন করে আনতে পারবো'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এ কাফেররা তাদের দৈহিক আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তির কারণে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। অথচ তারা এ সত্য ভুলে যায় যে, তাদের এ সমস্ত শক্তি আমারই দান, আমিই তাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছি, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আমিই সৃষ্টি করেছি। আমার এ শক্তি শেষ হয়ে যায়নি, আমি যখন ইচ্ছা করবো তাদের বদলে অন্যদের নিয়ে আসব, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ

'আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদের বিদায় করে দেবেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন জাতি নিয়ে আসবেন'।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রতি বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদেরকে ধ্বংস করারও হুমকি দেয়া হয়েছে, যেমন বদরের যুদ্ধে মক্কার অনেক কাফেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। তবে সাধারণ মক্কাবাসীকে ধ্বংস করা হয়নি, বরং যারা কুফরী ও নাফরমানীর নেতৃত্ব দিয়েছে যেমন আবু জেহেল, আকাবা এবনে মুয়ীত গয়রহ তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۞

'নিশ্চয় এটি উপদেশ মাত্র, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক'।

কোরআনে করীম বা এ আয়াত সমূহ নিঃসন্দেহে উপদেশ মাত্র। যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির পথে চলতে চায়, যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে চায় তাদের কর্তব্য হলো এ উপদেশ গ্রহণ করা, সর্বদা আল্লাহ পাককে স্মরণ করা আর এ উদ্দেশ্যেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ

'আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন'।

অর্থাৎ কারো সম্পর্কে যখন আল্লাহ পাকের মর্জি হয় তখনই সে হেদায়েত গ্রহণের ইচ্ছা করে, মানুষের মন আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণে। যে আল্লাহ পাকের দরবারে হেদায়েত চায়, আল্লাহ পাক তাকে তা দান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র মানব জাতির অন্তর দয়াময় আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি তাকে যেমন ইচ্ছা এবং যেদিকে ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! হে অন্তর সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার আনুগত্যের উপর কায়েম রাখ।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۞

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই যে যে বস্তুর যোগ্য আল্লাহ পাক তাকে তাই দান করেন। এদিকে আগের আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে

রসূল!) নসিহত বা উপদেশ দেয়া আপনার দায়িত্ব, নসিহত গ্রহণ করার জন্যে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়, নসিহত করার মধ্য দিয়েই আপনার দায়িত্ব শেষ, কে নসিহত মেনে নিল আর কে নিলনা তা দেখার প্রয়োজন আপনার নেই। এরপর এরশাদ হয়েছে, মানুষের ইচ্ছা আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন, যার যে যোগ্যতা আছে আল্লাহ্ পাক তা ভাল করেই জানেন এবং প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারেই তাকে আল্লাহ্ পাক দান করেন। অতএব বিনয় পেশ করতে হবে আল্লাহ্ পাকের দরবারে, মাথানত করতে হবে তাঁরই সম্মুখে, ভরসা করতে হবে শুধু তাঁরই উপর, আর আশা করতে হবে শুধু তাঁরই নিকট।

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

তরজমা

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতে প্রবেশ দান করেন। আর যারা পাপীষ্ঠ তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সর্বজ্ঞ, তিনি প্রত্যেককে তার যোগ্যতা অনুসারে দান করে থাকেন। আর হাদীস শরীফে রয়েছেঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের চেহারা এবং তোমাদের ধন-সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের আমলের দিকে"।

এ মানদন্ডের কারণেই আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর বিশেষ রহমতে আশ্রয় দান করেন।

আর যারা পাপীষ্ঠ, যারা সীমা লংঘনকারী, যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতেও আস্থা স্থাপন করেনা, যারা আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী কোরআনে করীমকেও মানেনা, যারা সত্য-দ্রোহী তাদের জন্যে তিনি প্রস্তুত রেখেছেন অত্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি, কেননা তারা এ শাস্তিরই যোগ্য।

এ সূরার প্রথম আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

'মানুষের উপর এমনও এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা'।

এরপর আল্লাহ পাক দয়া করে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন এবং তার সম্মুখে ভাল-মন্দ, কল্যাণ এবং অকল্যাণের পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে তার স্বভাবগত যোগ্যতায় হেদায়েতের পথ অবলম্বন করে এবং ঈমানদার ও নেককার হয়, পরকালীন জীবনে সে জান্নাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং চিরসুখ লাভ করবে।

পক্ষান্তরে, যে দেখে শুনেও সত্যকে বর্জন করে চলে, অন্যায় ও অকল্যাণের পথ গ্রহণ করে, আজীবন পথভ্রষ্ট অবস্থায় অতিবাহিত করে, পাপাচারে লিপ্ত থাকে সে পরকালীন জীবনে শোচনীয় পরিণত ভোগ করবে।

এ সূরার প্রথম আয়াতের সাথে সর্বশেষ আয়াত এভাবেই সম্পৃক্ত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা মুরসালাত

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسٌ وَّثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ﴿۱﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ﴿۲﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا ۙ﴿۳﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ﴿۴﴾ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۵﴾ عُذْرًا اَوْ
نُذْرًا ۙ﴿۶﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ﴿۸﴾ وَ
اِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ﴿۹﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ﴿۱۰﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ
اُقِّتَتْ ؕ﴿۱۱﴾ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ؕ﴿۱۲﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ﴿۱۳﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ
مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ؕ﴿۱۴﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۵﴾ اَلَمْ
نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ؕ﴿۱۶﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۷﴾ كَذٰلِكَ
نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۹﴾ اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ﴿۲۰﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ﴿۲۱﴾
اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ﴿۲۲﴾ فَقَدَرْنَا ۟ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۴﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ﴿۲۵﴾

তরজমা

(১) শপথ সেই বায়ুর, যা কল্যাণের জন্যে প্রেরিত হয়।

(২) শপথ সেই বায়ুর, যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়।

(৩) এরপর সেই বায়ুর শপথ, যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেয়।

(৪) এরপর শপথ সেই বায়ুর, যা মেঘরাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

(৫) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ওহী নিয়ে অবতরণ করে।

(৬) অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ।

(৭) নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রপুঞ্জের আলো নির্বাপিত হবে।

(৯) যখন আসমান বিদীর্ণ হবে।

(১০) যখন পাহাড়-পর্বতকে উড়িয়ে দেয়া হবে।

(১১) এবং যখন রসূলগণকে এক নির্ধারিত সময়ে সমবেত করা হবে।

(১২) কোন্ দিনের জন্যে এসব বিষয়ে বিলম্ব ঘটছে?

(১৩) ঐ বিচার দিনের জন্যেই তো।

(১৪) (হে রসূল!) আপনি কি জানেন সেই বিচার দিনটি কেমন?

(১৫) সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে হবে দুর্ভোগ।

(১৬) আমি কি পূর্বকালের (কাফেরদেরকে) ধ্বংস করিনি?

(১৭) এরপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো।

(১৮) পাপীষ্ঠদের সাথে আমি এমন ব্যবহারই করে থাকি।

(১৯) যারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে সেদিন তাদের সর্বনাশ।

(২০) আমি কি তাদেরকে এক ঘৃণ্য পানি দ্বারা সৃষ্টি করিনি?

(২১) এরপর আমি তাকে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ আধারে।

(২২) এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

(২৩) আমি তাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে। আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী।

(২৪) সেদিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ অবধারিত।

(২৫) আমি কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে?

সূরা মুরসালাত প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ, এতে দু' রুকু ও ৫০টি আয়াত রয়েছে। এর বাক্য সংখ্যা ১৮১ এবং অক্ষর সংখ্যা ৮১৬।

নামকরণ

সূরাতুল মুরসালাতকে "সূরাতুল আরফও" বলা হয়।

স্বপ্নের তা'বীর

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে যে, সে সূরা মুরসালাত পাঠ করছে সেসব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবে, সকল ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে। তার বয়স সুদীর্ঘ হবে, সে নেক আমল করার তওফিক পাবে।

এ সূরার আমল

সূরা মুরসালাত লিপিবদ্ধ করে হাতে বেঁধে রাখলে ফোড়া ভাল হয়। যদি কোন ক্ষমতাসীন ব্যক্তি হাতে এ সূরা লিপিবদ্ধ করে বেঁধে রাখে, তবে জনগণ তার অনুগত হয় এবং দুশমন পরাভূত হয়।

মূল বক্তব্য

অন্যান্য মক্কী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও তওহীদ, আখেরাত এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই কয়েকটি বস্তুর শপথ করে ঘোষণা করা হয়েছে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ, তাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। সূরার উপসংহারে কাফেরদের স্বভাবগত চারিত্রিক দুর্বলতার উল্লেখ করা হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, দুনিয়াতে কাফেরদেরকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে তা দেখে কেউ যেন প্রতারিত না হয়। তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, আর এটিই তাদের জন্যে এক প্রকার পরীক্ষা। অতএব ঈমানদারদের কোন প্রকার সন্দেহ করা উচিত নয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা দাহরে মানব জাতির ইতিবৃত্ত স্থান পেয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমনও সময় ছিল যখন মানুষ উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলনা, আল্লাহ পাকই তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আর এ সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে, মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে এবং কেয়ামতের যে কথা ঘোষণা করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে।

এ সূরা সম্পর্কে আরও কথা

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা মিনা নামক স্থানে ছিলাম, তখন এ সূরা নাযিল হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করে এ সূরা কণ্ঠস্ত করছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি সর্প আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিলেন তাকে মেরে ফেল। আমরা যদিও সর্পটিকে মারতে উদ্যত হলাম, কিন্তু সে বের হয়ে চলে গেল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, সে তোমাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে আর তোমরা তার ক্ষতি সাধন থেকে নিরাপদ রইলে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মাতা হযরত উম্মুল ফজল (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ সূরা মাগরিবের নামাজে পাঠ করতে শুনেছি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ সূরা পাঠ করতে শুনে উম্মে ফজল (রাঃ) বললেন, প্রিয় বৎস! আজ তুমি স্মরণ করিয়ে দিলে আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক থেকে মাগরিবের নামাজে এ সূরা পাঠ করতে শুনেছি।[১]

তফসীরুল কোরআন

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۞ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۞ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۞ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۞ فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۞

'শপথ সেই বায়ুর, যা কল্যাণের জন্যে প্রেরিত হয়। শপথ সেই বায়ুর যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। এরপর সেই বায়ুর শপথ যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেয়। এরপর শপথ সেই বায়ুর যা মেঘ রাশিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, অনুশোচনা স্বরূপ অথবা সতর্কতা স্বরূপ'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৯, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৬৯

কোন কোন সাহাবী এবং তাবেয়ীর মতে, এই শপথগুলো ফেরেশতাগণের নামে করা হয়েছে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, চারটি শপথ বায়ুর নামে, আর একটি শপথ ফেরেশতার নামে করা হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, الْمُرْسَلٰتِ। কথাটির অর্থ হলো সে সব ফেরেশতা, যারা শরীয়তের বিধি-নিষেধ নিয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে প্রেরিত হয়েছেন।

মসরুক (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

অন্যদিকে মুজাহেদ ও কাতাদা (রঃ) বলেছেন, مُرْسَلٰتِ সহ সকল স্থানেই এর অর্থ হল বায়ু। যেমন অনুবাদেও সে অর্থই প্রকাশ পেয়েছে, শপথ সেই বায়ুর যা কল্যাণের জন্যে প্রেরিত হয় এবং فَالْعٰصِفٰتِ শপথ সেই বায়ুর যা প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। এমনিভাবে النّٰشِرٰتِ। শপথ সে বায়ুর যা মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেয়। فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا শপথ সে বায়ুর যা মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا শপথ সে ফেরেশতাগণের যারা আল্লাহ্ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর যদি এর অনুবাদ ফেরেশতা না করে বায়ু করা হয় তখন এর অর্থ হবে, বুদ্ধিমান মাত্রই প্রবল বেগে প্রবাহিত বায়ু দেখে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের কথা স্বীকার করে এবং বায়ু প্রবাহিত হওয়ার পর যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন তারা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করে। এভাবে বায়ু আল্লাহ্ পাকের জিকরের কারণ হয়।

আর যদি এ বাক্যগুলো দ্বারা ফেরেশতা অর্থ করা হয় তখন তরজমা হবে এভাবে, শপথ সেই ফেরেশতাদের যারা নবী রসূলগণের নিকট আল্লাহ্ পাকের ওহী নিয়ে অবতরণ করে থাকে। আর আল্লাহ্ পাকের ওহী দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ এবং সাফল্যের প্রতীক হয়। আর শপথ সেই ফেরেশতাদেরও, যারা পৃথিবীতে পরিবর্তন এনে দেয়। শপথ সেই ফেরেশতাদেরও যারা পৃথিবীতে অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ বা সম্পদের আধিক্য ছড়িয়ে দেয় বা স্বাস্থ্য ও রোগ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। আর শপথ সেই ফেরেশতাদেরও, যারা পৃথিবীতে হক্ব ও বাতিল, আলো-অন্ধকার, শীত-গ্রীষ্ম, ভাল-মন্দ, এসব কিছুর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ বায়ু বাষ্প নিয়ে উপরের দিকে যায়, মেঘকে উত্তোলিত করে শূণ্যে ছড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক যে পরিমাণ যেখানে বর্ষণ করার কথা সে পরিমাণ সেখানে বৃষ্টিপাত হয়। আকাশে কোন বস্তুকে এভাবে উড়িয়ে দেয়া বাতাসের কাজ। কোন কিছুকে একত্রিত করা বা বিচ্ছিন্ন করা বা বিতরণ করার মধ্যে কেয়ামতের নমুনা রয়েছে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয় (রঃ) فالملقيت শব্দটির অর্থ করেছেন, বায়ু ফেরেশতা নয়, কেননা বাতাসইতো ওহীর কথাকে মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا

অর্থাৎ কাফেররা যেন এ অভিযোগ করতে না পারে, আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে কিছুই জানাননি, আমরা কিছুই জানতাম না। কেয়ামতের দিন এসব কথার কোনই সুযোগ থাকবেনা।

نُذْرًا

অর্থাৎ যারা মোমেন, তারা যেন সতর্ক হয়, সাবধান হয়, সৎ কাজে মশগুল হয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত হয়। এ উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আমরা কেয়ামত সম্পর্কে, জবাবদিহীতা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। এ অভিযোগের পথ বন্ধ করার জন্যে এবং সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করার জন্যে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বাক্যগুলো দ্বারা ফেরেশতা অর্থ করা হোক অথবা বায়ুমন্ডলী সকলেই একই কথা ঘোষণা করছে যে এমন একদিন আসবেই, যেদিন পাপীষ্ঠরা তাদের পাপাচারের শাস্তি ভোগ করবে এবং নেককার পরহেযগার লোকগণ আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভ ধন্য হবে।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ۝

'নিশ্চয় তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে'। অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

কোন্ দিন? তার আলামত কি? এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে–

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ۝

'এরপর যখন নক্ষত্রপুঞ্জের আলো নির্বাপিত হবে'।

'যখন তারকারাজি জ্যোর্তিবিহীন হয়ে যাবে'।

আজ তারকারাজি উজ্জ্বল, সুন্দর, কিন্তু কেয়ামতের পূর্বক্ষণে তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ۞

'এবং 'যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে'।

আজ নীলাভ আকাশে কোন ফাটল নেই, কোন ছিদ্র নেই কিন্তু কেয়ামতের পূর্বে তাতে ছিদ্র দেখা দেবে এমনকি, আসমান সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۞

যখন পাহাড়-পর্বতকে উড়িয়ে দেয়া হবে।

কেয়ামতের পূর্বক্ষণে ধূনিত তুলোর মত বিশাল পাহাড়গুলো বাতাসে উড়তে থাকবে।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ۞

'এবং যখন রসূলগণকে এক নির্ধারিত সময়ে সমবেত করা হবে'।

বস্তুতঃ কেয়ামতের দিন যুগে যুগে প্রেরিত নবী রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ উম্মত সম্পর্কে স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে একত্রিত করা হবে। সেদিনই হলো কেয়ামতের দিন।

لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ۞

কোন্ দিনের জন্যে এসব বিষয়ে বিলম্ব ঘটছে? অর্থাৎ যে সব বিপজ্জনক ঘটনার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা তারকারাজি নিশ্চিহ্ন হওয়া, আসমান বিদীর্ণ হওয়া, পাহাড়-পর্বত উড়ে যাওয়া এসব বিলম্বিত হচ্ছে কোন্ দিনের জন্যে?

তফসীরকারগণ বলেছেন, এ বর্ণনা-ভঙ্গী গ্রহণ করা হয়েছে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা প্রকাশার্থে,

لِيَوْمِ الْفَصْلِ۞

ঐ বিচার দিনের জন্যেই তো।

অর্থাৎ কেয়ামতের কঠিন কঠোর দিনের জন্যে, যেদিন সমগ্র মানব জাতির বিচার অনুষ্ঠিত হবে, যেদিন মোমেন ও কাফেরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হবে, যেদিন সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন–

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

'হে পাপীষ্ঠরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও'।

সেদিনই হবে কেয়ামতের দিন। বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধির জন্যে পুনরায় প্রশ্ন করা হয়েছে–

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝

(হে রসূল!) আপনি কি জানেন, সেই বিচার দিনটি কেমন?

অর্থাৎ সেদিন কত বিপজ্জনক এবং ভয়াবহ হবে, তা কেউ জানেনা। সেদিন প্রত্যেকটি বিষয় তন্ন তন্ন করে বিচার করা হবে। সেদিনই চূড়ান্ত ফয়সালা হবে কে ভাগ্যবান আর কে হতভাগা, কে চিরসুখী কে চিরদুঃখী।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম জয়নুল (রাঃ), যিনি দৈনিক এক হাজার রাকাআত নফল নামায আদায় করতেন, সারা বছর রোজা রাখতেন, তাঁকে একটি লোক গালি দিচ্ছিল, তাঁর খাদেমরা এ লোকটির শাস্তি বিধানের জন্যে তাঁর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তারা বললো, কবে এ বেআদবকে শাস্তি দেব? তিনি বললেন, আমার সম্মুখে পুলসেরাত রয়েছে, আমি যদি আল্লাহ পাকের রহমতে পুলসেরাত অতিক্রম করতে পারি, তবে তার গালিতে আমার কিছু আসবে যাবেনা। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ না করুন, আমি পুলসেরাত অতিক্রম করতে না পারি, তবে সে আমাকে যা মন্দ বলছে, আমি তার চেয়েও বেশী মন্দ বলে প্রমাণিত হবো। অতএব, তোমরা অপেক্ষা কর।

বস্তুতঃ এ হলো কেয়ামতের ভয়াবহতার উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

'সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে হবে চরম দুর্ভোগ'।

অর্থাৎ সেদিন দুর্ভোগ হবে সে সব লোকের জন্যে, যারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী কোরআনে করীমকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা মনে করেছে, যারা কেয়ামতের বর্ণনাকে সত্য মনে করেনি, এ দিন হবে তাদের সর্বনাশ, এ দিন তারা হবে ধ্বংস।

দোযখে কাফেরদের শাস্তি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "ওয়ায়েল" হলো দোযখের একটি ঘাঁটি, চল্লিশ বছর যাবত কাফেররা তাতে ধাক্কা খেতে থাকবে, তবু তার গভীরে পৌঁছতে পারবেনা। (আহমদ, তিরমিজী, বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, ওয়ায়েল হলো দোযখের একটি ঘাঁটি, তাতে দোযখীদের পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাদের শাস্তির জন্যেই ঐ স্থানটি নির্দিষ্ট।

আতা এবনে ইয়াসার (রঃ) বলেছেন, "ওয়ায়েল" হলো দোযখের এমন একটি ঘাঁটি, যা দোযখীদের পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ, যদি পাহাড়কেও ঐ ঘাঁটিতে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে তার তাপের কারণে পাহাড় গলে যাবে। (বায়হাকী, এবনে জরীর, এবনে মোবারক)

হযরত ওসমান এবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ওয়ায়েল হলো দোযখের একটি পাহাড়।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করতে দ্বিধাবোধ করতো না, কেয়ামতের দিনের কথাকে মিথ্যা মনে করতো, কেয়ামতের দিন তারা স্বচক্ষে ঐ শাস্তি দেখবে এবং আক্ষেপ করবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা তওহীদ, নবুওয়্যত এবং কেয়ামতকে অস্বীকার করে।[১]

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۞

'আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (কাফেরদের) ধ্বংস করিনি'?

ইতোপূর্বে যারা তাদের সম্পদ ও শক্তির কারণে পৃথিবীতে দৌরাত্ম এবং জুলুম-অত্যাচার করেছিল, পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল, কেয়ামতকে অস্বীকার করেছিল, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলকে অমান্য করেছিল, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার এ ক্ষণভঙ্গুর জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করেছিল, আমি কি তাদেরকে ধ্বংস করিনি? যেমন নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ, শাদ্দাদ-সকলেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের সকলকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছিলেন, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেনঃ আমি কি পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৫৩
তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২৭০

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ۝

'এরপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করবো'।

অর্থাৎ যেভাবে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর দৌরাত্মের কারণে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, পরবর্তীতে যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তাদেরকেও অনুরূপ শাস্তি দেব।

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাদেরকেও পূর্ববর্তীদের মত আল্লাহর আযাব দ্বারা ধ্বংস করা হবে। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিচ্ছিল, ইসলাম প্রচারে সর্ব প্রকার বাধা দিচ্ছিল, এ কাফেরদের বেলায়ও কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবেনা। যারা মানব জাতির সর্বনাশ করতে উদ্যত, যারা কেয়ামতকে অবিশ্বাস করে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ۝

'পাপীষ্ঠদের সাথে আমি এমন ব্যবহারই করে থাকি'।

এটি আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়ম। আল্লাহ পাকের অবাধ্যদের অবকাশ দেয়া হয়, কিন্তু অবশেষে তাদের শাস্তি অনিবার্য। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

'যারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে সেদিন তাদের সর্বনাশ অপরিহার্য'।

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে সতর্কবাণী আসে, যারা এ সতর্কবাণীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদের শাস্তি অবারিত।

মানব জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ۝

'আমি কি তাদেরকে এক ঘৃণ্য পানি দ্বারা সৃষ্টি করিনি'?

একথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহ পাকই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তা করেছেন এক তুচ্ছ ঘৃণ্য পানি দ্বারা, এটি কি তাঁর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার

জীবন্ত নিদর্শন নয়? যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ

'মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু থেকে, অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী'। (সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৭৭)

মানুষ নিজের সৃষ্টির কথা বিস্মৃত হয়, বিস্মৃত হয় তার অতীতকে, আর তার বর্তমান নিয়ে সে যথেচ্ছাচারে মত্ত হয়, এমনিভাবে তার ভবিষ্যত হয় অন্ধকার।

এজন্যে আল্লাহ পাক মানুষকে তার সৃষ্টির কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যেন সে আত্মবিস্মৃত না হয়, যেন সে দায়িত্বহীন জীবন যাপন না করে, অহেতুক কাজে এবং অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত না হয়। তাই পরবর্তী আয়াতেও মানুষকে তার অতীতের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছেঃ

فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۞ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ۞

'এরপর আমি তাকে স্থাপন করেছি এক নিরাপদ আধারে। এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। আমি তাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে। আমি কেমন উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী'।

প্রতিটি মানুষকে তার মাতৃ-গর্ভে সাধারণত নয় মাস কাল অবস্থান করতে হয়। তখনই আল্লাহ পাক তাকে আকৃতি দান করেন। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রতঙ্গকে সুগঠিত করেন। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই হয় যথাযথ, পরিমাণ মোতাবেক। আর এ পরিমাণ নির্ধারণও করেন স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর অনন্ত অসীম দয়া মায়ার জীবন্ত প্রতীক রূপেই প্রতিটি মানুষ আসে পৃথিবীতে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, যারা তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা, যারা তাঁর প্রেরিত রসূলগণকেও মিথ্যাজ্ঞান করে তাদের শাস্তি বিধানই যুক্তিযুক্ত। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۞

'সেদিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ অবধারিত'।

সেদিন তাদের দুঃখ-কষ্ট এবং আক্ষেপের সীমা থাকবেনা, কেননা দুনিয়ার জীবনে তারা ছিল আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, তারা ছিল মানবতার অবমাননাকারী।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ

'আমি কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে?

আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে নয় মাস যাবত মাতৃ-গর্ভে রেখেছেন, হয়তো মানুষ একথা ভুলে যেতে পারে। তাই এ আয়াতে মানুষকে যমীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ পাকের দানের কথা উপলব্ধির আহ্বান জানানো হয়েছে যে, হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! এই পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য কর, যে পৃথিবীতে তোমরা বাস কর। কিভাবে আল্লাহ পাক পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে মানুষ বাস করে। চলাফেরা করে। এরপর কেয়ামতের দিন এ পৃথিবীকে তিনি গুটিয়ে ফেলবেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তাকে, তিনিই তাকে গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেবেন, অতএব হে মানব জাতি! যিনি তোমাকে জীবন দিয়ে পৃথিবীতে এনেছেন, সেই আল্লাহ পাকই মৃত্যুর মাধ্যমে তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেবেন। অতএব, সাবধান হও! আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করার পাশাপাশি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। দান পেয়ে দাতাকে ভুলে যেওনা। যিনি দান করেছেন জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব, তিনিই তোমাকে দান করেছেন তোমার এ জীবনের জন্যে বিধান, অতএব তাঁর প্রদত্ত বিধান অমান্য করোনা।

اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّ
اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ؕ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٨﴾
اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ
ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ مِنَ اللَّهَبِ ؕ ﴿٣١﴾
اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ﴿٣٢﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ؕ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ﴿٣٥﴾ وَلَا
يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(২৬) জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যে।

(২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ, সুদৃঢ় পর্বতমালা। আর তোমাদেরকে দান করেছি সুপেয় পানি।

(২৮) সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের সর্বনাশ।

(২৯) (আর কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে) তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, সেই আযাবের দিকে চল।

(৩০) চল, এমন একটি ছায়ার দিকে, যার তিনটি শাখা রয়েছে।

(৩১) যে ছায়া শীতল নয়, আর যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা থেকে।

(৩২) তা উৎক্ষেপণ করবে উঁচু অট্টালিকার ন্যায় বড় বড় স্ফুলিঙ্গ।

(৩৩) যেন তা পীত বর্ণের উষ্ট্রের ন্যায়।

(৩৪) সেদিন সর্বনাশ হবে মিথ্যা আরোপকারীদের।

(৩৫) এটি সেদিন, যেদিন তারা কোন কথাও বলতে পারবেনা।

(৩৬) এবং তাদেরকে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করারও অনুমতি দেয়া হবেনা।

(৩৭) সেদিন সর্বনাশ হবে মিথ্যা আরোপকারীদের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমে তার সৃষ্টি সম্পর্কে এবং পরে যে যমীনের উপর সে বাস করে, সে সম্পর্কে চিন্তা করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং জিজ্ঞাসা করেছেনঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا

'আমি কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে'?

আর এ আয়াতে বিষয়টিকে আরো ব্যাপকভাবে চিন্তা করে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়া হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

اَحْيَاۤءً وَّاَمْوَاتًا ۞

অর্থাৎ আমি যমীনকে জীবিত ও মৃত সকলের জন্যেই কি ধারণকারী রূপে সৃষ্টি করিনি?

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাক মানুষকে যমীনের পৃষ্ঠ-দেশে জীবন যাপনের সুযোগ দান করেছেন এবং মৃত্যুর পরও মানুষকে যমীনের অভ্যন্তরেই সমাধিস্থ করা হয়। আল্লাহ পাক মানুষকে জীবনে-মরণে ধারণ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যমীনের উপর। হযরত আদম (আঃ) থেকে এ পর্যন্ত কত আদম সন্তানকে যমীন তার গর্ভে ঠাই দিয়েছে তার হিসেব একমাত্র আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা, এরপর কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে কত মানুষের পদচারণা হবে এবং পুনরায় যমীন তার গর্ভে ধারণ করবে, তা-ও আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো জানা নেই।

وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ

'আর আমি তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ সুদৃঢ় পর্বতমালা'।

এটিও মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের এক মহান দান, কেননা এ পাহাড় সমূহ স্থাপনের পূর্বে যমীন নড়াচাড়া করতো, ফলে তখন তা মানুষের বাসোপযোগী ছিলনা।

সর্বাধিক শক্তিশালী সৃষ্টি

তিরমিজী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক যখন এ বিশাল-বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করলেন, তখন তা নড়াচড়া করতে লাগলো। তখন আল্লাহ পাক পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং আদেশ দিলেন পাহাড়কে, ফলে যমীন স্থবির হয়ে গেল, তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন ফেরেশতাগণ আশ্চর্যন্বিত হল এবং আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করল, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড়ের চেয়ে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যা আছে, তা হল লোহা। ফেরেশতারা আরজ করল, হে রব! লোহার চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি তোমার সৃষ্টিতে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, হ্যা আছে অগ্নি। তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করল, তোমার সৃষ্টিতে অগ্নির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যা আছে পানি। ফেরেশতারা আরজ করলো, হে পরওয়ারগোর! তোমার সৃষ্টিতে পানির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যা আছে বাতাস। ফেরেশতারা তখন আরজ করল, হে পওয়ারদেগার! বাতাসের চেয়েও

শক্তিশালী তোমার সৃষ্টিতে কিছু আছে কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আছে, একজন মানুষ যে আল্লাহ পাকের সাথে এত গভীর সম্পর্ক রাখে যে, তার ডান হাতে যা আল্লাহর রাহে দান করে তার বাম হাত তা জানেনা।

মানুষের মধ্যে যাদের এ বৈশিষ্ট্য থাকে আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন শক্তি দান করেন যা পাহাড়-পর্বত, আগুন, পানি, বাতাস কোন কিছুর মধ্যেই নেই, বরং এসব কিছু আল্লাহর এমন বন্দার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

অতএব, যমীনের উপর পাহাড়গুলোকে স্থাপন করাও বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের বিরাট ও বিশেষ দান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ পাকের দানকে অস্বীকার করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর কঠিন শাস্তি। আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

'সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে সর্বনাশ'।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ۝

'(কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে) তোমরা সেই আযাবের দিকে চল, যা তোমরা অবিশ্বাস করতে'।

দুনিয়ার জীবনে তোমরা জান্নাত ও দোযখের কথা বিশ্বাস করতে না, এখন সেই আযাবের দিকে চল।

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ۝

'চল এমন একটি ছায়ার দিকে, যার তিনটি শাখা রয়েছে'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন যখন হিসাব-কিতাব চলবে, তখন কাফেররা কবর থেকে উত্থিত হয়ে ধূম্ররাশির ছায়ায় অবস্থান করবে। আর এ ধূম্ররাশির ছায়া শীতল হবেনা, বরং তপ্ত হবে। তাদের ডানে-বামে এবং মাথার উপর- তিনদিক থেকেই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

দোযখের ধূম্ররাশির তিনটি শাখা হওয়ার যে কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকারগণ তা হলো, তিন প্রকার মানুষ দোযখে প্রবেশ করবে।

১. সে সব কাফের, যারা সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

২. সে বেদআতী লোকেরা, যারা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং এর অপব্যাখ্যা করে, আর যে সব বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন, তাদের বিরোধিতা করে।

৩. যারা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় পাপাচারে লিপ্ত থাকে। ফরজ সমূহ পরিত্যাগ করে।

এ ৩টি দলের অপকর্মের শাস্তি স্বরূপই দোযখের ধূম্ররাশিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে দোযখ থেকে একটি ঘাড় বের হবে, যা ৩টি শাখায় বিভক্ত হবে।

১. একটি শাখা নূর হবে, যা মোমেনদের মাথার উপর এসে বসবে।

২. দ্বিতীয় শাখাটি ধূম্ররাশি, যা মুনাফেকদের মাথার উপর এসে বসবে।

৩. তৃতীয় শাখাটি জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ, যা কাফেরদের মাথার উপর এসে বসবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের ظل শব্দ দ্বারাই দোযখের অগ্নিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অগ্নি যেহেতু অন্ধকার এবং কালো হয়, (শূণ্যে) তাকে রূপক অর্থে ظل বলা হয়েছে, কেননা ছায়াতে আংশিক হলেও কিছু অন্ধকার থাকে। আর তিন শাখা বিশিষ্ট অগ্নিকুন্ডের উদ্দেশ্যে চলার যে নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তার অর্থ হলো তোমরা দোযখের অগ্নির দিকে চল। যেখানে তিনটি পথে পৌঁছানো যায়।

১. প্রকাশ্যে যারা নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

২. পরোক্ষ ভাবে যারা নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

৩. পাপাচারে লিপ্ত লোকদের পথে।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের প্রতি বিদ্রুপ করেই তিনটি শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যেমন অন্য আয়াতেও বিদ্রুপাত্মক অর্থে এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ

'সাধ গ্রহণ কর! নিশ্চয় তুমি ছিলে (দুনিয়াতে) প্রভাবশালী, সম্মানিত'।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

'তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও'।

لَّا ظَلِيْلٍ

অর্থাৎ ছায়া শীতল নয়। নামে মাত্র ছায়া কিন্তু উত্তাপ এত বেশী যে, জ্বলন্ত অঙ্গারকেও সে হার মানায়।

وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ

'যা রক্ষা করবে না অগ্নি শিখা থেকে'।

"জ্বিল" বা ছায়া শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কারো এ ধারণা হতে পারে যে, এ ছায়ায় থাকলে তাপ থেকে রক্ষা করা যাবে, কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন-কল্পে ঘোষণা করা হয়েছে, যা রক্ষা করেনা অগ্নি শিখা থেকে।

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ۞

'নিশ্চয় তা উৎক্ষেপণ করবে উঁচু অট্টালিকার ন্যায় বড় বড় স্ফুলিঙ্গ'।

দোযখের অগ্নিকুন্ড থেকে যে স্ফুলিঙ্গগুলো উৎক্ষেপন করা হবে, সেগুলো উঁচু অট্টালিকার ন্যায় হবে।

এ স্ফুলিঙ্গগুলোর আরেকটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে পরবর্তী আয়াতে

كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ۞

'যেন তা পীত বর্ণের উষ্ট্রের ন্যায়'।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী صفر শব্দটির অর্থ سود করেছেন অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণের উষ্ট্রের ন্যায়।

প্রথম দৃষ্টান্ত হলো স্ফুলিঙ্গগুলোর উচ্চতা এবং ভয়াবহতা প্রকাশার্থে, আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি অগ্নির বর্ণ এবং তার গতিশীলতা বোঝানোর জন্যে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۞

'সেদিন সর্বনাশ হবে মিথ্যা আরোপকারীদের'।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ۞

'এটি সেদিন, যেদিন তারা কোন কথাও বলতে পারবেনা'।

হাশরের ময়দানে এমনও সময় আসবে যখন কাফেররা কোন কথাও বলতে পারবেনা, ভয়ের কারণে, বিপদের আশঙ্কায় তারা কোন কথা বলতে পারবেনা। আর কোন কোন ক্ষেত্রে যদি কথা বলতেও পারে, তবে তা তাদের কোন কাজে আসবেনা।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝

'এবং তাদেরকে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি পেশ করারও অনুমতি দেয়া হবেনা'।

কেননা, তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তাই তাদেরকে আর কোন কথা বলার অনুমতি দেয়া হবেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, অপরাধীদের কীর্তিকলাপের পক্ষে পেশ করার মত কোন ওজর-আপত্তিও থাকবেনা, তাদের কৃতকর্মের স্বাক্ষী হবে তাদের আমলনামা, দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার জীবনে তাদের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের বিরুদ্ধেই স্বাক্ষ্য দেবে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেকটি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীতে সে এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই তার নিজের মনে করে ব্যবহার করেছিল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝

'সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী'।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অহরহ ভোগ করেছে, অথচ তাঁর বিধানকে অস্বীকার করেছে তাদের শাস্তি বিধানই যুক্তিযুক্ত।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ
كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾
كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا
وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ
يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৩৮) এটিই বিচারের দিন, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি।

(৩৯) অতএব, যদি তোমাদের কোন অপকৌশল থাকে, তবে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর।

(৪০) আজ মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

(৪১) নিশ্চয় মুত্তাকী পরহেযগারগণ থাকবে (সেদিন) ছায়ায় এবং ঝর্ণামালায়।

(৪২) এবং নিজেদের পছন্দ মোতাবেক ফলমূলের মাঝে।

(৪৩) (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা মনের সুখে পানাহার কর।

(৪৪) এভাবেই আমি নেককারদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।

(৪৫) সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

(৪৬) (হে কাফেররা! তোমরা দুনিয়াতে) পানাহার কর এবং অল্প কিছু দিন ভোগ করে লও। নিশ্চয় তোমরা অপরাধী।

(৪৭) সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের সর্বনাশ অবধারিত।

(৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে নত হও, তারা নত হয়না।

(৪৯) সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

(৫০) অতএব, তারা কোরআনে করীমের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তফসীরুল কোরআন

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۞

'এটিই বিচারের দিন, আমি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি'।

অথবা এর অর্থ হলো, এটি জান্নাতী এবং দোযখীদেরকে পৃথক করার দিন। আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা পৃথিবীতে এসেছে তাদের সকলকে একত্রিত করেছি।

যেহেতু পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হয়েছে, সকলের বিচার হবে আজকের দিনে, তাই সকলকে একত্রিত করা হয়েছে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ জাদালী (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি বয়তুল মোকাদ্দাস গমন করেছিলাম, সেখানে দেখলাম হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) এবং হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) উপবিষ্ট অবস্থায় কথা বলছেন। হযরত ওবাদা (রাঃ) বললেন, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন একটি ময়দানে সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, এরপর একজন ঘোষক সকলকে হুশিয়ার করবে, এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, আজকের দিন হলো ফয়সালা করার দিন, তোমাদের পূর্বাপর সকলকে আমি একত্রিত করেছি, যদি আমার সাথে কোন প্রতারণা, কোন ষড়যন্ত্র করতে পার, তাহলে কর। যারা অহংকারী, যারা আল্লাহ পাকের নবীগণের প্রতি মিথ্যা আরোপকারী, তারা আজ আমার হাত থেকে নিস্তার পাবেনা, আর কোন নাফরমান শয়তান আমার আযাব থেকে রক্ষা পাবেনা।

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ۞

'অতএব, যদি তোমাদের কোন অপকৌশল থাকে, তবে তা আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর'।

কাফেরদের অসহায়ত্ব

কাফেরদেরকে সেদিন বলা হবে, দুনিয়াতে তোমরা মোমেনদের মোকাবেলায় অনেক চক্রান্তে লিপ্ত হতে, বরং এসব চক্রান্তের ব্যাপারে তোমরা গর্ব করতে, আজ আল্লাহ পাকের আযাব থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সম্ভব হলে কোন ষড়যন্ত্র বা অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ কর।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে, ইসলামের বিরুদ্ধে যাদের নেতৃত্ব মেনে নিতে, তাদের সকলকে আমি একত্রিত করে দিয়েছি, অতএব, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা কর, দুনিয়াতে মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তোমরা ছিলে সিদ্ধহস্ত, এখন চেষ্টা করে দেখ তেমন কিছু করা যায় কি-না।

আল্লামা আলুসী (রঃ) আরো লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন কাফেররা কত অসহায় থাকবে, তা প্রকাশ করা হয়েছে।[১]

দুনিয়াতে আবু জেহেল তার সমর্থকদেরকে বলতো, তোমরা তো শক্তিশালী, বীর পুরুষ, তোমরা দশজন মিলেও দোযখের একজন প্রহরীকে কাবু করতে পারবেনা? কেয়ামতের দিন কাফেরদেরকে বলা হবে, এখন চেষ্টা করে দেখ আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পার কি-না।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একথাটির দৃষ্টান্ত হলো যখন কাফেররা কোরআনের সত্যতা মেনে নিতে প্রস্তুত হলোনা তখন সমগ্র বিশ্বের সকল কাফেরদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হলো ঃ

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ

(যদি সম্ভব হয় তবে পবিত্র কোরআনের একটি ছোট্ট সূরার অনুরূপ তোমরা রচনা কর) কিন্তু আরবের ভাষাবিদরা শত চেষ্টা করেও কোরআনে করীমের অনুরূপ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৯, পৃষ্ঠা-১৭৭
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৫৯

বাণী রচনা করতে অক্ষম হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতেও কাফেরদেরকে বলা হবে, তোমরা তো দুনিয়াতে মোমেনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে পারদর্শী ছিলে, এখন চেষ্টা করে দেখ, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে নাজাত লাভের কোন ষড়যন্ত্র করতে পার কি-না।

বস্তুতঃ দুনিয়াতে যেমন কাফেররা কোরআনে করীমের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে ঠিক তেমনি আখেরাতেও তাদের ব্যর্থতা হবে অনিবার্য, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

'অতএব, যারা দুনিয়াতে আযাবে এলাহীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাদের আযাব হবে অবশ্যম্ভাবী'।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ۝

'নিশ্চয় মুত্তাকী পরহেযগারগণ থাকবে (সেদিন) ছায়ায় এবং ঝর্ণামালায়'।

মোমেন মুত্তাকীদের পুরস্কারের ঘোষণা

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে মোমেন, মুত্তাকী পরহেযগার লোকদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের المتقين। শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকার মোকাতেল (রঃ), কালবী (রঃ) এবং ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে সব লোককে যারা দুনিয়ার জীবনে শেরক থেকে আত্মরক্ষা করতো, কেননা ইতিপূর্বে শাস্তির ঘোষণা হয়েছে মুশরেকদের বিরুদ্ধে, অতএব পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছে মোমেনদের পক্ষে, এটিই স্বাভাবিক।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, المتقين। মুত্তাকীন শব্দ দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা যাবতীয় পাপাচার থেকে পরহেয করে চলতো।

যাহোক, মোমেন মুত্তাকী পরহেযগারদের উদ্দেশ্যেই এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা সেদিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়ায় বেহেশতের মনোরম পরিবেশে নিঃশঙ্ক চিত্তে থাকবে। তাদের পার্শ্বে প্রবাহিত হবে ঝর্ণা। যার পানি কখনও দূষিত হবেনা, আর এমন দুগ্ধ থাকবে, যার স্বাদ কখনও কমবে না।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-৩০, পৃষ্ঠা-২৮৩

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ۝

এবং তারা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক ফলমূলের মাঝে থাকবে, তাদের পানাহারের জন্যে তাদের পছন্দনীয় ফলমূল এবং সুপেয় পানীয় সরবরাহ করা হবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۝

(তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের জিন্দেগীর নেক আমলের পুরস্কার স্বরূপ মনের সুখে পানাহার কর। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলার জন্যে তোমরা যে সাধনা করেছ, তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ আজ এখানে মনের সুখে পানাহার কর।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۝

'নিশ্চয় আমি এভাবেই নেককারদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি'।

যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ পাকের নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে অক্লান্ত সাধনা করেছে, আল্লাহ পাক তাদের এ সাধনাকে কোন অবস্থাতেই ব্যর্থ করবেন না, তাদেরকে দান করবেন জান্নাতের চিরসুখ, চিরশান্তি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

অর্থাৎ যারা জান্নাতকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তারা জান্নাতের সুখ থেকে হবে চির বঞ্চিত এবং তাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য।

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ۝

'(হে কাফেররা! তোমরা দুনিয়াতে) পানাহার কর এবং অল্প কিছু দিন ভোগ করে লও, নিশ্চয় তোমরা অপরাধী'।

কাফের মুশরেক দূরাত্মা, পাপীষ্ঠদের উদ্দেশ্যে এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে আরো কিছুদিন আনন্দ-উল্লাস করে লও, যেহেতু তোমরা অপরাধী, তাই তোমাদের শাস্তি হবেই হবে।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

যারা দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদে মত্ত থেকে আখেরাতের সুখ-দুঃখকে অস্বীকার করেছে, তাদের কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ۝

'যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নত হও, তারা নত হয়না'।

শানে নুযুল

এবনুল মুনজের মুজাহেদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বণী সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে ঈমান আনয়নের এবং নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন, তখন তারা জবাব দিয়েছিল, আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত যমীনে হাত রেখে মাথা নত করতে পারবো না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَاِذَا قِيْلَ

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নত হও, রুকু কর তথা নামায আদায় কর, তখন তারা তাতে অস্বীকৃতি জানায়।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ۝

যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে মিথ্যাজ্ঞান করতো, এমন অপরাধীদের ধ্বংস অনিবার্য।

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ۝

'অতএব, তারা কোরআনে করীমের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে'?

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, যা আল্লাহ পাকের মহান বাণী, যা জ্ঞানগর্ভ, উপদেশপূর্ণ, অদ্বিতীয়। যারা এ মহান গ্রন্থকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে এমন দূরাত্মা লোকেরা আর কোন্ কথার বিশ্বাস স্থাপন করবে?

বস্তুতঃ এমন দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা কোন ভাল কথাকেই বিশ্বাস করেনা, তাই তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

একই আয়াত বারংবার উল্লেখের কারণ

আলোচ্য সূরায় একাধিকবার وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ উল্লেখ করার কারণ কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সূরা আল-মুরসালাতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে সে

সব লোককে যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে। এ পর্যায়ে তাদের উদ্দেশ্যে দশবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। ১০টি কারণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। মানুষকে আল্লাহ পাক এমন যোগ্যতা ও শক্তি দান করেছেন, যদি সঠিক পথে এর ব্যবহার করা হয় তবে এমন ব্যক্তির জীবন সাধনা সার্থক হয়। পক্ষান্তরে, যদি এ শক্তি সমূহের অপব্যবহার করা হয় তবে দুর্ভাগ্য এবং ধ্বংস অবধারিত হয়, যেমন চিন্তাশক্তি, যদি তা সঠিক ভাবে পরিচালিত হয় তবে আকীদা বিশ্বাস সঠিক হয়। কাফের মুশরেকরা এদিক থেকে হতভাগা, কেননা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করেনি; বরং তাঁর সাথে শেরক করেছে।

দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলীর ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছে এবং ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলেছে।

তৃতীয়তঃ ফেরেশতাদের ব্যাপারেও তারা ভ্রান্ত ধারণা করেছে, তারা বলেছে ফেরেশতারা হলো আল্লাহ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

চতুর্থতঃ তারা ধারণা করেছে, মানুষের জীবন এ পৃথিবীতেই সীমিত, এরপর হাশর নশর পুনর্জীবন বলতে কিছুই নেই।

পঞ্চমত, তারা তকদীরকে অস্বীকার করেছে।

ষষ্ঠতঃ তারা পূর্বকালের নবী রসূলগণকে এবং আসমানী কিতাব সমূহকে অস্বীকার করেছে।

কেয়ামতের অস্বীকারকারীদের চিন্তাধারায় এই ছয়টি বাতিল ধারণা রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত মানুষের যে দৈহিক শক্তি রয়েছে তার অপপ্রয়োগ করে মানুষ অন্যের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। এমনিভাবে হিংসা-বিদ্বেষ, প্ররশ্রীকাতরতায় মানুষ একে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে।

এছাড়া নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক যে বিধান প্রবর্তন করেছেন, তা লংঘন করার কারণে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে চতুঃষ্পদ জন্তুর পর্যায়ে অবনমিত হয়।

মূলতঃ যারা কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করেনা, যারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নিজের জীবনের কৃতকর্মের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে বলে ভয় করেনা, তারাই উল্লিখিত অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে।

এমনি দশটি অপরাধের প্রেক্ষিতেই وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ কথাটি বারংবার উল্লেখ করে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২১শে নভেম্বর, ১৯৯৭ইং ২০শে রজব, ১৪১৮ হিজরী, রোজ শুক্রবার সকাল দশটায় আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৯তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর। আমীন।

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۞ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ۞
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۞
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۞

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪৫৯-৬০

